হুসাইন হিলমি ইশিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাকিকাত কিতাবেভির প্রতিষ্ঠাতা হুসাইন হিলমি ইশিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩২৯ হিজরি (১৯১১ খ্রিস্টাব্দে) ইস্তানবুলের আইয়ুব সুলতান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি ১৪৪ টি বই প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে ৬০টি আরবি, ২৫টি ফার্সি, ১৪টি তুর্কী ভাষার এবং বাকি গুলো ফ্রেন্স, জার্মান, ইংলিশ, রাশিয়ান এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত হয়েছে।
হুসাইন হিলমি ইশিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (সৈয়দ আব্দুল হাকিম আরওয়াশি র. উনাকে পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যিনি তাসাউফের গুণাবলী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং পরিপূর্ণ সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম; যিনি জ্ঞান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।) ছিলেন একজন দক্ষ, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, যিনি একটি সমৃদ্ধময় জীবন পরিচালনার সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারতেন। তিনি ২০০১ সালের (১৪২২ হিজরী) ২৫ ও ২৬ অক্টোবরের (৮ ও ৯ শা'বান) মধ্যবর্তী রাতে ইন্তেকাল করেন। তাকে তার জন্মস্থান আইয়ুব সুলতানে দাফন করা হয়।

প্রকাশকের কথা:
যারা এই বই টি মূল আকৃতিতে, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে প্রকাশের জন্য পরিপূর্ণ অনুমতি দেওয়া হলো। যারা এই মহামূল্যবান কাজটি সম্পাদন করবে আমরা দোয়া করি যে, আল্লাহ যেন তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদেরকে আমরা অন্তর থেকে জানায় ধন্যবাদ। তবে অনুমতি এই শর্তে দেওয়া হচ্ছে, প্রিন্টিং এ ব্যবহৃত কাগজের মান অবশ্যই ভালো হতে হবে, এর প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস হতে হবে নির্ভুল, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। পূর্ণ মুদ্রিত বইয়ের একটি কপি পেলে আমরা কৃতজ্ঞ হব।

সতর্কবার্তা:
খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের খ্রিস্টধর্মের প্রচারণার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ইহুদিরা তাদের রাব্বিদের সাজানো বাণী প্রচারের কাজ করছে। ইস্তাম্বুলের হাকিকাত কিতাবেভী ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ফ্রিম্যাসনরা দ্বীন-ধর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। একজন মানুষ তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বিবেক দিয়ে এইগুলোর মধ্য থেকে সঠিকটি গ্রহণ করে মানবতার মুক্তির জন্য তা প্রচার করতে পারে। মানবতার সেবার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোন মাধ্যম নেই।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সকল মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। তিনি মানুষের জন্য উপকারি সকল কিছু সৃষ্টি করে তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। পরকালে তিনি জাহান্নামের উপযুক্ত সেসব অবাধ্য মুমিনদের মধ্য হতে যাদের তিনি ইচ্ছা করবেন, তাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং সরাসরি জান্নাতে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাদের অনুগ্রহ করবেন। তিনি একাই প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেন, আর বাঁচিয়ে রাখেন এবং ভয়-ভীতি থেকে সবাইকে রক্ষা করেন। সেই আল্লাহ তায়ালার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে আমরা এই বইটি অনুবাদ করতে শুরু করেছি।
অসীম কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালার প্রতি! তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক! রহমত বর্ষিত হোক প্রিয় নবীর পরিবার এবং সমস্ত সাহাবীগণের উপর!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের অশেষ রহমত দান করেছেন এবং তিনি চান তারা যেন দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে এবং পরকালে চিরস্থায়ী কল্যাণ অর্জন করতে পারে। এই জন্যই তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাদের নিকট আসমানি কিতাব প্রেরণ করে শান্তি ও সুখের পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে সুখ অর্জন করার প্রথম শর্তই হচ্ছে তাঁর এবং তাঁর নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এরপরে তাঁর পবিত্র আসমানি কিতাবে বর্ণিত আদেশ পালন করা। যে ব্যক্তি এগুলো বিশ্বাস অর্জন করবে এবং নির্দেশনাগুলো গ্রহণ করবে, তাকে মুমিন ও মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে।

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্ব এবং নবীদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য ইসলামী পণ্ডিতগণ প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনেক বই লিখেছেন। সন্দেহ ও বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে সুসংগত, স্পষ্ট ও বোধগম্য রীতিতে লিখিত বইগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার ইসবাতুন নবুওয়া অত্যন্ত কার্যকর একটি বই। ইসলামের সুগভীর জ্ঞানের অধিকারি আল ইমাম আর রব্বানী আহমেদ আল ফারুকী (কুদ্দিসা সিররুহ) মাত্র ১৮ বছর বয়সে এই বইটি লিখেছিলেন। এই বইটিতে শরহে মাওয়াকিফের শেষ ভাগ হতে তার নিজের নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যা রয়েছে। এটি পাকিস্তানে উর্দু অনুবাদসহ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আল ইমাম আর রব্বানী আহমেদ আল ফারুকী (কুদ্দিসা সিররুহ) ৯৭১ হিজরি মোতাবেক ১৫৬৪ সালে ভারতের সিরহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৪ হিজরি মোতাবেক ১৬২৫ সালে সেখানে মারা যান।

আমরা বিনীতভাবে দোয়া করি যেন সমস্ত মানুষ বিভ্রান্তি এবং প্রতারণামূলক লেখার প্রভাব এড়িয়ে এই বইটিকে বুদ্ধিমত্তা ও মনোযোগের সাথে পড়তে পারে, এবং এর মাধ্যমে এই জগতের শান্তি এবং আখেরাতের চিরন্তন সুখ অর্জন করতে পারে।

এই বইয়ে অনূদিত কোরআনের আয়াতের অর্থ মা'আল শেরেফ অর্থাৎ মুফাসসিরগণের বর্ণনা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা আয়াতে যা বুঝিয়েছেন তার হুবহু হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। ইংরেজি পাঠকদের নিকট অপরিচিত আরবি এবং অন্যান্য অ-ইংরেজি পরিভাষাগুলোর একটি শব্দকোষ বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

MîlâdîHijrî ShamsîHijrî Qamarî

খ্রিস্টাব্দ-২০০১ হিজরি শামসী-১৩৮০ হিজরি ক্বমরি-১৪২২

প্রথম অংশ
নবুওয়াতের প্রমাণ
মুখবন্ধ

অসীম কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালার প্রতি যিনি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের প্রতি চারটি প্রধান গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এই গ্রন্থগুলোতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা নেই। তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) -এর প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থটি হচ্ছে আল কুরআনুল কারিম, যেখানে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে কাফেরদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে তার বান্দাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি ইসলামের অনুগত লোকদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। পূর্ববর্তী সময়েও আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য স্পষ্ট আয়াত এবং গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা সহকারে নবীদের পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে মুহাম্মাদ (দঃ) এর পরে আর কোনো নবী আসবে না। তিনি এই আদেশ দিয়েছেন যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি যেভাবে অন্য একজন ব্যক্তির নির্দশনা মোতাবেক নিজেকে পরিচালিত করে এবং অসহায় অসুস্থ ব্যক্তি নিজেকে সহানুভূতিশীল ডাক্তারদের যত্নে সঁপে দেয়, ঠিক একইভাবে মানুষদেরও তাদের নিকট পাঠানো নবীগণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে যাতে তারা ধারণাতীত কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দয়ালু হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তার উম্মতকে সর্বশ্রষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে ঘোষণা করেন যে তাঁর আচরণে কোন মাত্রাধিক্য বা

ত্রুটি নেই, তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি সকল সৃষ্টিজীবের নবী। তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর বান্দাদের এই সত্যটি জানাতে যে আল্লাহ তায়ালা হলেন এক এবং তাদের অসুস্থ হৃদয়ের চিকিৎসার জন্য। আমরা অসংখ্য দরুদ ও সালাম পাঠ করছি রাসূল (দঃ) এর উপর, তাঁর পরিবারের এবং সাহাবাদের উপর। তারা ছিলেন সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং অন্ধকার থেকে বের হয়ে আলোর পথের নির্দেশক তারা।

এখন জানা যাক যে এই ব্যক্তি অর্থাৎ, [আল-ইমাম আর রব্বানী মুজাদ্দাদ ই আলফে সানী] আহমাদ ইবনে আবদুল আহাদ, যিনি আল্লাহ তায়ালার দয়ার মুখাপেক্ষী এবং পুনরুত্থান দিবসের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে, পূর্বসূরী, উস্তাদ ও শিষ্যদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। তিনি আফসোসের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সময়ের লোকেরা নবীগণের আগমনের প্রয়োজনীয়তা, কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবী এবং শেষ নবীর আনীত দ্বীন -এসবের প্রতি বিশ্বাসে ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে। উপরন্তু ভারতে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ইসলামের অনুসরণকারী ধার্মিক মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নামের উপহাস করতো এবং তাদের পিতামাতার দেয়া ধর্মীয় সুন্দর নামের পরিবর্তে অর্থহীন নাম রাখতো। ঈদুল আযহার সময় মুসলমানদের জন্য গরু কোরবানী করা ওয়াজিব কিন্তু ভারতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মসজিদগুলি ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে অথবা যাদুঘর বা দোকানে পরিণত করা হচ্ছে। মুসলমানদের কবরস্থানগুলো খেলার মাঠ বা ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা করা হচ্ছে। স্মৃতিসৌধের নামে অবিশ্বাসীদের গীর্জা পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে। মুসলমানদের দ্বারা তাদের রীতি ও উৎসবগুলোও উদযাপিত হচ্ছে। এক কথায়, ইসলামের আবশ্যিক বিষয়গুলো এবং ইসলামী রীতিনীতিকে ঘৃণা করা হচ্ছে অথবা একেবারেই বর্জন করা হচ্ছে। আর এসবকে বলা হচ্ছে "পশ্চাদমুখিতা"। অবিশ্বাসী এবং নাস্তিকদের প্রথা, মিথ্যা ধর্ম, অনৈতিক ও নির্লজ্জ কাজকর্ম প্রশংসিত হচ্ছে। এসব প্রচার-প্রসারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারতীয় কাফেরদের বিকৃত রুচি ও নিকৃষ্ট বই, উপন্যাস এবং গান মুসলমানদের ভাষায় অনূদিত এবং বিক্রি করা হচ্ছে। এভাবে ইসলাম ও ইসলামের সুন্দর নীতিমালাগুলোকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চলছে, যা ফলস্বরূপ মুসলিমদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ছে। অথচ কাফের এবং নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমনকি ধর্মীয় ব্যক্তিগণ, যারা কুফরের নিরাময়কারী হবে, তারাও এই দুর্যোগের মধ্যে পতিত হচ্ছে এবং বিপর্যয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

আমি মুসলিম শিশুদের বিশ্বাসে এই দুর্নীতির কারণ নিয়ে গবেষণা করেছি এবং তাদের সন্দেহের উৎস উদ্ভাবন করেছি। আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম যে তাদের ঈমানের দুর্বলতার একটি মাত্র কারণ। আর এই কারণটি হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, একই সাথে কিছু ধর্মান্ধ, স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং কিছু মূর্খ ব্যক্তি, যারা নিজেদেরকে বিজ্ঞানী মনে করে, তারা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলে এবং তাদের কথাগুলো সত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আমি এমন লোকদের সাথে কথা বলেছি যারা বিজ্ঞানের এই ভণ্ডামিযুক্ত লেখা পড়ে এবং বিশ্বাস করে এবং এসবের কারণে নিজেদেরকে আলোকিত, আধুনিক মানুষ হিসেবে অভিহিত করে। আমি দেখেছি যে তারা বেশিরভাগই নবুওয়াতের মর্যাদা বুঝতে ভুল করে। আমি তাদের অনেককে বলতে শুনেছি, "নবীগণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে মানুষ একে অপরের সাথে ভালভাবে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং সুন্দর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। পরকালের জীবনের সাথে এর কিছুই করার নেই। দর্শনশাস্ত্রের বইগুলোতেও ভাল ব্যবহার করার এবং ভাল অভ্যাস গড়ে তোলার উপায় রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ আল-গাজালী তাঁর বই “ইহইয়া’ উলুমুদ দ্বীন”কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে তিনি সুন্দর অভ্যাসে বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলোকে তিনি মুনজিয়াত (যা রক্ষা করে) বলেছেন। অন্য তিনটি ভাগে তিনি নামাজ, রোযা ও অন্যান্য 'ইবাদত' সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর এই বইটি দর্শনের বইগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ থেকে বোঝা যায় যে ইবাদত মুনজি (যা রক্ষা করতে সক্ষম) নয় এবং এই মুক্তি সুন্দর অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।“ অন্যরা বলে, “যে ব্যক্তি নবী, তাঁর বাণী এবং অলৌকিক কাজ সম্পর্কে শুনেছে, কিন্তু নবীজীর ইন্তেকালের পর বহু শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ায় এই তথ্যকে অস্বীকার করে, সে ঐ ব্যক্তির মতোই যে পাহাড়ে বা মরুভূমিতে বসবাস করে এবং নবী সম্পর্কে কখনোই কিছু শুনেনি। পরেরজনের মতো প্রথম জনেরও ঈমান থাকতে পারেনা।“

তাদের জবাবে আমরা বলি যে, আল্লাহ তা'আলা অনন্তকালের জন্য মানুষকে দয়া করেছেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং তাদের অন্তরের রোগ নিরাময় করার জন্য নবীদের পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালন করার স্বার্থে নবীগণ অবশ্যই অবাধ্য ব্যক্তিদের পরকালের শাস্তির হুমকি দিয়েছেন এবং অনুগতদের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা অবশ্যই প্রথমজনকে পরকালের শাস্তির ব্যাপারে এবং পরেরজনকে

পুরস্কারের ব্যাপারে জানিয়েছেন। মানুষ সর্বদা তার পছনদের জিনিসগুলো অর্জন করতে চায়। এসব অর্জনের জন্য সে বিপথে যায়, পাপ করে এবং অন্যদের ক্ষতি করে। তাই মানুষদের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং ইহকাল ও পরকালে শান্তিপূর্ণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের জন্য নবীদের প্রেরণ করা জরুরি ছিল। ইহকালের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পরকালের জীবন অনন্ত। একারণে পরকালের সুখ শান্তি অর্জন করাই অগ্রগণ্য। নিজস্ব মতামত ও কল্পনা দিয়ে রচিত কিছু বই বিক্রি করার জন্য কিছু প্রাচীন দার্শনিক নৈতিকতা সুন্দর করার উপায় এবং ভালো কাজ যেগুলো তারা ঐশী গ্রন্থসমূহে পড়েছে অথবা যারা এসব গ্রন্থে বিশ্বাস করে তাদের কাছ থেকে শুনেছে, এমন কাজ করার মাধ্যমে নিজেদের সুশোভিত করেছে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজালী রহমাতুলল্লাহি আলাইহির তাঁর গ্রন্থে ইবাদতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সাথে সঙ্গতি রেখে ফিকাহশ্রাস্ত্রবিদগণ ইবাদতকে কীভাবে পরিচালনা করবেন তা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তারা তাদের সূক্ষ্ম বিবরণ দেননি, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল সঠিকভাবে ইবাদত সম্পাদন করার শর্তাবলী ও পদ্ধতি বর্ণনা করা। তারা মানুষের আত্মা এবং অন্তরের দিকে তাকাননি। কারণ এদের বর্ণনা করা তাসাউফশাস্ত্রবিদগণের দায়িত্ব। হযরত আল-ইমাম আল-গাজালী শারীরিক উন্নতি ও বাহ্যিক কাজের জন্য উপকারি ধর্মীয় জ্ঞানকে একত্র করেছেন তাসওয়ফের জ্ঞানের সাথে, যা অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা অর্জনে সহায়তা করে। তিনি তার বইয়ে উভয়টিই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি পরেরটিকে মুনজিয়াত নাম দেন, অর্থাৎ, যে শিক্ষা বিপর্যয় প্রতিরোধ করে। তবুও তিনি বলেছেন ইবাদতও মুনজি। ফিকহের বই পড়ার মাধ্যমে ইবাদাত যা মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচিত তা আদায় করা শিখা যায়। হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত মুক্তির যে শিক্ষাগুলি ফিকাহের বই থেকে শিখা যায়না, তা বিশিষ্ট ইমামদের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়।

আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ক্যালিনো বা ব্যাকরণবিদ আমর সিবাওয়াইকে দেখিনি। কিভাবে আমরা জানি যে তারা জ্ঞানের সেই শাখায় বিশেষজ্ঞ ছিল? আমরা জানি চিকিৎসা বিজ্ঞান বলতে কি বুঝায়। আমরা ক্যালিনোর বই পড়ি এবং তার কিছু বক্তব্য শুনি। আমরা শিখেছি, তিনি অসুস্থদের ওষুধ দিয়েছিলেন এবং তাদের নিরাময় করেছিলেন। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন। অনুরূপভাবে, যখন ব্যাকরণ বিজ্ঞানের কথা জানেন এমন একজন ব্যক্তি সিবাওয়াই এর বই পড়ে বা তার কিছু কথা শোনে, সে বুঝে এবং বিশ্বাস করে যে তিনি একজন ব্যাকরণবিদ ছিলেন। ঠিক একইভাবে যদি কোন ব্যক্তি নবুওয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং আল-কুরআন ও হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করেন, তবে তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। যেহেতু উপরে বর্ণিত আলেমদের মধ্যে কারো বিশ্বাসের স্খলন ঘটবে না, তাই অজ্ঞ ও পদচ্যুত ব্যক্তিদের অপবাদ ও কুৎসা মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি কারো ঈমানকে দুর্বল করতে পারবে না। কেননা, মুহাম্মদ (দঃ) এর সকল কথা ও কাজ মানুষকে পরিপূর্ণতার পথ দেখায়, তাদের বিশ্বাস ও আচরণ যথার্থ ও উপযোগী করে তোলে এবং তাদের হৃদয়কে আলোকিত করে তোলে যাতে তাদের রোগ নিরাময় করে এবং খারাপ অভ্যাসগুলো দূরীভুত করে। এটাই নবুওয়াতের অর্থ।

পাহাড়ে বা মরুভূমিতে বসবাসকারী (অথবা কমিউনিস্ট দেশ) একজন ব্যক্তি যে নবীদের কথা শুনেনি, তাকে শাহিক আল জাবাল বলা হয়। এ ধরনের লোকদের জন্য নবুওয়াতে বিশ্বাস করা অথবা নবীদের পাঠানো হয়েছে এরূপ বিশ্বাস করা অসম্ভব। এটা এমনি যেন তাদের জন্য কোন নবী আসেনি। তারা ক্ষমার যোগ্য। (মৃত্যুর পর যখন তাদের হিসাব শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণীদের মতো জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। অবিশ্বাসীদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে।) তাদেরকে নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়নি। তাদের সম্পর্কে সূরা আল-ইসরাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে: "আমি কারও প্রতি নবী প্রেরণ না করা পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি না।“

যে সকল ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিদের লিখিত বই এবং ধর্মের শত্রুদের বিষাক্ত লেখনী থেকে তাদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের সন্দেহ ও দ্বিধা দূর করার উদ্দেশ্যে আমি যা জানি তা লেখার কথা ভেবেছি। আসলে, আমি এই কাজটিকে মনে করেছি একটি দায়িত্ব, একটি ঋণ যা আমি মানবজাতির কাছে দায়বদ্ধ। এই বইটি লেখার মাধ্যমে, আমি নবুওয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করার, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তের পূর্ণ অধিকারের সত্যতা প্রমাণ করার, এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর করার এবং কিছু বিজ্ঞানমনস্ক ধর্মান্ধ যারা নিজেদের চিন্তাভাবনা ও মতামত দিয়ে এই সত্যটিকে দমন করার চেষ্টা করে তাদের ভ্রষ্টতা ও ক্ষতিসমূহ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। ইসলামী গবেষকদের বই থেকে তথ্য উদ্ধৃত করে এবং আমার বিনীত চিন্তা যোগ করে, আমি ইসলাম বিদ্বেষীদের চিন্তাভাবনা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি।

বইয়ে একটি ভূমিকা এবং দুটি নিবন্ধ রয়েছে। আর ভূমিকা দুটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে লিখতে শুরু করেছি।

হিজরী ক্বমরী-৯৯০ খ্রিস্টাব্দ-১৫৮২

আহমাদ ইবনে
আব্দুল আহাদ
আস সিরহিন্দী

পরিচয়-২
২- মুজিযা বলতে কি বুঝায়?

আমাদের কাছে, মুজিযা এমন একজন ব্যক্তির সত্যতা প্রমাণ করে যিনি একজন নবী ছিলেন।
মুজিযার জন্য কিছু শর্ত ছিল:

১। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সত্যতা প্রমাণের সহায়ক হিসেবে অসামান্য উপায়ে মুজিযা সৃষ্টি করেছেন।

২। এটা অসাধারণ হওয়া। স্বাভাবিক কোন বিষয় যেমন প্রতিদিন পূর্ব দিকে সূর্যের উদিত হওয়া বা বসন্তকালে ফুল ফোটা এসব মুজিযা হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

৩। সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য এই সকল কাজ করা অসম্ভব।

৪। নবীগণ যখনই ইচ্ছা করতেন, তা সংঘটিত হওয়া।

৫। মুজিযা নবীগণের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, যদি তিনি বলেন যে তিনি কোনো মৃতব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবেন এবং যদি সেটার পরিবর্তে অন্য কিছু হয়ে যায় যেমন, যদি একটি পর্বত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তবে তা মুজিযা হবে না।

৬। কোনো ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত মুজিযা তাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন না করা। উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি অলৌকিকভাবে কোন নির্দিষ্ট জন্তুর সাথে কথা বলছেন, তখন যদি সেই জন্তুটি বলে, "এই লোক মিথ্যাবাদী," তবে এটি মুজিযা হবে না।

৭। কেউ নবী হিসেবে দাবি করার পূর্বে তার মুজিযা প্রকাশিত হয় না। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের অলৌকিক ঘটনাসমূহ যেমন: দোলনায় থাকাবস্থায় ঈসা (আঃ) এর কথা বলা, শুকিয়ে যাওয়া গাছ থেকে খেজুর চাওয়ায় তাঁর হাতে খেজুর চলে আসা, মুহাম্মদ (সাঃ) এর শৈশবকালে তাঁর বুক ছিড়ে কলব ধুয়ে পরিষ্কার করা, তাঁর মাথার উপর মেঘের ছায়া প্রদান করা এবং গাছ ও পাথরের তাঁকে সালাম প্রদান করা- এগুলো মুজিযা নয় বরং কারামত।

এগুলোকে বলা হয় ইরহাসাত (নবুওয়াতের প্রাথমিক চিহ্ন)। এসব নবুয়াতকে জোরালো করেছিল। ওলী আওলিয়াদের মাধ্যমেও কারামত প্রকাশ সম্ভব। নবীদেরকে নবুওয়াতের সংবাদ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের মর্যাদা আউলিয়াদের থেকে কম নয় বরং বেশি ছিল। তাদের থেকে কারামত প্রকাশ পেত। নবীগণ নবুওয়াতের খবর অবগত হওয়ার পরই অবিলম্বে মুজিযা সংঘটিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তিনি বলেন যে এই ধরনের একটি ঘটনা এক মাস পরে অনুষ্ঠিত হবে, যখন সেই ঘটনা ঘটবে তা মুজিযায় পরিণত হবে। কিন্তু এটি ঘতার আগেই তার নবুয়াতে বিশ্বাস করা জরুরি হবে না।

একজন নবীর সত্যতা প্রমাণকারী মুজিযা বুদ্ধির জন্য শুধুমাত্র একটি আবশ্যকীয় শর্তই নয়। অর্থাৎ, এটি প্রতিনিধিকে নির্দেশ করে এমন কোনো কাজের অনুরূপ নয়। কোনো কিছু অন্য কিছুর প্রমাণ এই বিষয়টি বুদ্ধির বুঝে আসার জন্য সেই দুটি জিনিসের মধ্যে কণ সম্পর্ক থাকা জরুরী। যখন প্রমাণ দেখা যায়, তখন অন্যকিছুর অস্তিত্ব নয়; বরং ওই সম্পর্কিত জিনিসটির অস্তিত্বই উপলব্ধি করা যায়। মুজিযার ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ: কেয়ামতের দিন যখন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, সেদিন আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তারাগুলো খসে পড়বে, পাহাড়-পর্বত গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে। সে সময়টা কোনো নবীর সুভাগমনের সময় নয়। এসব প্রত্যেক নবীর ভবিষ্যদ্বানি করা মুজিযা। কিন্তু যারা এসব শুনেছে তাদের জন্য এটা জানা জরুরি নয় যে এসব মুজিযাই। একজন ওলীর কারামত নবীর মুজিযা হওয়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, যদিও সেই নবীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা এ পর্যন্ত যা বলেছি সে সম্পর্কে সোইয়দ শরীফ আল জুর-জানীর শরহে মাওয়াকিফ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অধিকাংশ আলেমের মতে, যদিও প্রকাশ্য “তাহাদ্দী” বা চ্যালেঞ্জ যেমন: এই কথা বলা, “তুমি সামনে এগিয়ে যাও এবং একই কাজ করো। কিন্তু তুমি পারবে না” মুজিযার জন্য শর্ত নয়, মুজিযার অর্থের মাঝেই তাহাদ্দী

বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেহেতু পুন্নুত্থান দিবস এবং ভবিষ্যতের ঘটনার ব্যাপারে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেসবে তাহাদ্দী জরুরি বিষয় নয়, তাই এসব কাফেরদের বিরুদ্ধে মুজিযাও নয়। মুমিনরা বিশ্বাস করে যে এই বর্ণনাগুলোই মুজিযা। আউলিয়া কেরাম নবুয়তের দাবি করেননা এবং তাদের কারামতে কোনো তাহাদ্দী থাকেনা বলে তাদের কারামতসমূহ মুজিযা নয়। চ্যালেঞ্জিং নয় এমন বিস্ময়কর কাজগুলো নবুয়ত দাবি করা কোনো ব্যক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না। কিন্তু তা এটা ইঙ্গিত করে না যে, মুজিযাও তা পারেনা। অন্যদিকে, মুজিযার মাধ্যমে এটাই আশা করা হয়।

প্রশ্নঃ " অলৌকিক বিষয় হওয়ায় মুজিযা নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। তাহলে প্রশ্ন হলো নবুওয়াত প্রমাণের জন্য মুজিযার কি আলাদা কোন ক্ষমতা আছে?

উত্তরঃ ব্যাপারটি এরকম নয়। মুজিযা নবুওয়াত দাবির বৈধতা প্রমাণ করে এই কারনে যে অন্যরা কাজটি করতে পারেনা। যা ইঙ্গিত করে, মুজিযার আলাদা প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটিই আসল প্রমাণ।

প্রশ্নঃ শরহে মাওয়াকিফে সাঈদ শরীফ আল-জুরজানী বলেছেন, 'কোনো বিবৃতি নিজেই কোনো প্রমাণ হতে পারে না। কেননা যিনি নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করছেন তার সত্যতার উপর বিশ্বাস করাও জরুরি এবং এটা তখনই সম্ভব যখন আকল বা বোধশক্তি তার সত্যতার স্বীকার করে। আর মুজিযা দেখেই আকল বিশ্বাস করে যে নবী সত্য বলছেন।' আল-জুরজানীর এই লেখা থেকে বুঝা যায়, নবীদের সত্যতা প্রমাণকারী মুজিযা আকলের মাধ্যমে বিবেচনা করা হয়, আর এর পূর্বেই তিনি বলেছিলেন যে বুদ্ধির মাধ্যমে মুজিযা বিবেচনা করা হবে না। এই দুটি বক্তব্য একটি আরেকটির বিপরীত নয় কি? "

উত্তর: উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদ থেকে বুঝা যায়, বুদ্ধিবৃত্তি নবুয়তের সত্যয়নকারী মুজিযা নিয়ে চিন্তা করে। মুজিযার সত্যতা প্রমাণে বুদ্ধির কোনো প্রভাব আছে কিনা তা নিয়ে বলে না। এমনকি যদি আমরা স্বীকার করেও নিই যে এটি বুদ্ধির কিছু প্রভাব আছে বুঝায়, তবুও তা দ্বারা একথা বুঝাবে নে যে কেবল বুদ্ধি দিয়েই মুজিযার বিচার করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই- এমন কেউই বলেনা, তাই এ ধরনের বৈপরিত্য অবান্তর। সাইয়্যদ আল জুরজানী বিবৃত (নকলী) মুজিযার ব্যাখ্যায় এরূপ বলেছেন, যা এ প্রকার মুজিযার ক্ষেত্রে যথার্থ ছিল।

কোনো নবীর সত্যয়নকারী মুজিযা এমন বিশ্বাসও নয়, যা শ্রুত বিষয় থেকে অর্জিত হয়। এটা একটা প্রাকৃতিক বিষয়। অর্থাৎ, যখন কোনো একটি মুজিযা দেখানো হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা মুজিযা প্রত্যক্ষকারি ব্যক্তিদেরকে এই জ্ঞানটি দিয়ে দেন যে মুজিযা প্রদর্শনকারি নবুয়তের দাবিদার ব্যক্তি সত্য বলছে। এটিই আল্লাহ তায়ালার ঐশ্বরিক বিধান। এটির কারণ হলো, একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির মুজিযা প্রদর্শনের সক্ষমতা থাকলেও এরূপ কখনো ঘটেনি। যদি নবুয়তের ঘোষণাকারী ব্যক্তি একটি পর্বতকে উপরে উঠিয়ে বলে, "যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে এই পর্বতটি তার জায়গায় ফিরে যাবে। যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস না করেন, তবে এটি আপনাদের মাথার উপর পড়বে," এবং যদি তারা দেখতে পায় যে পর্বতটি তাদের বিশ্বাসের কারণে নিজ জায়গায় প্রত্যাবর্তন করছে এবং তাদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের দিকে আসছে, তাহলে ঐশ্বরিক নিয়মেই বুঝা যাবে যে তিনি সত্য বলছেন। হ্যা- বুদ্ধির বিবেচনায়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির পক্ষেও এ ধরনের অকাট্য মুজিযা প্রদর্শন করা সম্ভব। কিন্তু এরূপ হওয়া আল্লাহ তায়ালার ঐশ্বরিক বিধান নয়। অর্থাৎ, এরকম কখনোই দেখা যায়নি।[১] উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তি নিজেকে একজন রাজার দূত বলে দাবি করল এবং বলল, "যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো, আমার চিঠি রাজার কাছে নিয়ে যাও।" চিঠিতে বলা হয়েছে: "আমি আপনার দূত একথা যদি সত্য হয়, তবে আপনি সিংহাসন থেকে নেমে মেঝেতে বসুন!" যারা তা দেখল, তারা স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করল যে লোকটি সত্য বলেছে। এই বিশ্বাস "অজানাকে জানার সাথে তুলনা করা"র মতো নয়; অর্থাৎ, অদেখা কোনো বিষয়কে (অস্তিত্ব) অন্য কিছুর মাধ্যমে বুঝা। তাই, মুজিযা অবশ্যই সত্যতা প্রমাণ করে। মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, কোনো মিথ্যাবাদীর পক্ষে মুজিযা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।

যাদু এবং অনুরূপ অবাস্তব বিষয়গুলো এমন নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার ফল, যা এসবের কারণ হিসেবে কাজ করে অথবা কখনও এসব এমন বিভ্রম যা কারো কল্পনায় চিত্রিত হয়, যদিও এসবের কোনো অস্তিত্বই নেই। এসব বিস্ময়কর কিছুই না।

১. মানুষের বিবেক কোনো মিথ্যাবাদীর মুজিযাকে বিশ্বাস করে বলে, " যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, তিনি এটাও করতে পারেন।" এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ তায়ালার ঐশ্বরিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অথবা এই সিদ্ধান্তের সাথে মানানসই বিরল কোন ঘটনার সাথেও না। তবে তা আল্লাহ তায়ালার ঐশ্বরিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ধারণার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আসন্ন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের হত্যা বা পুনর্জীবিত করা তার মিথ্যাবাদী হওয়ার তথ্যকে পরিবর্তন করবে না। নমরুদের আগুনে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর না পোড়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার বিধান 'আগুনের পোড়ানোর ক্ষমতা'কে পরিবর্তন করে না। যাইহোক, প্রমাণের মাধ্যমে বিবেক দ্বারা অর্জিত তথ্যবিরোধী ঘটনাগুলো এই তথ্যের ক্ষতি করে।

নিবন্ধ-১
৩- নবী প্রেরণ এবং এর প্রয়োজনীয়তা

মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন সে কোনো কিছুর ব্যাপারেই জানেনা। তার চারপাশের জগত এতই বিস্তৃত যে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এর মাত্রা জানেন। সূরা আল-মুদ্দাসসির এর ৩১নং আয়াতে এটি বলা হয়েছে। একটি শিশু তার ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলোর মাধ্যমে জীবের শ্রেনিবিভাগ উপলব্ধি করতে শুরু করে। প্রত্যেক জীবের শ্রেনিকে 'আলম' বলা হয়। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে প্রথমে স্পর্শানুভূতি তৈরি করা হয়; স্পর্শ করার ক্ষমতা দ্বারা মানুষ ঠান্ডা, গরম, ভিজা, শুষ্ক, নরম, কঠিন ইত্যাদির মত বিষয় গুলো অনুভব করতে পারে। স্পর্শানুভূতি রঙ বা শব্দ অনুভব করতে পারে না এবং এসব অস্তিত্বহীন মনে হয়। অতঃপর দর্শন ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করা হয় এবং এর দ্বারা রং এবং আকার অনুভূত হয়। এই ইন্দ্রিয় দ্বাতা অনুভূত জগত স্পর্শজগতের চেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং এখানে অনেক জীবের সমাবেশ। এরপর আছে শ্রবণ ইন্দ্রিইয়ের কাজ। এই অঙ্গের মাধ্যমে শব্দ এবং সুর অনুভব করা যায়। এরপর তার স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং গন্ধ অনুভব করার ক্ষমতা তৈরি করা হয়। এইভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয় অঙ্গ তৈরি করা হয় যা বিশ্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধ করতে পারে। অতঃপর জীবনের সপ্তম বছরের দিকে, তাঁর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা (তাম'ইয) সৃষ্টি করা হয়, যার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় অঙ্গের মাধ্যমে বোঝা যায় না এমন বিষয়ও উপলব্ধি করা যায়। এই ক্ষমতা ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে অনুভূত বিষয়গুলোকে একটি অন্যটি থেকে আলাদা করে। তারপর তার বিবেক বা জ্ঞান তৈরি করা হয়। উপকারী, ক্ষতিকর, ভালো বা খারাপ এসব বিবেচনার ক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত করতে পারে। আর বিবেক প্রয়োজনীয়, অনুমিত, সম্ভব বা অসম্ভব এই বিষয়গুলোকে একটি অপরটি থেকে আলাদা করে। বিবেক এমন বিষয়গুলো বোঝে যা উপলব্ধি ও বিবেচনার ক্ষমতা দ্বারা বোঝা যায় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে বিবেকের পাশাপাশি অন্য একটি ক্ষমতাও সৃষ্টি করেন। বিবেকের মাধ্যমে যেসব বিষয় বোঝা যায় না সেগুলো এবং ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা এই ক্ষমতা দ্বারা জানা যায়। এটিকে নবুয়াত বলা হয়। কারণ বিবেচনা শক্তি জ্ঞানের ধীশক্তির বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করতে পারে না, এগুলো তাদের কাছে অপরিচিত। যেহেতু বিবেক নবুওয়াত দ্বারা অনুভূত বিষয়গুলো বুঝতে পারে না, তাই বিবেক তা অবিশ্বাস ও অস্বীকাত করে। বুঝতে না পারা বিষয়গুলোকে অস্বীকার করা তা বুঝতে না পারারই ফল। যেমন: কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি কোনো রঙ বা আকৃতি সম্বন্ধে না শোনা পর্যন্ত এসব ব্যাপারে কিছুই জানবে না। সে এসবের অস্তিত্বে বিশ্বাসই করবে না। নবুওয়াতের শক্তি বিদ্যমান একথা বান্দাদের কাছে প্রকাশের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষমতার অনুরূপ মানুষের স্বপ্ন সৃষ্টি করেছেন। স্বপ্নে একজন মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পারে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা অথবা আলমে মিছালে তার কল্পনায়। স্বপ্ন সম্পর্কে জানেনা এমন মানুষকে যদি বলা হয়, "যখন মানুষ অচেতন হয়ে পরে এবং মৃত ব্যক্তির মত চিন্তাভাবনা ও ইন্দ্রিয় চলে যায়, তখন সে মনের উপলব্ধির বাইরের অজানা জিনিসগুলিকে দেখতে পায়", সে তা অস্বীকার করবে। এমনকি সে এমন বিষয়কে অসম্ভব হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে এই বলে যে, "মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করে। এই অঙ্গগুলি যখন অকার্যকর হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন তারা কাজই করে না, তখন মানুষ কিছুই বুঝতে পারবে না।" সে বরং কড়া যুক্তি দিবে। যেমনিভাবে ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলো জ্ঞান দ্বারা অর্জিত বিষয়গুলো বোঝে না, একইভাবে, জ্ঞানও নবুওয়াতের শক্তি দ্বারা উপলব্ধ বিষয়গুলোকে বুঝতে পারে না।

যারা নবুওয়াতের শক্তির অস্তিত্বকে সন্দেহ করে তারা এর সম্ভাবনাকেও সন্দেহ করে অথবা এর সম্ভাবনা তাদের কাছে গ্রহণীয় হলেও এর সংঘটনে সন্দেহ করে। তাদের জেনে রাখা ভালো, এর অস্তিত্ব বা সংঘটন প্রামণ করে যে এটা সম্ভব। আর নবীগণ সাধারন বুদ্ধির বাইরের তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই তথ্যগুলো কোন বুদ্ধি, হিসাব-নিকাশ , পরীক্ষা বা চিন্তাগবেষণার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না; বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইলহাম এর মাধ্যমে জানা যায়। নবুওয়াতের শক্তিরও আলাদা কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেহেতু স্বপ্নের মধ্যে এর একটি বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে, তাই আমরা স্বপ্নকে এর একটি উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি। যারা তাসাউফের পথে সংগ্রাম করে, তাদের কাছে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যওক তথা অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আমরা যে বিশেষত্বটি এখানে প্রকাশ করেছি তা নবুওয়াতে বিশ্বাসকে প্রমাণ করতে যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাজালীও নবুওয়াতের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য তাঁর লিখিত বই আল-মুন্কিদ মিন আদ-দালাল উক্ত বিশেষত্বটি লিখেছেন।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মতে, নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস করা জরুরী। তারা বলে, “নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও জ্ঞানের ব্যাপারে গভীর চিন্তা করাও এর অনুরূপ। এছাড়াও, বুদ্ধির ক্ষমতার বাইরের অনেক উপকারি বিষয়ও নবীদের কাছ থেকে শেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ পুনরুত্থান দিবস, পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, কোনটি ভালো এবং কোনটি খারাপ সেই সম্পর্কে জানা এবং কিছু খাবার ও ওষুধ মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিনা ক্ষতিকর তার জ্ঞান।

যারা নবুওয়াতে বিশ্বাস করে না, তারা বলে:
১। নবী হিসেবে প্রেরিত ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে জানা উচিত যে, যিনি বলেছেন, ‘আমি আপনাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বার্তা পৌঁছিয়ে দিন!’ তিনি আল্লাহই। আর এভাবে আল্লাহকে জানা কোনোভাবেই সম্ভব না। সুতরাং এই কথাগুলো বলা ব্যক্তিটি কোনো জিন হতে পারে। তাই সকল ধার্মিকরাই জিনকেই বিশ্বাস করে।“

উত্তর: যে ব্যক্তিকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল,মুজিযার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি একজন নবী। আর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মুজিযা সৃষ্টি করেন। কোন জিন তা সৃষ্টি করতে পারে না। না অন্য কোন প্রাণী তা করতে পারে।

২। “নবীর নিকট ওহী নিয়ে আগত ফেরেশতার যদি আকৃতি থাকতো, তাহলে সেখানে উপস্থিত অন্য ব্যক্তিরাও তাকে দেখতে পেতেন। কিন্তু তোমরাও বলো যে উপস্থিত কেউ তাকে দেখেনি। যদি তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়ে কোনো আত্মা হতো, তাহলে তার জন্য কখনোই কথা বলা বা শোনা সম্ভব হতো না। যদি তোমাদের উত্তর হয়, ‘যে ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবীর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে তাঁর কুদরতের মাধ্যমে তাকে দেখা যাবেনা,’ তাহলে অবশ্যিকভাবেই আমরা আমাদের সামনের পর্বত দেখতে পেতাম না বা কাছের কোনো ড্রাম বাজার আওয়াজ শুনতে পেতাম না, যা হাস্যকর একটি বিষয়।“

উত্তর: যিনি ওহী নিয়ে আসতেন, তিনি একজন ফেরেশতা। ফেরেশতাগণ খুবই সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ। আল্লাহ তায়ালা বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ জিনিসগুলি দেখানোর জন্য বাধ্য নন। বাতাস একটি পদার্থ। তবুও স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হওয়ায় এটি দেখা যায় না। এখন যদি বলি কঠিন বস্তু দেখা যায় না তাহলে তা হাস্যকর হবে। একটি আত্মা দৃশ্যমান আকৃতি নিতে, কথা বলতে এবং তাকে শোনা যেতে পারে, যা অনেক সময় ঘটেছে।

৩। “কোনো নবীকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এটা বোঝা জরুরি যে তিনি একজন নবী। আর এটি শুধুমাত্র দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব। তাকে দেখে তদস্থলেই তার সত্যয়ন করা অযৌক্তিক।“

উত্তর: কোনো নবীর মুজিযা দেখার পর তিনি সত্য বলছেন তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। বরং যারা তা দেখেছে বা এ সম্পর্কে জেনেছে, অবিলম্বে তাদের তা স্বীকার ও বিশ্বাস করতে হবে।

৪। “একজন নবীর দায়িত্ব হলো ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া এবং ক্ষতিকর কাজের ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করা। আর এটি মানবজাতির উপর জোরপূর্বক বাধ্যতামূলক করা অন্যায় হবে। তোমরা বলো যে 'আল্লাহ তা'আলা মানুষের কর্ম সৃষ্টি করেছেন; এই কাজে মানুষের কোন ভূমিকা নেই।' অতএব এটা বুঝায় যে মানবজাতি যা করতে পারে না তা করতে তাকে বাধ্য করা হয়।“

উত্তর: বান্দার ক্ষমতা তার কর্মের সৃষ্টির উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তবে সে তার কাজের সৃষ্টি এবং এর কারণ তৈরি করা ইচ্ছা করতে পারে। এটিকে বলা হয় কাসব (অর্জন)। মানবজাতি তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারার সামর্থকে কাসব বলা হয়। মানবজাতিকে এটাই করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫। “জোরপূর্বক আদেশ পালন মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আর তা পালন না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। উভয়টিই মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন হাকিম (সর্বজ্ঞ), তিনি ক্ষতিকর কাজ করেন না।“

উত্তর: এই ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হলো মানবজাতিকে আদেশকৃত প্রতিটি বিষয় তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে উপকারী। এসব আদেশ পালনে যতটুকু ক্লান্তি লাগে এর তুলনায় এসবের উপকারিতা বহুগুণ বেশি। তাই মাত্র অল্প পরিশ্রম এড়ানোর চেষ্টা করে এত বেশি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৬। "যদি আদেশকৃত কাজ পালনের ক্লান্তির বিনিময়ে প্রতিদানের কোনো সুযোগ না থাকে, তাহলে এধরনের আদশ দেয়া অযৌক্তিক। যদি এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকে এবং এসবই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার জন্য উপযোগী হয়, তবে এর অর্থ হল আল্লাহ তায়ালার তাঁর বান্দাদেরকে প্রয়োজন, যা আসলেই বিপরীত। যদি এগুলো মানুষের জন্য উপকারী হয়, তবে তা কার্যকর করার আদেশ দেয়া এবং এরপর এগুলো আদায় না করলে শাস্তি দেয়া অযৌক্তিক। অন্য কথায়, এই আদেশের অর্থ হলো 'তোমাদের জন্য যা উপকারী হয় তা আদায় করো অথবা নয় আমি তোমাদের চিরকাল শাস্তি দিব'।"

উত্তর: বুদ্ধি যা কিছু সুন্দর, কুৎসিত বা অযৌক্তিক মনে করে, তা সবসময় যুক্তিসঙ্গত হয়না। আর এটা বলাও ঠিক নয় যে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টিকে উপকারী হতে হবে। আমরা এই বিষয়টি পরে প্রমাণ করবো। উপকারী কিছু আদায় না করার কারণে অনন্তকাল শাস্তি দেয়া হবে তা কিন্তু নয়; বরং বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার, তার মালিকের আদেশ পালন না করার কারণেই তা দেয়া হবে। তাঁর আদেশ পালন না করা তাঁর প্রতি আনুগত্যহীনতা, অবিশ্বাস ও দৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল।

৭। "যদিও আল্লাহ জানেন যে তাঁর বান্দা এটি করতে পারে না অথবা সে নিজের জন্য ভালো কিছু করতে চায় না, তবুও কেন তিনি এমন আদেশ দেন? এমন হুকুম কি তার বান্দার জন্য অনুপযোগী ও ক্ষতিকর হবে না?"

উত্তর: যেমনটি আমরা উপরে বর্ণনা করেছি, যদি আমরা স্বীকার করেও নিই যে এই ধরনের আদেশ তাঁর বান্দার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তবে অসামান্য পুরস্কার অর্জনের জন্য তুচ্ছ সমস্যা সহ্য করায় যায়। ইসলামের ৭২টি মতবিরোধপূর্ণ দলের অন্যতম মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, একজন অবিশ্বাসীর কাছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দেয়ারও কিছু উপকারিতা রয়েছে। তাকে সওয়াব অর্জনে উৎসাহী করা জরুরী। সওয়াব হলো এমন এক কল্যাণ যা আদেশকৃত কাজ সম্পন্ন করার দ্বারা অর্জন করা যায়। তা প্রস্তাবনা থেকে উদ্ভুত কল্যাণ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তি কাউকে রাতের খাবারে আমন্ত্রণ জানায় যদিও সে নিশ্চিত যে সে আসবে না। এভাবে সে তার উদারতা এবং দয়া প্রদর্শন করতে চায়। যদি সে তাকে আমন্ত্রণ না করে, তবে সে তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে আমি মুসলিম চিন্তাবিদদের বক্তব্য তুলে ধরা দরকারী বলে মনে করি:

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল ও অভাবী করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জামাকাপড়, খাবার, বাসস্থান, শত্রুদের বিরুদ্ধে সুরক্ষাসহ আরও অনেক কিছু দরকার। একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের সব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। তার জীবন এটার জন্য খুব ছোট। মানুষ একে অপরের সহযোগিতা নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে হয়। একজন মানুষ নিজের তৈরি করা জিনিস অন্যকে দেয়, যার বিনিময়ে তার প্রয়োজন মতো অপর ব্যক্তি অন্য কিছু দেয়। সহযোগিতার এই আবশ্যকতা এভাবে প্রকাশ করা হয় "মানুষকে সভ্য হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।" সভ্যতায় বসবাস করা অর্থাৎ, সমাজে বসবাসের জন্য ন্যায়বিচারের প্রয়োজন। প্রত্যেকেই নিজের যা প্রয়োজন তা পেতে চায়। এই ইচ্ছাকে শাহওয়া বলা হয়। যে কেউ তার সুবিধা কেড়ে নিলে সে তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে ঝগড়া, নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন দেখা দেয়। সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সব ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় নিয়মনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী, যার প্রত্যেকটিই একেকটি আইন। সেগুলি সবচেয়ে যথোপযুক্ত উপায়ে জানা উচিত। যদি মানুষেরা এসব আইন তৈরি করতে পারস্পরিক সমঝোতায় আসতে না পারে, তবে আবারো বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তাই এগুলো অবশ্যই এমন একজনের তৈরি করা উচিত, যিনি এর উপযুক্ত এবং যিনি মানবজাতির উর্ধ্বে। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাঁকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে এবং সিদ্ধান্তগুলো যে তাঁর কাছ থেকে এসেছে তাও বুঝতে হবে। মুজিযা হল এটা প্রমাণ করার উপায়। যারা নিজেদের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার (শাহওয়া) পিছনে ছুটে এবং উদ্ধত আচরণ করে, তারা ইসলামের নিয়মনীতি পছন্দ করে না। তারা এই নিয়মনীতি মেনে চলতে চায় না। তারা অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন করে এবং পাপ করে। যারা ইসলাম মেনে চলে তাদের সওয়াব দেয়া হবে এবং যারা ইসলামকে অমান্য করে তাদের শাস্তি দেয়া হবে- এটা ঘোষনা দেয়ার ফলে ইসলামী ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে। এইজন্য যিনি এই বিধিবিধান তৈরি করেছেন এবং যিনি শাস্তি দিবেন তাঁকে অবশ্যই জানা উচিত। এ লক্ষ্যে ইবাদত করার আদেশ করা

হয়েছে। প্রতিদিন ইবাদতের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়। তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর নবী ও পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যমেই ইবাদত শুরু হয়।

এসবে বিশ্বাস স্থাপন এবং ইবাদত করা থেকে ৩টি জিনিস উদ্ভুত হয়: প্রথমত, মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুসরণকে করা থেকে বিরত থাকে; হৃদয় ও আত্মা পবিত্র হয় এবং মানুষের ক্রোধের মাত্রা কমে যায়; কারণ কামনা এবং রাগ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বিভিন্ন জ্ঞান এবং তৃপ্তি উপভোগ করে, যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ও তৃপ্তির সাথে সম্পর্কিত নয়। তৃতীয়ত, ভালো কাজের বিনিময়ে পুরস্কার দেয়া হবে এবং খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতে হবে- এমনটি মনে করার ফলে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলিম চিন্তাবিদদের এই বক্তব্য মু'তাজিলাদের বক্তব্য "(আদেশ পালনের) প্রস্তাব দেয়া কার্যকর, এটা যুক্তিসঙ্গত" এর অনুরূপ।

৮। "যদি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন শাশ্বত অতীতে পূর্ব নির্ধারিত হয়, তবে এই ধরনের আদেশ অর্থহীন, বেমানান আর অযৌক্তিক হবে। এধরনের অনিবার্য কর্তব্য পালনের প্রস্তাব দেয়া নিরর্থক হবে। অপরদিকে, শাশ্বত অতীতে পূর্ব নির্ধারিত ছিল না এমন কর্তব্য পালনের আদেশ দেয়া মানে যন্ত্রণা দেয়া। এটির মানে বুঝাবে, 'অসম্ভবটি করো'।"

উত্তর: যেহেতু মানুষের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আছে, তাই এমন আদেশ দেয়া নিপীড়ন হবে না। আর আল্লাহ তা'য়ালার সমস্ত আদেশ মানুষের ক্ষমতার মধ্যে। হুকুমের বিষয়ে এই প্রশ্নের জবাবও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরের মতই হবে। অর্থাৎ, এটি বলা যাবে না যে আল্লাহ তাআলার এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যা অতীতে নির্ধারিত হয়েছে। আবার এটিও বলা যাবে না যে তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে অসমর্থ যা পূর্ব নির্ধারিত নয়।

৯। "শরীরের পক্ষে কষ্টকর এমন আদেশগুলো মানুষকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব চিন্তা ও উপলব্ধি করতে বাধা দেয়। আর এগুলো অন্যান্য কাজ করারও সময় দেয় না।"

উত্তর:আল্লাহ তায়ালার নির্দেশানাগুলো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি এবং জীবনের নিয়মাবলী সম্পর্কে বোধগম্যতা সৃষ্টি করে। আমরা উপরে সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১]

১। এই আদেশসমূহ গ্রহণ করা ঈমানের অপরিহার্য একটি বিষয়। অর্থাৎ, আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক-তা বিশ্বাস করা। যদি কেউ অধিকাংশ আদেশ বিশ্বাস করে, কিন্তু একটিকে অবিশ্বাস করে এবং সেটি মানতে না চায়, তাহলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অবিশ্বাস করবে। সে একজন কাফের হয়ে যাবে। মুসলিম হতে হলে অবশ্যই সব আদেশ বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু একজন মুসলিম যে সব আদেশ বিশ্বাস করলেও তা পালন করে না যেমন অলসতার কারণে সালাত আদায় না করে অথবা তার খারাপ বন্ধু বা নাফসের অনুসরণ করে মদ্যপান করে, অথবা কোন মহিলা বা মেয়ে যদি বেপর্দা অবস্থায় (হাত কিংবা মাথা না ঢেকে) ঘর থেকে বের হয়, তবে তার ঈমান নষ্ট হবে না বা সে কাফের হয়ে যাবে না। এই ধরনের ব্যক্তি একজন পাপী ও অবাধ্য মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। যদি কেউ কোনো একটি আদেশ পালন করতে না চায়, অর্থাৎ যদি তা অস্বীকার করে, দায়িত্ব হিসেবে গণ্য না করে, তবে সে তার ঈমান হারাবে এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হিসেবে গণ্য হবে। "আমি যদি নামাজ আদায় না করি এবং মাথা না ঢেকে বাইরে যাই, তাহলে কিই বা হবে? জীবনযাপন ও মানুষকে দয়া করা নামাজের চেয়ে প্রাধ্যন্য পায়" এ জাতীয় বক্তব্যের অর্থ হলো কিছু আদেশ মেনে নেয়া এবং বাকিগুলোকে অস্বীকার করা। প্রত্যেক মুসলিমকে এই সূক্ষ্ম বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং যারা আদেশগুলো অমান্য করে তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা তাদের ঈমান হারিয়ে না ফেলে। আদেশ অবহেলা করা তা মান্য না করার ইচ্ছা থেকে ভিন্ন। এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

১০। “মানুষের বিবেক যে জিনিসটি দরকারী বলে মনে করে তা করে, আর যা ক্ষতিকর মনে করে তা করেনা। আর যখন বিবেক যখন কোনো জিনিস উপকারী না ক্ষতিকর তা বুঝতে পারে না, তখন তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই করে। মানুষের বোধশক্তির এই কর্মক্ষমতার বিবেচনায়, নবীদের প্রেরণ করা অপ্রয়োজনীয়।“

উত্তর: মানুষের বিবেক বুঝতে পারেনা বা ভুলভাবে বুঝে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, এই বিষয়গুলো নবীদের মাধ্যমেই শিখতে হবে। একজন নবী একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতো। তিনি ওষুধের প্রভাব ভাল জানেন। কিছু ঔষধের প্রভাব দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে, কিন্তু সেসব জানার পূর্বে তারা ঝুঁকি এবং ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে এবং এর জন্য প্রচুর সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে বুদ্ধি ব্যবহার করার মতো সময় থাকবে না। ডাক্তারকে সামান্য প্রতিদান দিয়েই তারা ওষুধের সুবিধাগুলি পুরোপুরি অর্জন করে এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পায়। নবীগণ অপ্রয়োজনীয় বলাটা ডাক্তাররা অপ্রয়োজনীয় বলার মতোই। নবী কর্তৃক শেখানো সব আদেশগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী, তাই এগুলো সবই সত্য এবং উপকারী। আর ডাক্তারের জ্ঞান তার গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল হলেও সম্পূর্ণ সত্য বলা যায় না।

১১। “মুজিযার অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু এটি স্বাভাবিক ঘটনাগুলির ব্যতিক্রম অলৌকিক একটি বিষয়, তাই বুদ্ধি দিয়ে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই কারণে নবুওয়াতও যুক্তিসঙ্গত নয়।“

উত্তর: পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি মুজিযার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস ঘটা অসম্ভব মানে এই নয় যে প্রকৃতিতে নিয়মের বাইরে বিস্ময়কর কিছু ঘটতে পারে না। বহু শতাব্দী ধরে নবী ও আওলিয়াদের মাধ্যমে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। বুদ্ধিমান মানুষ এই ঘটনাগুলো অস্বীকার করতে পারে না। মুজিযা দ্বারা এটাই ইঙ্গিত করা হয় যে নবী সত্য বলেছেন। এটি বিস্ময়করই হতে হবে; প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে সম্ভবপর কোন কিছু মুজিযা হতে পারে না।

১২। একটি মুজিযা প্রমাণ করতে পারে না যে একজন নবী সত্য বলছেন। মুজিযা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নাকি নবী নিজেই তা তৈরি করেছেন- এটা নিশ্চিত নয়। জাদুও একটি বিস্ময়কর বিষয়। এখন তোমরাও জাদু, সম্মোহন এসবে বিশ্বাস করো।

উত্তর: অনুমান, তত্ব এর মত বিভিন্ন সম্ভাবনা বিবেচনায় রাখা বুদ্ধিমত্তা ইন্দ্রিয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। একটি নির্দিষ্ট জিনিসের উপস্থিতি আমাদের এর অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করতে বাধা দেয় না। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে, সবকিছুর অস্তিত্ব লাভে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রভাবই বিদ্যমান । অন্য কথায়, মুজিযা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, কোনো নবীর নয়। যদিও প্রত্যেকে যাদু ও অলৌকিক কাজ সম্পাদন করতে পারে না, তবুও সেগুলো (নবীগণের) সমুদ্রকে বিভক্ত করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া বা এমন ব্যক্তিকে অসুস্থতা থেকে সুস্থ করা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনায় ছিলো না- এসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। অতএব, এসব যাদু বিস্ময়কর মুজিযার সাথে গুলিয়ে ফেলার মত নয়।

১৩। “মুজিযার ঘটনা সে সম্পর্কে তাওয়াতুর[১] বর্ণনাসমূহ দেখা বা শোনার মাধ্যমে হয়। তাওয়াতুর হলেও কোনো বর্ণনা বাস্তবিক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। অতএব, যারা মুজিযা প্রত্যক্ষ করেনি, তারা কোনো নবী সম্পর্কে জানবে না, এই কারণে যে যারা তাওয়াতুর বা সাধারণভাবে অবগত হিসেবে মুজিযা বর্ণনা করে তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী থাকতে পারে।“

উত্তর: বেশিরভাগ পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে, তাওয়াতুরের মাধ্যমে পাওয়া বর্ণনাসমূহ বিশ্বাস করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি নামে একটি শহর আছে, পৃথিবী চাঁদের চেয়ে বড় এবং সূর্যের চেয়ে ছোট,বিজেতা মুহাম্মদ বাইজান্টাইন গ্রীকদের কাছ থেকে ইস্তাম্বুল জয় করেছিল- এই তথ্যগুলো অন্যদের কাছ থেকে শোনে বিশ্বাস করা হয়েছে।

১৪। আমরা ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আর আমরা যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিপরীত কিছু জিনিস খুঁজে পেয়েছি। এভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি। এগুলির উদাহরণ হলো, খাওয়ার উদ্দেশ্যে হত্যার মাধ্যমে পশুদের কষ্ট দেয়ার অনুমতি প্রদান, নির্দিষ্ট সময়ে উপবাস থাকা,

কিছু সুস্বাদু খাবার এবং পানীয় নিষিদ্ধ করা, নির্দিষ্ট কিছু স্থান পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে কষ্টকর ভ্রমণের আদেশ করা, উন্মাদ বা বাচ্চাদের মতো সাঈ ও তাওয়াফ সম্পাদন, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই পাথর নিক্ষেপ করা, মূল্যহীন একটি পাথর চুম্বন করা, স্বাধীন অরূপ কোনো মহিলার দিকে তাকানোর নিষেধাজ্ঞা আর সুন্দরী দাসীর দিকে তাকানোর অনুমতি প্রদান।

উত্তর: যদিও মানুষের বিবেক ভালো খারাপের পার্থক্য করতে পারে এবং যদি আমরা স্বীকার করি যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে উপকারি কাজের প্রতিই আদেশ দেন, তথাপি এটা স্পষ্ট যে উপরোক্ত প্রশ্নে উল্লেখিত কার্যাবলির উপকারিতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা বুদ্ধির নেই। বুদ্ধির এই অক্ষমতা এসবের মূল্যহীন হওয়া বুঝায় না। আল্লাহ তা'আলা এসবের আদেশ দিয়েছেন কারণ তিনি এসবের গুরুত্ব জানেন। যেমনটি আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি, এমন অনেক বিষয় আছে যা বুদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা বুঝা যায় না কিন্তু নবুওয়াতের শক্তি দ্বারা বুঝা যায়। আমরা দ্বিতীয় নিবন্ধের শুরুতে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব।

১। তাওয়াতুর হলো ব্যাপক বা অনেক লোকের দ্বারা বর্ণিত এমন একটি তথ্য যা সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল এবং যা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব।

নিবন্ধ-২
৪- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের প্রমাণ

বিভিন্ন কাজের মাঝে এমন অনেক সুবিধা থাকে যা বুদ্ধির বোধগম্যতার বাইরে; আর তাই বুদ্ধি এই সুবিধাগুলোকে অগ্রাহ্য করে। আমরা এই সুবিধাগুলো অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কিছু ওষুধ অল্প মাত্রায় দেয়া হলেও তা কিছু মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়, অথচ অনেক বেশি মাত্রায় দেয়ার পরও তা অন্য মানুষদের জন্য ক্ষতিকর হয় না।[১] এটি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অনেক মানুষ তা বিশ্বাস করে না। এমনকি তারা এটার বিপরীত প্রমাণ করারও চেষ্টা করে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এবং বস্তুপূজারী যারা নবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং তাদের অবিশ্বাসের কিছু কারণ উপস্থাপন করতো, তারাও এমন করতো। আল্লাহ তা'আলা, নবীগণ, জীন, ফেরেশতাগণ, জান্নাত ও জাহান্নামের তথ্যগুলোও তাদের বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধ বিষয়গুলোর মত মনে করে তারা তাদের মনের পরিকল্পনাকে অস্বীকার করতো। যে মানুষ কখনো স্বপ্ন দেখেনি, তাকে যদি স্বপ্নের ব্যাপারে বলা হয় যে “মানুষ মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় চলে যায় যেখানে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও চিন্তাভাবনার ব্যাঘাত ঘটে এবং ঐ অবস্থায় সে এমন সব জিনিস দেখে যা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়না”, সে একথা বিশ্বাস না করে বরং বলবে এটা অসম্ভব। যদি তাকে বলা হয়, "এই জগতে এমন একটি ছোট জিনিস রয়েছে যা একটি শহরে রাখার পর পুরো শহরটিকে গ্রাস করবে। তারপর এটি নিজেই নিজেকে গ্রাস করবে”, তখন সে উত্তর দেবে যে এটা অসম্ভব। যাইহোক, এই কথাগুলো আপনকেই নির্দেশ করে। যারা আসমানী ধর্মসমুহ ও আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, তারা ঐ লোকটির মতোই। যার বিশ্বস্ততায় ব্যাপারে সন্দেহ আছে এমন কোনো বিজ্ঞানী যখন ধারণা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বলে, ;একটি বিপর্যয় আসন্ন’ তখন তারা তা বিশ্বাস করে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে। কিন্তু নবীদের ঘোষনাকৃত দুনিয়া এবং আখেরাতের বিপদগুলোকে তারা বিশ্বাস করে না, অথচ নবীদের সত্যতা সুবিদিত এবং তারা অনেক মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও চিরস্থায়ী

আযাব থেকে বাঁচতে তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। তারা ইবাদতকে বাচ্চাদের খেলা ও পাগলের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করে, অথচ নবীগণ ইবাদতের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন: "অভিজ্ঞতা মাধ্যমে আবিষ্কৃত বলে দার্শনিক, বস্তুবাদী ও ডাক্তারদের বর্ণিত উপকারী জিনিসগুলো বিশ্বাস করা হয়। আর ইবাদতে বিশ্বাস করা হয় না কারণ তাদের উপকারিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি।"

উত্তর: বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা শুনে বিশ্বাস করা হয়। আওলিয়াদের দ্বারা বর্ণিত ও পরীক্ষিত ধর্মীয় বিষয়গুলোও একইভাবে জানা যায়। এছাড়াও, ইসলামের নির্দেশিত অধিকাংশ কার্যাবলির উপকারিতা দেখা গিয়েছে এবং পরীক্ষিত হয়েছে।[১]

১। তদুপরি, বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারদের গবেষণায় উপকারী হিসেবে প্রমাণিত ও ন্যায্য মূল্যের কারণে প্রত্যেকে সাগ্রহে কিনেছে এমন কিছু ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী পরবর্তীতে ক্ষতিকর হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। শেষমেষ বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া এমন ওষুধের তালিকা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ওষুধের দোকানগুলোতে পাঠায়। সরকার এই ধরনের ওষুধ তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ করে দেয়। দৈনিক পত্রিকাগুলোর জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ব্যাপক চাহিদা থাকা কিছু ওষুধ পরবর্তীতে ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বারবার প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার একটি নিয়মিত খবর হলো- এন্টিবায়োটিক নামে পরিচিত শত শত জনপ্রিয় ওষুধ হৃদরোগ ও ক্যান্সার ঘটায় এবং কিছু ডিটারজেন্ট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

যদি ইসলামের বিধানাবলির উপকারিতা পরীক্ষার দ্বারা উদঘাটিত নাও হতো, তবুও এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রেখে প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা যুক্তিযুক্ত হতো। ধরা যাক, একজন চিকিৎসকের বুদ্ধিমান ছেলে যে ওষুধ সম্পর্কে কিছুই জানে না, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অনেক লোকের কাছ থেকে তার বাবার সাফল্যের কথা শুনেছে, এমনকি সংবাদপত্রেও তার বাবার সাফল্যের কথা পড়েছে এবং সে জানে যে তার বাবা তাকে অনেক ভালোবাসে। তার বাবা তাকে কিছু ঔষধ দেয় এবং বলে যে সে ওষুধগুলো গ্রহণ করলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে, কারণ ওষুধগুলো সে বেশ কয়েকবার নিয়েছে। কিন্তু যখন সে দেখে যে ওষুধটি ইনজেকশনের মাধ্যমে দেয়া হবে এবং এতে সে ব্যথা পাবে, তখন তার বাবাকে এই বলে মন্তব্য করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে যে, "আমি এই ঔষধটি কখনো নিইনি। এটা আমার জন্য ভাল কিনা আমি জানি না। আপনার কথা সঠিক হলেও আমি বিশ্বাস করতে পারিনা।" এই ধরনের উত্তর পৃথিবীর কে গ্রহণ করবে?

প্রশ্ন: "কিভাবে জানা যায় যে- নবী তাঁর উম্মতকে ততটাই ভালোবাসেন, যতটা বাবা তার সন্তানকে ভালবাসে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলি উপকারী?"

উত্তর: সন্তানের প্রতি বাবার ভালোবাসা কিভাবে জানা যায়? এই ভালোবাসা নিজেই দৃশ্যমান বা স্পৃশ্য কিছু নয়। এটি শুধুমাত্র তার আচরণ, মনোভাব, সন্তানের সাথে তার কথাবার্তা থেকে জানা যায়। একজন বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষায় তাঁর কঠোরতা এবং সুন্দর নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উদার ও দরদী প্রচেষ্টা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পড়ে, তবে ঐ ব্যক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে উম্মতের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর ভালবাসা সন্তানের প্রতি তার বাবার ভালোবাসার চেয়েও অনেক বেশি। যে ব্যক্তি তাঁর বিস্ময়কর অর্জনগুলি, তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত কুরআন মাজিদের বিস্ময়কর আয়াতসমূহ এবং পৃথিবীর শেষ সময়ে সংঘটিত ঘটনাগুলো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া তাঁর বাণীসমূহ উপলব্ধি করে, সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে তিনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করেছিলেন এবং বুদ্ধির বোধগম্যতা ও উপলব্ধি সীমার বাইরের বিষয়গুলোও বুঝতে পারতেন। এভাবেই তার কাছে স্পষ্ট হবে যে তাঁর সমস্ত বাণী সত্য। যে বিবেকবান ব্যক্তি আল কুরআন কারিমে বর্ণিত জ্ঞান অর্জন করে তা নিয়ে গবেষণা করেন এবং রাসূল (দঃ) এর জীবনী পড়েন, সে এই সত্যটি পরিষ্কারভাবে দেখবে। ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো নবী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তার উচিত হলো নবীর জীবনী অধ্যয়ন করা অথবা তাঁর জীবন সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো নিরপেক্ষভাবে পড়া। যে ব্যক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞান বা ইলমে ফিকহ সম্পর্কে জানে, সে কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা ফিকহবিদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে তার জীবন সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন ফকীহ ছিলেন কিনা বা ক্যালিনো একজন চিকিৎসক ছিলেন কিনা তা জানার জন্য জ্ঞানের ওই শাখা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং এরপর জ্ঞানের ওই শাখায় তাদের রচিত বইসমূহ পড়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি নবুওয়াত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং আল কুরআন ও হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করে, সে পুরোপুরি বুঝবে যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নবী এবং নবুয়তের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

আর যদি সে অন্তর পরিশুদ্ধকরণে তাঁর বাণীসমূহের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানে এবং তাঁর সেই বাণীসমূহের অনুসরণ করে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর হৃদয় সত্যকে দেখতে শুরু করে, তবে নবুওয়াতের প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। সে অব্যাহতভাবে এই হাদীসগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবে- "যে ব্যক্তি সে যা জানে তার উপর আমল করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে যা সে জানে না তাও শিক্ষা দেন"; “যে ব্যক্তি অন্যায়কারীকে সাহায্য করে, সে তার থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে" এবং, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের কথা চিন্তা করে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার দুনিয়া ও আখেরাতের ইচ্ছাসমূহ পূরণ করা হবে”। এভাবে তার জ্ঞান ও ঈমান শক্তিশালী হবে। ঈমান যওকী হওয়ার জন্য অর্থাৎ, ঈমানকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করা যে পর্যায়ে কেউ মনে করে যে সে বাস্তবতাকে দেখতে পায়, এর জন্য প্রয়োজন তাসাউফের পথে নিরলস সাধনা।

ইসলামি বিশারদগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। আমরা তা থেকে কিছু ব্যাখ্যা করব:

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি একজন নবী এবং তাঁর কথা প্রমাণ করার জন্য মুজিযা প্রদর্শন করেছিলেন। এই বিষয়টি বর্তমান সময় পর্যন্ত তাওয়াতুরের পদ্ধতিতে অর্থাৎ সর্বসম্মতভাবে এসেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা হলো আল কুরআনুল করিম।

আল কুরআন হলো মুজিযা অর্থাৎ, যার সমতুল্য কেউ তৈরি করতে পারবে না। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন: “যাও এবং অনুরূপ কিছু বলো!” আরবের বিখ্যাত কবিরা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও একটি আয়াতও বলতে পরেনি। সূরা তূরের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে: “অতঃপর তারা যেন এর সদৃশ কোনো রচনা নিয়ে আসে।“ সূরা আল-হুদের ১৩তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তাদের বলুন, তবে তোমরাও এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা তৈরী করে নিয়ে এসো।“ সূরা আল বাকারার ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ “আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সব সাহায্যকারীদেরকেও আহবান করো। (তোমরা কখনোই অনুরূপ সূরা রচনা করতে পারবে না)।“ সেই সময়ে, আরবদের মাঝে কবিতা রচনার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাদের মধ্যে অনেক কবি ছিল। তারা কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করত এবং বিজয়ীদের নিয়ে গর্ব করতো। তারা সবাই একত্রিত হয়ে আল কুরআনের সূরাগুলোর অনুরূপ একটি সংক্ষিপ্ত সূরা রচনা করার কঠোর চেষ্টা করেছিল। তাদের রচিত কবিতাটি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে আল কুরআনের একটি সূরার সাথে তা তুলনা করেছিল। তারা কুরআনের সূরার বাগ্মিতা প্রত্যক্ষ করে নিজেদের কবিতায় এতটাই লজ্জিত ছিল যে, তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাদের রচিত কবিতা নিয়ে যেতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, তারা জ্ঞানের মাধ্যমে বিরোধীতা ছেড়ে দিয়ে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছিল। এরপর তারা তরবারি দিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করতে লাগল। এমনকি তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত যে চক্রান্ত করেছিল তা পূরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সেই চক্রান্তও ব্যর্থ হয় এবং তারা লজ্জাজক পরাজয় বরণ করেছিল। মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক এত অবমাননাকর চ্যালেঞ্জ ওবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার পর তারা যদি কুরআনের কোনো একটি সূরার সমতুল্য সংক্ষিপ্ত কিছুও রচনা করতে পারতো, তবে তা তারা নবী (দঃ) এর নিয়ে এসে এক শোরগোল সৃষ্টি করতো। তাদের এই দুর্বিনীত কাজটি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতো এবং তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হতো। এটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে কোন বক্তার খুনের ঘটনার মতো বিখ্যাত হয়ে উঠতো। তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ্যভাবে প্রমান করে যে আল-কুরআন একটি মুজিযা এবং এটি কোনো মানুষের বাণী নয়।

প্রশ্ন: “মক্কার বাইরের কবিরা হয়তো “তোমরাও চেষ্টা কর এবং অনুরূপ আয়াত তৈরি কর” এই আয়াতটি অথবা মুহাম্মদ (দঃ) এর অনুরূপ চ্যালেঞ্জগুলো শোনেনি। অথবা হতে পারে তারা কিছু সুবিধার জন্য বা আমরা জানি না এমন অন্য কোনো চুক্তি বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদেরকে দূরে রেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন, সেখানে কিছু বিশেষ সুবিধা লাভের অঙ্গীকারের জন্য তারা পিছিয়ে যেতে পারে। অথবা, শুরুতে তারা তাঁর ঘোষণার প্রতি সামান্যই মনোযোগ দিয়েছিল এবং তাকে এর জবাব দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি; কিন্তু পরে, তিনি যে ক্ষমতা অর্জন করছেন এবং তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তারা তাঁকে আর জবাব দেয়ার সাহস করেনি। অথবা, যোগ্য কবিদের তাদের জীবিকা অর্জনে সমস্যা থাকতে পারে এবং এ কারণে তারা তাঁকে উত্তর দেওয়ার মত সময় খুঁজে পায়নি। আবার এটাও হতে পারে যে তারা উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলো, কিন্তু তাদের সাফল্য ভুলে গিয়েছিল বা কোন কারণে তাদের এই

সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়নি। উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শক্তিশালী হওয়ার এবং তিনটি মহাদেশের ছড়িয়ে পড়ার পর, মুসলমানরা এই সাফল্যের বর্ণনাগুলো ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অথবা, সময়ের পরিক্রমায় এই ধরনের বর্ণনাগুলো বিস্মৃত হওয়ার কারণে হারিয়ে যেতে পারে।“

উত্তর: এধরনের বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর পূর্ববর্তী নিবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। আমি উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ তায়ালার নিয়মে সৃষ্ট কিছু অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় অঙ্গ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা যদি যুক্তির বিপরীত হয়, এটা তাদের তা শিখতে বাধা দিবে না। আমি বলেছি যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো এমনি। এখন আমি উপরে উল্লেখিত সন্দেহগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা উত্তর প্রদান করব। সর্বপ্রথম, অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে, যিনি নিজেকে একজন নবী বলে দাবি করেন, তিনি যদি তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ কোনো মুজিযা প্রদর্শন করেন এবং অন্যকেও একই কাজ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন কিন্তু কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি, তবে তিনি সত্য বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আর ভিত্তিহীন। তারা একেবারে শুরুতে তাঁকে তুচ্ছ হিসেবে দেখেছিল এবং পরে ভয় পেয়েছিল বলে তারা তাঁর জবাব দেয়নি বলাটাও অনুচিত। যেহেতু কারো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারাটা অনেক বড় সম্মানের এবং প্রত্যেকের কাছে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠত্বের কাজ হতো, প্রত্যেকে এমন ব্যক্তির প্রশংসা করতো, তাকে ভালোবাসতো এবং অনুসরণ করতো। পৃথিবীতে কে এটা পছন্দ করবে না? যদি একজন ব্যক্তির সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে মোকাবিলা করেনি, তাহলে বুঝতে হবে যে প্রতিপক্ষ সঠিক এবং সত্যবাদী ছিল। তৃতীয় সন্দেহের ক্ষেত্রে, এটি ভালভাবে জানা থাকা দরকার যে একজন ব্যক্তি যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে, তার জন্য শুধু জবাব দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং তা প্রদর্শনও করতে হবে। কেবলমাত্র প্রদর্শনের মাধ্যমেই উদ্দেশ্য হাসিল করা যাবে। কিছু লোককে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে সীমাবদ্ধ করে রাখার মতো অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও তা এটা বুঝায় না যে একই অবস্থা সর্বত্র বিদ্যমান। আসলে এরকম প্রকাশ্যে দেখাও গিয়েছে। কোনো লিখিত উত্তর গোপন রাখা অসম্ভব। সুতরাং, প্রশ্নে উল্লেখিত সন্দেহগুলো ভিত্তিহীন।

ইসলামী গবেষকগণ আল কুরআনের ইজায তথা অলৌকিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন যে আল কুরআনের ছন্দ ছিল খুবই বিস্ময়কর এবং এর বর্ণনাশৈলী ছিল অসাধারন। এটি একটি মুজিযা ছিল, কারণ এর ছন্দ এবং বর্ণনাশৈলী আরবের কবিদের মতো ছিল না। সূরাগুলোর শুরু, শেষসহ বর্ণনার মধ্যেও গদ্যের মিল রয়েছে।। আয়াতগুলোর মধ্যকার যোগসুত্র যেন শাজ এর মতো।[১] আল কুরআনে বিদ্যমান এই সাহিত্যিক উপাদানগুলি আরব কবিদের রচনা থেকে ভিন্ন, যারা আল কুরআনে প্রদর্শিত উপায়ে সেসব উপাদান ব্যবহার করতে পারেনি। ভালো আরবি জানা একজন ব্যক্তি স্পষ্টভাবে এর ইজায সম্পর্কে জানতে পারে। কাদি বকিললানী[২] বলেছেন, কুরআনের ইজায এর অলঙ্করণ এবং এর বিস্ময়কর ছন্দ উভয়টি থেকেই প্রকাশ পায়। অন্য কথায়, আল কুরআনের কাব্যিক রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কেউ কেউ বলেন যে অজ্ঞাত বিষয়ে তথ্য প্রদানই এর ইজায এর কারণ । উদাহরণস্বরূপ, সূরা আর রুমের তৃতীয় আয়াতে, "যদিও তারা জিতেছে, দশ বছরের মধ্যে তারা পরাজিত হবে", ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো যে বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস[৩] ইরানের শাহ খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীকে দশ বছরের মধ্যে পরাজিত করবে। আর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হয়েছিলও। কিছু উলামায়ে কেরামের মতে, কুরআনের ইজায হচ্ছে কুরআন খুব দীর্ঘ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক হওয়া সত্ত্বেও এতে কোনো দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গতি নেই। এটা এই কারণে যে সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এটি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে অবতীর্ণ হতো, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য থাকতো।“ কতিপয়ের মতে, আল-কুরআনের ইজায এর অর্থের মাঝে নিহিত। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে, আরবরা আল কুরআনের অনুরূপ বক্তব্য রচনা করতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কুরআনের মতো লিখা রোধ করেছিলেন। তিনি কিভাবে তাদের প্রতিরোধ করেছিলেন তা বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আহলে সুন্নাহের একজন গবেষক হযরত আবু ইসহাক ইব্রাহীম আল-ইসফারাঈনী[৪] এবং মু'তাযিলাদের গবেষক আবু ইসহাক নিজামী আল বাসরী বলেন যে পার্থিব সুবিধা হারানোর ভয় তাদেরকে বাধা দিয়েছিল। [হুসিনিয়্যা বইয়ের লেখক] শিয়া স্কলার আলী মুরতদা বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের কুরআনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জ্ঞানকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন।

যারা কুরআন মজীদকে মুজিযা হিসেবে মানে না তারা বলে, "ইজায অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে। ইজাযের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে তাই এর অর্থ নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।“ এর জবাবে গবেষকগণ বলেছেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগুলি বুঝায় না যে সম্পূর্ণ কুরআন কারিম মু'জিয নয়।

কোরআন কারিমের বাগ্মিতা, অতুলনীয় কাব্য, অজানা তথ্যগুলোর বর্ণনা, এর মাঝে নিহিত জ্ঞান ও প্রথা সম্পর্কিত বিদ্যা এবং ইজাযের আরও অনেক বিষয় যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বোঝার পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এটা নির্দেশ করে না যে আল-কুরআন মুজিযা নয়। কেউ যদি উপরে উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্যে কোনো একটি এর মুজিযা হওয়ার কারণ হিসেবে না পায়, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে সবগুলোই কুরআনের মুজিযা হওয়ার কারণ নয়। অনেক কবিই অত্যন্ত বাকপটুময় গদ্য ও পদ্য রচনা করতে পারে, আবার অন্য কোনো সময় তা করতে পারেনা। অর্থাৎ, কোনো কিছু একবার করতে পারা মানেই যে সবসময় তা করতে পারবে তা নয়। একটি দলের মধ্যে তার প্রত্যেক ভাগের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা জরুরি নয়। এই উত্তরটি বোঝায় যে কুরআন কারিম সম্পূর্ণটাই মুজিযা তবে এর সংক্ষিপ্ত সূরাগুলো মুজিযা নাও হতে পারে। কিন্তু এটি সঠিক নয়; আমরা পূর্বে যেমনটি ব্যাখ্যা করেছি, এর সবচেয়ে ছোট সূরাও মুজিযা। সুতরাং বলা যেতে পারে যে সম্পূর্ণ কুরআন প্রত্যেক দিক থেকে মুজিযা, তবে এর সূরাগুলি কিছু ক্ষেত্রে মুজিযা। তবে এটি উপরের

---

১. শাজ অর্থ হলো কবুতরের অবিরাম কূজন। গদ্যের মধ্যে এর অর্থ হলো মিত্রাক্ষরতা, যা গদ্যের শেষে দেখা যায়।
২. আবু বকর বাকিল্লানী। মৃত্যু ৪০০ হিজরী।
৩. হেরাক্লিয়াস। মৃত্যু ২০ হিজরী।
৪. ইব্রাহিম নিশাপুরি। মৃত্যু ৪০০ হিজরীর পর।
প্রশ্নের উত্তর হবে না। কারণ প্রশ্নটি ইজাযের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছে। সুতরাং, এই ধরনের ব্যাখ্যা ইজাজের স্পষ্ট কারণ প্রকাশ করে না।

তাদের দ্বিতীয় বিরোধে বলা হয়েছে: "আল কুরআনের কিছু অংশ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, সুরা আল ফাতেহা এবং মুয়াব্বিযাতান[১] এর সূরাগুলো কুরআনের অন্তর্গত ছিল না। অথচ এই তিন সূরা আল কোরআনের সবচেয়ে সুপরিচিত সূরা। যদি এগুলোর বাকপটুতা সম্পর্কিত ইজাযের কোন একটি মাত্রা থাকতো, তবে এগুলো কুরআনের ইজায ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে স্পষ্টত মিলতো না এবং এই সূরাগুলো কুরআনের অন্তর্ভূক্ত কিনা এ ব্যাপারে কারোরই সন্দেহ থাকতো না।“

উত্তর: কোরআন কারিমের কিছু সূরা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের যে সন্দেহ ছিলো তা কোরআনের বাকপটুতা বা ইজাযের কারণে ছিল না, বরং এই কারণে ছিল যে এই সুরাগুলো মাত্র একজন ব্যক্তি হতে বর্ণিত ছিল। উসূলে হাদিসের নীতি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি দ্বারা বর্ণিত তথ্য নিশ্চিত নয়, এটি সন্দেহজনক। তাওয়াতুর এর মাধ্যমে বর্ণিত তথ্যগুলো সুনিশ্চিত। আল কোরআন কারিম সম্পূর্ণভাবে তাওয়াতুরের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে অর্থাৎ এটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত। এই কারণে, নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে কোরআন কারিম আল্লাহ তা'য়ালার বাণী। এটিও নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত সেই সূরাগুলোও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাযিল হয়েছে এবং এগুলোর বাকপটুতা ইজাযের মাত্রার অন্তর্গত ছিল। যাইহোক, এই সূরাগুলো কুরআনের অন্তর্গত ছিলো কি ছিলো না তা নিয়ে মতবিরোধ ছিল, যা আমাদের কারণের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়।

তাদের তৃতীয় মতবিরোধে বলা হয়েছে, “হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফতকালে যখন আল কুরআন সংকলন করা হয়েছিল, যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি একটি আয়াত উল্লেখ করে, তাহলে তার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে শপথ করতে হতো বা দুইজন সাক্ষী আনতে হতো; সুতরাং আয়াতটি আল কুরআনের অন্তর্ভুক্ত এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। যদি কোন আয়াতে বাকপটুতার ইজায থাকে, তাহলে বুঝা যেতো যে এটি একটি আয়াত এবং তাই ওই আয়াত বর্ণনাকারীর সত্যতা নিশ্চিত করতো; এক্ষেত্রে কোনো শপথ বা দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন হতো না।“

উত্তর: এই শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছিল কুরআন মজীদে ওই আয়াতের অবস্থান নির্ধারণ এবং আয়াতটি অন্য আয়াতের আগে বা পরে হবে কিনা তা জানার জন্য। আয়াতগুলো আল কুরআনের অন্তর্গত কিনা তা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল কুরআন পাঠ করতেন এবং যারা কুরআন পাঠ করতেন তাদেরটাও শুনতেন। এটা স্পষ্টভাবে জানা ছিল যে প্রত্যেকটি আয়াত কোরআন কারিম এর অংশ। কোরআনের আয়াতগুলোর ক্রম নির্ধারণের জন্যই শপথ বা সাক্ষীর প্রয়োজন

ছিল। তদুপরি, আয়াতগুলোর ইজাযের মাত্রায় থাকা নিশ্চিত করে যে এগুলো আয়াত ছিল। যদি এক বা দুই আয়াত ইজাযের মাত্রায় না থাকে তবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেহেতু ক্ষুদ্রতম সূরাটি তিন আয়াতবিশিষ্ট, তাই আল কুরআনের সকল সূরাই মু'জিযা।

তাদের চতুর্থ মতবিরোধে বলা হয়েছে, "শিল্পের প্রতিটি শাখার সীমা রয়েছে, যা অতিক্রম করা যায় না। কেননা শিল্পে প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন একজন শিল্পী, যিনি এক্ষেত্রে তার সহকর্মীদের সবসময় ছড়িয়ে যান। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সময়ের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাগ্মী ছিলেন। তিনি এমন কিছু বলতে পারতেন যা তাঁর সময়ের কবিরা প্রকাশ করতে পারতো না। যদি এটি মুজিযা হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহলে অন্য যে কোনো শাখার প্রাক্তন খ্যাত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পন্ন এমন কোনো কাজ যা তার সহকর্মীদের দ্বারা করা সম্ভব হত না, তাও অবশ্যই মুজিযা বলতে হবে, যা ওই ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বক্তব্য হতো।"

উত্তর: মুজিযা অর্থ হলো, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত ঘটনা এবং এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে কারণ এটি সেই সময়ের অধিকাংশ লোকের দ্বারা করা সম্ভব নয়, যারা এটি করতে সক্ষম তারা এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে করতে পারেন এবং যা মানবশক্তি দ্বারা অতিক্রান্ত নয় বলে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং শুধুমাত্র এমন ব্যক্তিই তা করতে পারবেন যিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কারণে তা ঘটবে বলে বিশ্বাস করেন। এসব বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কোনো কিছুকে মুজিযা বলা যায় না। হযরত মূসা[১] আলাইহিস সালাম এর সময় যাদুর প্রচলন ছিল। সেই সময়ে যারা যাদু অনুশীলন করতো, তাদের কাছে জাদুর সর্বোচ্চ স্তর ছিলো, অবাস্তব, অস্তিত্বহীন বা বিভ্রম সৃষ্টিকারী জিনিসগুলোকে এমনভাবে দেখানো যেন বাস্তবিক সেগুলোর অস্তিত্ব আছে। যখন তারা দেখেছিল যে মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি বড় সাপে পরিণত হয়ে তাদের নিজেদের যাদুবিদ্যায় তৈরি করা সাপগুলো খেয়ে ফেলছে, তখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে এটি জাদুর সীমার বাইরে মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। এভাবে তারা মুসা আলাইহিস সালাম এর (নবুয়তের) প্রতি ঈমান এনেছিল। ফেরাউন এই বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল বলে তার ভুল ধারণা হয়েছিল যে মুসা আলাইহি সালাম জাদুকরদের নেতা এবং তাদের জাদু শিখিয়েছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সময়ও ওষুধের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল। এটি খুব উন্নত স্তরের ছিল। ডাক্তারগণ তাদের অর্জনে গর্বিত ছিলো। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞরা বলেছিল যে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা বা জন্মগত অন্ধ মানুষের চোখ খুলতে পারার জন্য তাদের চিকিৎসা-জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তারা বিশ্বাস করেছিল যে এ ধরনের মানুষেরা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমে নিরাময় হতে পারে। ঠিক একইভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে কবিতা ও বাকপটুতার শিল্প সর্বোচ্চ স্তরে পৌছেছিল। কবিরা তাদের কবিতার বাকপটুতার নিয়ে একে অপরের কাছে গর্ব করতো। এমনকি সাতটি কবিতা এতটাই প্রশংসিত হয়েছিল যে তা কাবার দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। কেউই তাদের মত লিখতে পারতো না। এটি ইতিহাসের বইয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন কারিমকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ এ কথা অস্বীকার করেছিল যে এটি আল্লাহর বাণী এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। কোরআন কারিমের বাকপটুতার ইজায দেখে কিছু কবি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি আল্লাহর কালাম এবং তারা মুসলমান হয়েছিলেন। কিছু মানুষ তাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; তারাদেরকে মুনাফিক বলা হতো। কেউ কেউ অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল; এইজন্য যারা যুক্তি দেখিয়েছিল তাদের কাছে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে উপহাসের পাত্র বনিয়েছিলো। উদাহরণস্বরূপ, "ওয়াষ্যারিয়াতি যারআন" এই আয়াতের সাথে মিল রেখে তারা বলেছিল, "ফালহাসিলাতি হাসদান ওয়াত্তাহিনাতি তাহনান ওয়াত্তাবিখাতি তাবখান, ফাল আকিলাতি আকলান।"[১] বাকি মানুষেরা বিরোধিতা শুরু করেছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিশোধমূলক হত্যা প্রচেষ্টায় তারা তাদের সম্পত্তি, জীবন, স্ত্রী ও সন্তানদের ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। এভাবে নিশ্চিতভাবে বোঝা গিয়েছিল যে আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[২]

---

১. তারা নিজেরাই তাদের রচিত কবিতা গুলো পছন্দ করতো না, তাই তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছেও তারা তাদের রচনা পাঠ করতো না।

২. পূর্বে আমরা যেমনটি দেখেছি, মুজিযা আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। পৃথিবীতে এবং পার্থিব বিষয়গুলিতে নিয়ম থাকে বলেই তিনি কিছু কারণের উপর নির্ভরশীল হিসেবেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কোন ব্যক্তি কিছু তৈরি করতে চায়লে সে ঐ জিনিসটির কার্যকরণাত্মক বিষয়গুলো প্রয়োগ করে। বেশিরভাগ কারণই চিন্তা, অভিজ্ঞতা বা হিসাবনিকাশের দ্বারা পাওয়া যায়। যখন কোনকিছুর কারণ প্রয়োগ করা হয়, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা সৃষ্টি করেন। মুজিযা বা কারামাত এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়, আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণ ছাড়াই এগুলোকে অসাধারন উপায়ে সৃষ্টি করেছেন। কারণগুলো ধারণ করার অর্থ তাঁর

কার্যকরণের নীতি অনুসরণ করা। যখন তিনি কোন কারণ ছাড়াই কিছু সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাঁর এই নিয়ম স্থগিত রেখে অসাধারণ উপায়ে তা তৈরি করেন। মুজিযা শুধুমাত্র নবী মাধ্যমেই ঘটে। এটা অন্যান্য মানুষের মাধ্যমে ঘটে না। "তিনি একটি অলৌকিক কাজ করেছেন" বা "তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন" এগুলো কারো প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বলা হয়। এই কথাগুলো ‘উল্লেখিত লোকটি একজন নবী’ একথা বলার মতোই। এই ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্য নয়; বরং অভিব্যক্তিই বিবেচনা করা উচিত। এটি কারো কাছে নবুয়তকে অবিশ্বাসের কারণ হয়। এরূপ করলে ঈমান হারায়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বলা অথবা কেউ এ জাতীয় এরকম কিছু সৃষ্টি করেছে বলাও অনুরূপ। তাই মুসলিমদের এই ধরনের কথা বলা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

তাদের পঞ্চম মতবিরোধ হলো: "ইসলাম বিশেষজ্ঞদের মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি ও কুরআন মজীদের অর্থ উভয় বিষয়েই মতবিরোধ রয়েছে। অন্যদিকে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে কুরআনে মতবিরোধ করার কোন সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ, তিনি সূরা আন-নিসার ৮২ নং আয়াতে বলেছেন; 'এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হতো, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখা যেতো।' সূরা ক্বারিয়ার পঞ্চম আয়াতে "কাল ইহনিল মানফুশ" এর স্থলে অনেকেই "কাস্সাফিল মানফুস" পড়তো। সূরা আল-জুমার নবম আয়াতে "ফাসআও ইলা যিকরিল্লাহি' এর স্থলে "ফামদু ইলা যিকরিল্লাহ" পড়তো। সূরা আল বাকারার ৭৪ নং আয়াতে "ফা-হিয়া কালহিজারতি" এর স্থলে কেউ কেউ "ফা-কানাত কাল হিজারতি" পড়া হতো। সূরা আল-বাকারার ৬১ নং আয়াতে "আলাইহিমুয যিল্লাতু ওয়াল-মাসকানাত" এর স্থলে কেউ কেউ "আলাইহিমুল মাসকানাত ওয়ায যিল্লাত" পড়তো। কুরআন কারিমের অর্থের ক্ষেত্রে মতবিরোধগুলোর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে: সূরা সাবার ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "রব্বানা বা'য়িদ বায়না আসফারিনা"। এর অর্থ হলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত করো'। এটি আল্লাহর কাছে একটি আহ্বান। কেউ কেউ এটিকে "রব্বুনা বা'আদা বায়না আসফারিনা" পড়ে। তখন এর অর্থ হয়, 'আমাদের রব আমাদের গন্তব্য আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।' সূরা মায়িদার ১১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হাল ইয়াসতাতীয়ু রব্বুকা"। যার অর্থ, 'আপনার রব কি আপনার প্রার্থনা গ্রহণ করেন?' কেউ কেউ এই আয়াত এভাবে পড়ে, "হাল তাসতাতিয়ু রব্বাকা" যার অর্থ 'তুমি কি তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করবে?'"

উত্তর: উপরে উল্লিখিত মতবিরোধগুলোর প্রত্যেকটি একজন ব্যক্তির কারণে সৃষ্ট হয়েছিল। তাফসীর ও ক্বিরাত বিশেষজ্ঞগণ মতবিরোধ সৃষ্টিকারীদের ক্বিরাতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যে ক্বিরাতে ঐকমত্য ছিল, তারা সেটিই গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুরআন কারিম সাতটি হরফে[১] নাযিল হয়েছে, যার প্রত্যেকটি কার্যকর এবং পর্যাপ্ত।" এইজন্য কুরআনের ক্বিরাত বা অর্থ নিয়ে মতবিরোধগুলো কুরআনের মুজিযা হওয়ার বাঁধা নয়।

তাদের ষষ্ঠ মতবিরোধে বলা হয়েছে, "কুরআনে নিরর্থক সুর এবং পুনরাবৃত্তি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "ইন্না হাযানী লা-সাহীরানী" এ ধরনের একটি সুর। পুনরাবৃত্ত পাঠের উদাহরণ হলো সূরা আর রহমান। অর্থের পুনরাবৃত্তির উদাহরণ হলো মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনাগুলো।"

১। রিয়াদ আন-নাশীহীন বইতে লেখা আছে, 'হারফ' শব্দটির অর্থ উপভাষা, পঠন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা সংগৃহীত কুরআন কারিমের অনুলিপিতে সাতটি ভিন্ন ধরনের ক্বিরাত বা পঠন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হয়ে সকল সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন এবং সবাই একমত হলেন যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ বছরে যে রীতিতে কুরআন পাঠ করেছেন, সে রীতিতে কুরআনের নতুন কপি লেখা হবে। এভাবেই কুরআন পাঠ করা ওয়াজিব। আর অন্য ছয় রীতিতে কুরআন পাঠও জায়েজ।

উত্তর:[১] পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, পুনরাবৃত্তির ফলে যে অর্থটি মনে গেঁথে যায় তা অনস্বীকার্য। ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে কোনো অর্থ ব্যাখ্যা করার শিল্পের গুরুত্ব সাহিত্যের রচনাশৈলী সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের জানা রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় কতিপয় ঘটনা সমন্বিত কোনো গল্পের পুনরাবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশ করে।[২]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু মুজিযা ছিল। যেমন, তাঁর বরকত পূর্ণ আঙুলের ইশারায় চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাথর ও গাছের কথা বলা এবং তাঁর সাথে চলাচল করা, পশুপাখিদের তাঁর সাথে কথা বলতে পারা, সামান্য খাবার দিয়ে অনেক মানুষকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানো, তাঁর আঙ্গুল হতে পানি প্রবাহিত হওয়া, তাঁর বর্ণনাকৃত অতীত এবং ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা যা কেউ জানতো না ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। যদিও তাঁর সকল মুজিযা ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত হয় নি, তবুও তাঁর বহু মুজিযা আছে যেগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত। হযরত আলী (রাঃ) এর বীরত্ব ও হাতেম তায়ীর আতিথেয়তার [পঞ্চম রোমান সম্রাট নেরোর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার] মত তাঁর এসব মুজিযাও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। আমরা তাঁর নবুওয়াতে বিশ্বাস করার জন্য এসব প্রমাণই যথেষ্ট।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত প্রমাণ করার দ্বিতীয় উপায় হল তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বের, নবুয়তের ঘোষণা দেয়ার সময়কার ও নবুয়তের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরের তাঁর আচরণ, সুন্দর নৈতিক গুণাবলী এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো অধ্যয়ন করা। উদাহরণস্বরূপ, তিনি পার্থিব বা পরকালীন বিষয়ে কখনোই মিথ্যা বলেন নি। তিনি যদি তাঁর জীবনকালে একবারও মিথ্যা বলতেন, তাহলে তাঁর শত্রুরা সেকথা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতো। তাঁর নবুওয়াতের পূর্বে বা নবুয়তকালীন সময়ে তাঁকে কখনোই কোন অশোভন কাজ করতে দেখা যায়নি। যদিও তিনি উম্মী (অর্থাৎ, তিনি কখনও কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি) ছিলেন, তাঁর বক্তব্য ছিল সরল এবং মিষ্টি। এই কারণে তিনি বলেছেন, "আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' (অল্প কথায় অনেক তথ্য দেওয়ার ক্ষমতা) দেয়া হয়েছে"। আল্লাহ তায়লার দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, "অন্য কোন নবী আমার মত কষ্ট বা অত্যাচার ভোগ করে নি।" তিনি সব কষ্ট সহ্য করেছেন। তবুও তিনি তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দেননি। তাঁর শত্রুদের পরাজয়ের পর এবং প্রত্যেকে যখন তাঁর আদেশ গ্রহণ করেছিল, তখনও তাঁর সুন্দর নৈতিকতা, দয়া বা বিনয়ী আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সবাইকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনি কখনোই নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেননি। তাঁর সকল উম্মতের প্রতিই একজন পিতার মতোই (তার সন্তানদের প্রতি) সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর অসামান্য দয়ার জন্যই সুরা ফাতিরের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না" এবং সূরা কাহাফের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আপনি তাদের ভুলের জন্য অনুতাপ করে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দিবেন?" তাঁর উদারতা ছিল সীমাহীন। তাঁর এই উদারতাকে কিছুটা শীতল করার জন্য সূরা আল-ইসরার ২৯ নং আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল, "আপনি একেবারে মুক্ত হস্তও হবেন না!"

১। এখানে, আল-ইমাম আর রব্বানী (কুদ্দিসাহ সিররুহ) "শরহ্-ই-মাওয়াকিফ"এর উল্লেখ করে বিস্তারিত লিখেছেন যে বালাগাতের (অলংকার শাস্ত্র) নিয়মানুসারে, "হাযানী লা-সাহিরানী" আয়াতটির মধ্যে ইজায এর মাত্রা রয়েছে। এই অংশটি আমরা অনুবাদ করিনি।

২। যারা ইংরেজি সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করে, তারা অবশ্যই মৌখিক উপমা অর্থাৎ অ্যানাফোরা, ক্যাটাফোরা, এপিস্ট্রোফি, সিম্পলস, এ্যানডিপ্লোসিস, এপানালেপসিস, এন্টিস্ট্রফি পলিপ্টটন বিষয়গুলো সম্পর্কে জানে।

তিনি কখনোই পৃথিবীর অস্থায়ী ও প্রতারণামূলক সৌন্দর্যের দিকে নজর দেননি। তিনি যখন প্রথম তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে সময় কুরাইশ নেতারা তাঁকে বলেছিলো, "আমরা তোমাকে সেই পরিমাণ সম্পদ দিবো যতটা তুমি চাও। আমরা তোমাকে তোমার পছন্দের মেয়ের সাথে বিয়ে দেব। আমরা তোমাকে মক্কার নেতৃত্ব দিবো যা তুমি চাও। কিন্তু তুমি ইসলাম প্রচার করা ছেড়ে দাও।" তিনি তাদের সকল লোভনীয় প্রস্তাবগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি দয়ালু ও বিনয়ী ছিলেন এবং প্রচুর সম্পদ ও জমির অধিকারীদের প্রতি উন্নতশির ও গম্ভীর ছিলেন। উহুদ, আহজাব (পরিখা) এবং হুনাইনের মতো ভয়ংকর যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ মুহূর্তেও তিনি ইসলাম প্রচার থেকে সরে আসার চিন্তা করেননি। এসব ঘটনা তাঁর পবিত্র হৃদয়ের শক্তি ও তাঁর সাহসিকতার প্রমাণ দেয়। যদি আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা বা ভরসা না থাকতো যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৭০ নং আয়াতে, "আল্লাহ তায়ালা মানুষের ক্ষতির বিরুদ্ধে তোমাদের রক্ষা

করেন!", তাহলে তাঁর জন্য এই অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করা সম্ভব হতো না। পরিস্থিতি বা অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাঁর সুন্দর নৈতিকতা বা অন্যদের প্রতি আচরণে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হতো না। যারা যোগ্যব্যক্তিদের লিখিত সত্য ও বাস্তব ঘটনা সংবলিত ইতিহাসের বই পড়ে তারা আমাদের কথাগুলো ভাল বুঝতে পারবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এককভাবে কোনোটি নবুওয়াতের দালিলিক প্রমাণ হতে পারে না; অর্থাৎ, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটি কারো মাঝে পাওয়া গেলেই তা নবুয়তের ইঙ্গিত করবে না। কেবল নবীদের মাঝেই এই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব একত্রে থাকতে পারে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে এই সকল শ্রেষ্ঠত্ব একত্রিত হওয়াটিও তিনি যে আল্লাহ তায়ালার নবী একথার শক্তপোক্ত প্রমাণ।[১]

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ তা'আলার নবী একথার তৃতীয় প্রমাণ হলো ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাজী যে প্রমাণটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের নবী হয়েছিলেন যারা ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানেও কাঁচা ছিলো। এটি এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। মুশরিকরা মূর্তি (পাথর বা ধাতুর তৈরি মূর্তি ও মনুষ্যকৃতি) পূজা করত; তাদের মধ্যে কয়েকজন ইহুদিদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলো এবং তাদের মিথ্যা, বানোয়াট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহিনীগুলোকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিল; একটি ছোট দল যাদুকরেরা দুই দেবতার পূজা করতো এবং তারা নিজেদের কন্যা ও নিকটাত্মীয়দের বিয়ে করতো এবং বাকিরা ছিল খ্রিস্টান, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান হিসেবে বিশ্বাস করতো এবং তিন দেবতার উপাসনা করতো। এ ধরনের বিশৃঙ্খল জাতির মাঝে নবী হিসেবে আগমন করলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কুরআনুল কারিম নামক একটি গ্রন্থ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর কাছে নাযিল করলেন। তিনি অসুন্দর ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুন্দর অভ্যাস এবং খারাপ লোকদের কাছ থেকে সৎপথে পরিচালনাকারী ভালো আমলগুলো বের করে এনেছিলেন। তিনি খাঁটি ঈমান ও ইবাদত শিখিয়েছিলেন। যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, তারা এই ঈমান ও ইবাদতের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছিলেন। তিনি বিকৃত ও সাজানো ধর্ম থেকে মানবতাকে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুত বিজয় অর্জন করেছিলেন। অতি দ্রুত তাঁর সব শত্রু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দুশ্চরিত্র, অশ্লীল, খারাপ কথা ও কর্মের অবসান ঘটেছিল। মানুষ একনায়কতন্ত্র, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি

১। যারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইয়হি ওয়াসাল্লাম এর সুন্দর জীবন সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের আমরা তুর্কি বই 'Qisâs-i Anbiyâ' এবং 'Mawâhib-i ladunniyya' পড়ার অনুরোধ করি। এছাড়াও, Endless Bliss এর মূল তুর্কি বইয়ের প্রথম অংশে এবং ইংরেজি সংস্করণ (অধ্যায় ৫৬) এর প্রথম অংশে হিলইয়ায়ি সাদাত শিরোনামে বিশদ তথ্য রয়েছে।

পেয়েছিল। তৌহিদের সূর্য এবং তানজিহের চাঁদের আলোয় প্রতিটি জায়গা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এটাই নবুয়তের অন্তর্নিহিত অর্থ, কারণ নবী শব্দের অর্থই হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি মানুষের নৈতিকতাকে সুন্দর করেন এবং হৃদয় ও আত্মার ব্যাধির ঔষধ দান করেন। বেশিরভাগ মানুষই তাদের নাফসের দাস। তাদের আত্মা অসুস্থ। তাদের নিরাময়ের জন্য একজন আত্মা এবং নীতিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত ধর্ম এই অসুস্থতার মহৌষধ। এটা অন্তরের মন্দ এবং বিদ্বেষকে নির্মূল করে দিয়েছিল। এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করে যে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাজী তাঁর বই 'আল-মাতালিব আল-আলিয়্যা' তে ব্যাখ্যা করেছেন যে এই বিষয়টি মুহাম্মদ (দঃ) এর নবুওয়াত প্রমাণ করার সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বইয়ের শুরুতে আমি ব্যাখ্যা করেছি যে নবুওয়াত অর্থ কি এবং প্রমাণ করেছি যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যা ঘটেছে, তা অন্য কারো সাথেই ঘটেনি। এভাবে, বোঝা যায় যে তিনি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মুজিযাসমূহ অধ্যয়ন করেও তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি চিন্তাবিদদের নবুওয়ত প্রমাণের নির্বাচিত পদ্ধতির অনুরূপ। তাদের পদ্ধতিটি মূলকথা এভাবে বলা যেতে পারে যে ইহকাল ও পরকালে শান্তি সমৃদ্ধির জন্য মানুষের আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত আইন-কানুনের প্রয়োজন।

আমার বইয়ের দ্বিতীয় নিবন্ধ এখানেই শেষ। অতএব এটি স্পষ্ট হয়েছে যে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা ভুল পথে ছিল এবং যারা তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লিখিত ধর্ম ও নবুওয়ত বিষয়ক বইগুলো পড়ে, তারা ভুল ধর্মীয় তথ্য অর্জন করবে এবং তারা নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের পথে যাবে।

হিজরী-৯৮৯ মিলাদি -১৫৮১

আহমাদ ইবনে
আবদ আল আহাদ
আস সিরহিন্দী

দ্বিতীয় অংশ

অন্যান্য বিষয়

৫-ধর্মীয়জ্ঞানে অজ্ঞ এক ব্যক্তির জন্য উত্তর

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন, "প্রতিটি শিশু পৃথিবীতে মুসলিম হওয়ার জন্য একটি নিষ্পাপ উপযুক্ত প্রাণ নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তাদের পিতামাতা তাদের নাস্তিক বানায়।" এ থেকে বুঝা যায় যে শিশুদের ইসলাম ধর্ম শিখানো প্রয়োজন। তাদের পবিত্র অর্থাৎ নিষ্পাপ প্রাণ ইসলামি জ্ঞানার্জনের জন্য উপযুক্ত। ইসলামি জ্ঞানার্জন করেনি এমন একটি শিশু ধর্ম বিদ্বেষীদের মিথ্যা ও কুৎসায় পতিত হয়ে ইসলামকে ভুল বুঝবে। সে ভাববে যে এটি পশ্চাৎগামী বা ভয়ঙ্কর। যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ এবং ইসলাম ধর্মের কোনো নির্দেশনা বা ধারণা না পায়, তবে সে ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে পতিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু শিখবে, সর্বোপরি ইসলামী রীতিনীতির বিপরীত শিক্ষা অর্জন করবে। সে অপব্যখ্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর ঘৃণ্যভাবে অসত্য লেখনী তাকে পরিচালিত করবে। সে এই পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পাবে না। আর সে আখিরাতের চিরস্থায়ী বিপর্যয় ও শাস্তির দিকে ধাবিত হবে।

প্রত্যেক মুসলমান, এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই জানতে হবে- তরুণদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ইসলামের শত্রুরা যে মিথ্যাচার করে- তা কতটা হীন আর কতটা নিকৃষ্ট। আর এসব মিথ্যাচারে বিশ্বাস করে জাহান্নামে পতিত হতে না চাইলে, আমাদের উচিত ইসলামের মহাত্ম্য উপলব্ধি করা, সাথে সাথে এটাও বুঝা যে ইসলাম জ্ঞান, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানার্জন সমর্থন করে এবং এটি কাজ, উন্নয়ন, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। একজন জ্ঞানী, সচেতন ও সংস্কৃতমনা ব্যক্তি, যে সঠিকভাবে এবং ভালভাবে ইসলামকে বুঝেছে, সে ইসলামের শত্রুদের মিথ্যেসমূহ বিশ্বাস করবে না। ধর্মীয়ভাবে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, প্রতারিত ও হতভাগ্য মানুষকে দেখে সে তাদের প্রতি দয়া করবে। সে চায়বে তারা যেন সেই বিপর্যয়মূলক অবস্থা থেকে মুক্তি পায় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে।

আমরা এমন এক প্রতারিত এবং ধর্মীয়ভাবে অজ্ঞ ব্যক্তির বিকৃত লিখনিযুক্ত কয়েক পৃষ্ঠার একটি পুস্তক পেয়েছি। বিষাক্ত অপবাদসমূহ প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিশুদ্ধ হৃদয়কে আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত করতে তাকে শিখানো হয়েছিল, যা তাকে সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়; সে ভাল মানুষদেরকে নীতিভ্রষ্ট ও অধঃপতিত করতে চায়। কোনো লেখকের উপাধি আর যোগ্যতাকে গুলিয়ে ফেলে, যারা এর সত্য-ভালো -নৈতিকতা বিরোধী বিষয়বস্তুগুলো দেখে, তারা মনে করে যে এটি জ্ঞান পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে হয়েছে এবং এটির গুরুত্বও রয়েছে। এটি যে দুঃখের উদ্রেক করেছে তা নির্মূল করার জন্য নিম্নলিখিত ১২টি অনুচ্ছেদে জঘন্য অপবাদের জবাব হিসেবে সত্যটি লিখা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। এই নিছক মিথ্যাগুলো ও এগুলোর সত্যতা দেখে সরলমনা তরুণেরা ইসলামের শত্রুদের অপকৌশল ও ধূর্ততা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে এবং নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবিকারী অজ্ঞ, দুর্নীতিগ্রস্থ অবিশ্বাসীদের সহজেই চিনে নিবে।

১। সে বলে, "সমাজ জীবনে হস্তক্ষেপ করা ধর্মীয় চিন্তা এবং পদ্ধতি সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকের মত।"

উত্তরঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষনা করেছেন যে "তুমি পার্থিব সুবিধার জন্য এমনভাবে কাজ কর যেন তুমি কখনো না মরো।" ইমাম আল-মানাবী হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "আল-হিকমাতু দাল্লাত আল-মুমিন" (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশ্বাসীদের জন্য হারানো সম্পত্তি। সে যেখানেই এটা পাবে, তা অর্জন করা উচিত)। বিজ্ঞানের সকল মানুষ, শত্রু ও বন্ধুদের সর্বসম্মত মত হলো, ইসলাম ধর্ম সামাজিক অগ্রগতিকে সমর্থন করে এবং সভ্যতার পথে আলোড়ন সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ: ব্রিটিশ লর্ড জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন, "মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকারী কোনো ব্যক্তি কখনোই আবির্ভূত হয়নি"[১] এবং বিস্তারিত উদাহরণ এবং নথি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে ইসলাম সমাজকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

১৯৭২ সালে টেক্সাসের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের একজন আমেরিকান অধ্যাপক ড. ক্রিস ট্রাগলরের বিপুল শ্রোতা সমাগমে এক বক্তৃতায় বলেছেন যে ইউরোপীয় নবজাগরণের অনুপ্রেরণা ও বিকাশের উৎস ছিল ইসলাম; স্পেন এবং সিসিলিতে আগত মুসলমানেরা আধুনিক কলাকৌশল ও বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং শিখিয়েছিল যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি শুধুমাত্র রসায়ন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা,

নৌবিদ্যা, ভূগোল, মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রে উন্নতির মাধ্যমে সম্ভব হবে; এবং জ্ঞানের এই শাখাগুলো মুসলিমদের মাধ্যমেই উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন থেকে ইউরোপে এসেছিল। আধুনিক সংবাদমাধ্যমের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পার্চমেন্ট ও প্যাপিরির বিষয়ক লিখিত ইসলামী জ্ঞানের অবদানেও তিনি জোর দিয়েছিলেন।[২] শুধুমাত্র উপাধি ব্যতীত যার কোনো জ্ঞানই নেই ইসলামের এমন এক নীতিহীন, জঘন্য শত্রুর মিথ্যাচার কোনোভাবেই উপরোক্ত সত্যটি গোপন করতে পারে না। আঠালো কাদা দিয়ে সূর্যকে ঢেকে দেয়া যায় না।

২। তার মতে, "ধর্মের প্রতিবন্ধকতা থেকে রাষ্ট্রকে উদ্ধার করা জরুরি। সমসাময়িক পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।"

উত্তরঃ ইসলামে জ্ঞান, নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ উদার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি রাজনৈতিক স্বৈরাচারীদের হাতে খেলনায় পরিণত হওয়া থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। পুঁজিবাদী, স্বৈরশাসক এবং কমিউনিস্টের দাসেরা এই স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে তাদের নিজেদের নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন এবং অনৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মনে করে। খুনি, চোর এবং অসৎ লোকেরা ন্যায়বিচার ও দণ্ডবিধিসমূহকে নিজেদের জন্য বাধা হিসেবে দেখে। ধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যবহারকারী ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে ইসলামকে ধ্বংসের প্রচেষ্টাকারী অবিশ্বাসীর অজ্ঞতা এবং মূর্খতা বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। এই মানুষটি ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা চায়না; বরং ধর্মের ধ্বংস চায়। এটা স্পষ্ট যে, একজন নির্বোধ যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কঠোর পরিশ্রম এবং নৈতিকতার মাধ্যমে জাতি বা রাষ্ট্রগুলির অগ্রগতি প্রত্যাশা করে না; বরং এই সকল গুণাবলী প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামের ধ্বংসের মাধ্যমে অগ্রগতি চায় এবং যে পাশ্চাত্যের অনৈতিকতা, অশ্লীলতা ও স্বার্থপরতার আকাঙ্ক্ষা করে, সে শুধু জ্ঞান-প্রজ্ঞাহীনই নয়; বরং নৈতিকতা বিবর্জিতও।

১। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কোরআন। অংশ-২, অধ্যায়-২; লন্ডন।
২। সাপ্তাহিক পত্রিকা, দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড, পাকিস্তান, আগষ্ট ২৬, ১৯৭২।

৩। সে বলে, "ইসলামের সন্তুষ্টির দর্শন দ্বারা মানুষকে অসাড় করার মাধ্যমে,তারা মানুষদের নিজস্ব অধিকার দাবি না করে এমন একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পরিণত করার আশা করে। তারা ধর্মবিরোধিতা প্রতিরোধ করবে এই অজুহাত দিয়ে দাসত্ব এবং পরকালীন জীবনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ধারণাকে রক্ষা করে। সন্তুষ্টি শোষণের জন্য একটি শ্রুতিমধুর শব্দ। ইসলামের অনুসারীরা এই শোষণের বিস্তার করে।"

উত্তর: "ইসলামের পরিতৃপ্তির দর্শন" এধরনের কিছু অযৌক্তিক শব্দগুচ্ছ থাকতে পারে। দর্শন বলতে কি বুঝায় তা আমরা Endless Bliss গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছি এবং ইসলামে কোন দর্শন নেই এই বিষয়টিও স্পষ্ট করেছি। এ ধরনের ভুল শব্দগুচ্ছ প্রমাণ করে যে এটি ব্যবহারকারী ব্যক্তি ইসলাম বা দর্শনের কিছুই জানে না এবং সে ব্যক্তি অর্থ সম্পর্কে না জেনেই কয়েকটি শব্দগুচ্ছ মুখস্থ করে ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনেক শব্দ তৈরি করে। শতাব্দী ধরে ইসলামের শত্রুরা ধার্মিকের ছদ্মবেশ ধারণ করে আসছে এবং এই ধরনের মুখোশের পিছনে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে তারা কোনো উপাধি বা অবস্থান অর্জনের পর কোনো পেশা বা শিল্পের প্রধান ব্যক্তির ভান করে আক্রমণ করে। যেসব মিথ্যাবাদী মুসলমানদের প্রতারণা করার জন্য বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং তাদের অ-বৈজ্ঞানিক বিবৃতি তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করে, তাদের "বিজ্ঞানের প্রবঁচক" বলা হয়। শুধু ইসলামই নয়, বরং প্রত্যেক জাতির নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বইগুলিও সন্তুষ্টির প্রশংসা করে। বিজ্ঞানের এই প্রবঁচকের মিথ্যেকথার বিপরীতে, সন্তুষ্টি মানে কারো অধিকার ছেড়ে দেওয়া এবং নিষ্ক্রিয় হওয়া নয়। সন্তুষ্টি মানে কোন ব্যক্তির অধিকার, যা সে অর্জন করে তা নিয়ে তুষ্ট থাকা এবং অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন না করা। তাছাড়া, এটি লোকেদের নিষ্ক্রিয় করে না, বরং তাদের কাজ এবং অগ্রগতির প্রতি উৎসাহিত করে। এই প্রবচকের মিথ্যাবাদীতার বিরুদ্ধে, ইসলাম দাসত্ব রক্ষা করে না বরং ক্রীতদাসদের মুক্তির আদেশ দেয়। দাসত্ব ইসলামে নেই, বরং একনায়কতন্ত্রে ও কমিউনিজমে আছে। আসমানি কিতাবসমূহ এবং নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম), যাদের অলৌকিক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ হয়েছিল, পরকালীন জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানিয়েছিল এবং প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এটা অস্বীকার করতে পারে না। এই পথচ্যুত মুর্খের কথাগুলো নিছক আবেগপ্রবণ ও একগুঁয়ে অন্যায়

তর্ক। সে কোনো তথ্যসূত্র বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কোনোটিই উল্লেখ করেনি। পরকালীন জগতের বিশ্বাস সমাজ ও দেশগুলিতে অনুশাসন, ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং ঐক্য সৃষ্টি করে। এতে অবিশ্বাস ভবঘুরেপনা, নিষ্ক্রিয়তা, দায়িত্বশীলতা হ্রাস, অহংকার, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। কার্যকর কিছুতে বিশ্বাস করা অবশ্যই ভালো। অপ্রমাণিত, ভিত্তিহীন ও নিরর্থক কোন কিছু এড়িয়ে চলা যুক্তিসঙ্গত এবং অপরিহার্য। ইসলাম শোষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে প্রত্যাখ্যান করে। শোষণ যেমন একটি পাপ, তাই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে তা উপেক্ষা করাও জায়েজ নয়। ইসলামে অজ্ঞতা, অলসতা, কারো অধিকারকে উপেক্ষা করা এবং প্রতারিত হওয়া অজুহাত নয়, এগুলো অপরাধ। প্রসিদ্ধ একটি উক্তি আছে, "যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্মতি দেয়, সে দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়।" কিভাবে ইসলামে শোষণ থাকতে পারে? কিভাবে একজন জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী ব্যক্তি এরূপ বলতে পারে? যে অজ্ঞ ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারে, সে কি কখনো মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ক কুরআনের কোন আয়াত বা হাদিস শুনেনি? না জানা বা না শোনা এসব তার জন্য কোনো অজুহাত নয়!

৪। সে বলে, "প্রাচ্যের লোকেরা ধর্মের নেশায় নিমজ্জিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঈমান থাকার অর্থ দাসত্ব করা।"

উত্তর: ইতিহাসের যে কোনো পাঠক সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলাম যে সক্রিয়, অধ্যবসায়ী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সাহসী জাতি গঠন করেছে তা স্পষ্টভাবে দেখবে। এই সত্যের প্রকাশকারী হাজার হাজার উদাহরণ এবং লক্ষ লক্ষ বই আছে। এটি একটি লজ্জা যে একজন অন্ধ ব্যক্তি সূর্য দেখতে পায়না। এটা কি সূর্যের দোষ যে সে তাকে দেখে না? ঠিক একইভাবে একটি মহিমান্বিত ধর্মের প্রতি একজন অজ্ঞ, প্রতারিত ব্যক্তির মিথ্যা অপপ্রচারের কিই বা মূল্য আছে? সকল জ্ঞানী ও সভ্য ব্যক্তি বন্ধু হোক বা শত্রু সুখ এবং সভ্যতার উৎস এই ধর্মের প্রশংসা করেছে। ব্যক্ত বা লিখিত কিছু তার বক্তা বা লেখককেই প্রতিফলিত করে। বেশিরভাগ মানুষ, যখন শত্রুদের উপর রাগান্বিত হয়, তখন তারা নিজেদের মন্দ আচরণগুলো শত্রুদের উপর চাপিয়ে দেয়। প্রতিটি ধারক যা ধারণ করে তা ফাঁস করে দেয়। সুতরাং নীচ ব্যক্তির কথা তাকেই উপস্থাপন করে। যে অভীষ্ট বিষয়ে এ ধরনের ঘৃণ্য অপবাদ দেয়া হয় তা আবর্জনায় পতিত হীরের মত। একজন দুষ্ট ব্যক্তির ইসলামকে আক্রমণ করা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। আশ্চর্যজনক ব্যপার হলো কিছু মানুষ আছে যারা এই ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক অপবাদগুলো সত্য হিসেবে গ্রহণ করে, এসব বিশ্বাস করে এবং পরবর্তিতে বিপর্যয়ে পড়ে। এই অপবাদগুলো উত্তর দেয়ার মতো নয়। সূর্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্ধ ব্যক্তির কথা বলা বা একজন লিভারের রুগীর চিনি কেমন মিষ্টি বলার চেষ্টা করা সম্পূর্নই অর্থহীন। পরিপূর্ণ এবং উচ্চতর কোন জিনিস অসুস্থ বা নিচু মনের মানুষের কাছে বর্ণনা করা যায় না। এসবের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে হলো অন্যদের এসব বিশ্বাস করা থেকে রক্ষা করা। রোগীকে ঔষুধ দেয়া হয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য, মৃতকে জীবিত করার জন্য নয়।

সভ্যতার পথকে ইসলাম কিভাবে আলোকিত করেছিলো তার প্রশংসা সম্বলিত লক্ষ লক্ষ অনুচ্ছেদ রয়েছে, তন্মধ্যে দুটি আমরা উদ্ধৃত করছি। আমরা তাদের নির্বাচন করবো প্রাচ্যদের কাছ থেকে নয়, যাদের সে অপবাদ দেয় এবং ঘৃণা করে; বরং পশ্চিমাদের থেকে করা হবে, যাদের সে প্রশংসা করে। মোচেইম[১] বলেন, "এটি সত্য যে দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্র ইসলামিক স্কুলগুলো থেকে গৃহীত হয়েছিল, বিশেষত আন্দালুসিয়ার (স্পেন) মুসলিমদের কাছ থেকে যারা ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। আন্দালুসিয়া দখল করার জন্য রোমান ও গোথরা দু'শো বছর ধরে লড়াই করেছিলে। অন্যদিকে, মুসলমানরা বিশ বছরে সম্পূর্ণ উপদ্বীপ জয় করেছিল। পাইরেনিস অতিক্রম করে, তারা ফ্রান্সে পৌঁছেছিল। জ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অস্ত্রের চেয়ে কম কার্যকর ছিল না।" লর্ড ডেভেনপোর্ট বলেন, "ইউরোপ আজও মুসলমানদের কাছে ঋণী। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পত্তি দ্বারা নয় বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিমাপ করা হয়।' শতাব্দী ধরে ইসলামী রাষ্ট্রগুলি সর্বাধিক শক্তিশালী হাতে পরিচালিত হয়েছে। মুসলমানদের তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়া ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানজনক বিজয়।"

যেখানে একজন মূর্খ, মস্তিষ্ক বিকৃত লেখক তার বইয়ে লিখেছে যে প্রাচ্যসমাজ ধর্মের নেশায় মগ্ন ছিল, আর ব্রিটিশ লর্ড জন ডেভেনপোর্ট এর মতো অমুসলিম নিরপেক্ষ লেখকেরা যুক্তি দিয়ে লিখেছিলেন, "আন্দালুসিয়ার মুসলমানরা যেমন পাশ্চাত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ বপন করছিল, তেমনি মাহমুদ আল-গজনবী প্রাচ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন এবং তার দেশ বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ইসলামী শাসকগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল এবং দেশের সম্পদ থেকে সংগৃহীত অর্থ ভাল কাজের জন্য ও দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হতো। প্রাচ্যে সমৃদ্ধি ও সভ্যতা যখন অগ্রগতি অর্জন করেছিল, ফ্রান্সের সপ্তম লুইস ভিট্রি শহর দখল করে

নেয়, আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তেরোশ লোককে পুড়িয়ে হত্যা করে। সেই দিনগুলিতে গৃহযুদ্ধগুলোর কারণে ইংল্যান্ডে মৃত্যু ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে জমি চাষ করা হতো না এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ যুদ্ধগুলি এত মর্মান্তিক ও ধংসাত্মক ছিল যে এ ধরনের অন্য কোনো যুদ্ধ ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু সেসময় প্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোতে, তৃতীয় ফিরোজ শাহ তুঘলক, যিনি ৭৫২ হিজরী মোতাবেক ১৩৫১ সালে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন, তিনি ৭৯০ হিজরীতে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বাঁধ ও খাল, চল্লিশটি মসজিদ, ত্রিশটি স্কুল, একশটি সরকারি বাসস্থান, একশটি হাসপাতাল, একশটি সরকারি স্নানাগার এবং একশ পঞ্চাশটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাহানের শাসনামলে ভারতে সমৃদ্ধি ও সুখ বিরাজমান ছিলো। তিনি প্রকৌশলী আলী মুরাদ খানকে দিয়ে দিল্লি খাল নির্মাণ করেছিলেন। শহরের প্রতিটি অংশে মার্বেল পাথরের ফোয়ারা এবং মার্বেল পাথরের সরকারি স্নানাগার নির্মান করা হয়েছিল। প্রতিটি ঘরে পানি সরবরাহ করা হতো। সারাদেশে নিরাপত্তা বিরাজ করতো।"

৫। তার মতে, "ধর্ম অদৃষ্টবাদ এবং তৃপ্তির এক অভিব্যক্তি। এটি পরকাল সংশ্লিষ্ট একটি ধারণা, যা নিপীড়িত ও ক্ষুধার্তকে বঞ্চিত করে। এটা শিক্ষা দেয় যে পরকালীন জীবনে কল্যাণ অর্জনের জন্য পৃথিবীর জিনিসপত্রের প্রতি অতি আগ্রহী হওয়া যাবে না। বেঁচে থাকার আনন্দ ও প্রয়োজন অদৃষ্টবাদ ও আত্মতুষ্টির ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে এবং উন্নত জীবনযাপনের জন্য সংগ্রামের ধারণার জন্ম দিয়েছে। যারা জমাটবাঁধা ও ছাঁচে-গড়া প্রথা নির্ভর রীতিনীতির বিরোধিতা করে, ধর্ম তাদের ভয় পায়। ধর্মের আফিম একজন মানুষকে তুচ্ছ, অধীনস্থ এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়হীন বানায়ে ফেলে।"

উত্তর: এই ধরনের মিথ্যা এবং ঘৃণ্য অপবাদগুলো উত্তর দেওয়ার মতো নয়, কারণ সত্য সম্পর্কে অবগত কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এসব বিশ্বাস করে না। তবুও ইসলামের শত্রুরা জ্ঞানী না হলেও তারা বুদ্ধিমান। যুবকদের প্রতারিত করার জন্য, তারা তাদের নিরর্থক কাজের সাথে ব্যস্ত রাখে এবং তাদের নফসের জন্য আনন্দদায়ক ও লালসা মেটানোর উপযুক্ত ওষুধ দেয়। এভাবেই তারা যুবকদের ধর্মীয় জ্ঞান শেখা থেকে বিরত রাখে। এসকল সরলমনা নিষ্পাপ যুবকদের এইসব মিথ্যা বিশ্বাস করা থেকে এবং বিপর্যয়ের হাত রক্ষা করার জন্য, সত্য নিয়ে লেখালেখি করা খুবই জরুরী। যে ভাগ্যবান যুবক আমাদের বই Endless bliss ভালভাবে পড়বে, সে সঠিকভাবে ইসলাম শিখতে পারবে এবং সে কখনোই এসব মিথ্যাচার বিশ্বাস করবে না। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণী, "যার জ্ঞান আছে, সে মুসলমান হয়। অজ্ঞব্যক্তি ধর্মের শত্রুদের দ্বারা প্রতারিত হবে" এর মাধ্যমে আমাদেরকে ভালভাবে জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।

এটা সত্য যে ধর্ম ভাগ্য এবং সন্তুষ্টিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু এই অজ্ঞের চিন্তাভাবনার বিপরীতে, ভাগ্য বলতে কাজ না করা বা আকাঙক্ষা না করা বুঝায় না। ক্বদর বলতে বুঝায় মানুষ কি করবে তা আল্লাহ তাআলা আগেই জানেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কাজ করার আদেশ দেন। যারা হুকুম অনুযায়ী কাজ করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেন। তিনি সূরা আন-নিসার ৯৪নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "যারা জিহাদ এর পরিবর্তে ঘরে বসে শুধু ইবাদাত করে তাদের চেয়ে যারা জিহাদ করে, সংগ্রাম করে, এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরাই উত্তম ও মর্যাদাবান।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যারা কাজ করে জীবিকা অর্জন করে তাদের আল্লাহ্ তায়ালা পছন্দ করেন।" ইতিহাসশাস্ত্র এবং Endless bliss এর তুর্কি সংস্করণের আয় এবং ব্যবসায় শিরোনামের অধ্যায় পড়ে জানা যায় যে ইসলাম কাজ এবং উন্নয়নের ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈনিক কার্যাদি ও উন্নতির নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরপর দু'দিন শেষে একই অবস্থানে থাকে বা কোনো কাজ না করে, তবে সে নিজেকেই প্রতারিত করলো।" তিনি আরও বলেছেন, "কোন কাজ নিয়ে পরের দিন পর্যন্ত গড়িমসি করো না, অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে!" এবং "বিদেশী ভাষা শিখো। তাহলে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।"

এটা বলা অনুচিত যে পরকালের সুখ-শান্তির চিন্তা কাজে বাধার সৃষ্টি করে। হাদীসসমূহ, "যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে উপার্জন করে, সে কেয়ামতের দিনে পূর্ণ চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে"; "জ্ঞানীর ঘুমও ইবাদাততুল্য"; "হালাল উপায়ে উপার্জন করো এবং উপকারি খাতে ব্যয় করো"; "যে ব্যক্তি ধর্মের ভাইদের টাকা ধার দেয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে" এবং "সবকিছুরই প্রবেশাধিকার আছে। তবে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হলো জ্ঞান" এই হাদীসসমূহে আমাদেরকে কাজ করে উপার্জন করতে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যারা হালাল উপায়ে উপার্জন করে, পৃথিবীতে উপকারী কাজে তাদের উপার্জন ব্যয় করে, তারা পরকালে সওয়াব অর্জন করবে। তার মতে, "ধর্ম মানুষকে বিদ্রোহ থেকে বাধা দেয়। সুতরাং এটি একটি আফিম।" লেখককের এসকল বাজে কথা দ্বারা ধর্ম ও সভ্যতা সম্পর্কে তার কতটুকু জ্ঞান আছে তা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। এটা

স্পষ্ট যে এই কথাগুলো জ্ঞান বা গবেষণালব্ধ অভিব্যক্তি নয়। এটি শোষণের একটি ধরন ছাড়া আর কিছুই নয়, যার উদ্দেশ্য হলো ধর্মের প্রতি অন্ধ শত্রুতা দেখানোর মাধ্যমে কমিউনিস্ট নেতাদের তোষামোদ করে কোনো অবস্থান বা পদ অর্জন করা। যারা পার্থিব কোনো কিছু অর্জনের জন্য ঈমান ত্যাগ করে, তাদের "ধর্মের ভন্ড" বলা হয়। তারা সবসময় ভ্রান্ত এবং বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে। তারা যাদের তোষামোদ করে আস্থাভাজন হতে চেয়েছে, তাদের সেই কর্তাব্যক্তিদের পদাবনতি ঘটেছে। প্রত্যেক মরণশীল সৃষ্টজীবের মতো, এই নেতাদেরও আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতিতে বিচার করা হবে, যাকে তারা কঠোরভাবে অস্বীকার করেছিল এবং যার বিরোধিতা করেছিল, এরপর তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাদের তোষামোদকারিরা তাদেরকে ভুলে গিয়েছে এবং ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অন্য পক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে তারা অন্য আরেক মরণশীলের উপাসনা শুরু করেছে।

৬। সে বলে, "আরব দেশগুলিতে মরুভূমির আইনগুলি প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তারা বস্তুবাদ ও বস্তুবাদী দর্শনকে আক্রমণ করে আসছে।"

উত্তর: পূর্বে ধর্মের শত্রুরা তাসাউফের সাধকদের কাছ থেকে কয়েকটি মূল্যবান বাণী মুখস্ত করে অর্থ না বুঝেই বেপরোয়াভাবে এসব লেখতো ও বলতো এবং তারা যুবকদের ফাঁদে ফেলার জন্য ত্বরীকাপন্থী হওয়ার ভান করতো। কিন্তু বর্তমানে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের কিছু কথা ও ধারণা মুখস্ত করে, তাদের কর্তাব্যক্তিদের পা চেটে ও মদের গ্লাস পূর্ণ করে দেয়ার মাধ্যমে তারা একটি ডিগ্রি লাভ করে এবং একটি পদ দখল করে। সংস্কৃতবান ও জ্ঞানী সেজে তারা সেই মুখস্থ করা বাণী আওড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের উগড়ে দেয়, সেসব তরুণদের কাছে উপস্থাপন করে এবং সেগুলোকে ম্যাসন ও সাম্যবাদীদের আকর্ষণীয় উপহার হিসেবে প্রদর্শন করে মুসলিম শিশুদের প্রতারণা করার চেষ্টা করে।

যাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব আছে, কিন্তু বেআইনী উপায়ে ডিগ্রি অর্জন করে এবং যারা "বিজ্ঞানী"র মুখোশ এর আড়ালে ইসলামের উপর হামলা করে, সেসব অজ্ঞ লোকেদের "বিজ্ঞানের প্রঁবচক" বলে অভিহিত করা হয়। এক সময় এ ধরনের এক ভুয়া বিজ্ঞানী তার সন্দেহজনক ডিগ্রির কারণে এলাকার কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠে। মানুষরা তাকে গুরুত্বপূর্ণ একজন হিসেবে গণ্য করছে না দেখে সে একটি সভার আয়োজন করে গ্রামবাসী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের জড়ো করে এবং 'বস্তুবাদী দর্শন', 'আধুনিক' ও 'আলোকিত মানুষ' এসব বিষয়ে বলে। তার দিকে নজর না দিয়ে সকলেই ধার্মিক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করছে, এটা দেখে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সে বাজে কথা বলছিল যা তার কটু চরিত্র এবং মন্দ চিন্তার বহিঃপ্রকাশই। এদিকে ধার্মিক লোকদের ইঙ্গিত করে সে বলেছিল, "যে ইউরোপে যায়নি, সে গাধা।" মুফতি এফেন্দী ধৈর্যহারা হয়ে বলেছিলেন, "আপনার পূর্বপুরুষরা কি কখনো ইউরোপে এসে ইউরোপকে ধন্য করেছে?" যখন অন্যেরা সমস্বরে "না" জবাব দিয়েছিল, তখন মুফতি এফেন্দী এই বলে শেষ করলেন, "তাহলে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই গর্দভতুল্য পিতৃত্বের হবে", এভাবেই সেই কর্তৃত্ববান ব্যক্তি নিজেই নিজের ফাঁদে পড়েছিল। 'প্রগতিশীল' ও 'আলোকিত' কিন্তু মাথামোটা-অজ্ঞ লোকেরা, যারা ইসলামী আলেমদের মহাত্ম্য বা বিশ্বব্যাপী লাইব্রেরিগুলিতে পূর্ণ থাকা ইসলামী সভ্যতার সুপরিচিত ও গৌরবান্বিত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানে না, তারা খেলনা বন্দুক দিয়ে ইসলামের ইস্পাতসম দুর্গে আক্রমণ করেছে, তাই বলা যায়, তারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

৭। সে বলে, "যারা অর্থনীতিতে পতন ঘটিয়েছিল, তারা তখন এই বলে সে পরিস্থিতির সুবিধা নিয়েছিল যে, প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারিত অল্প খাদ্য ও এক বস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটা ধর্মের বিষাক্ত প্রভাব প্রদর্শন করে। সভ্যতার অর্থ বেশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং এর জন্য পরিশ্রম করা। কিন্তু ধর্ম ভাগ্যে তুষ্টি, পরকাল, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি ধারণার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের এই আন্দোলনকে ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং স্থিমিত করে দিয়েছিল।"

উত্তর: এখানে পা-চাটা গোলামের আরেকটি স্পষ্ট চিত্র রয়েছে, যা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রকাশ করেছি! ত্রিশ বছরে তিনটি মহাদেশে অভিবাসিত ইসলামী যোদ্ধারা পারস্য ও রোমের (সেই সময়ের দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য এবং বিশেষত সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল) সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিল এবং তারা তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সুন্দর নৈতিকতার মাধ্যমে প্রত্যেক জাতির ভালোবাসা অর্জন করেছিল, 'তারা নাকি অকাজের ও আফিম গ্রহণকারী নিস্তেজ মানুষ ছিল'- এটা কি সাংঘাতিক মিথ্যা! যে বিন্দুমাত্র ইতিহাস জানে, সেও এই ঘৃণ্য ও ভিত্তিহীন অপবাদ অবজ্ঞা করবে এবং বিরক্ত হবে। ইসলাম মানুষকে কাজ করার এবং উন্নতি করার আদেশ দেয় এবং যেসব ধনী দরিদ্রদের সাহায্য করে তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়। যদি এই লেখক ইসলামী শিল্পকলা, যা ইউরোপীয় এবং আমেরিকানদের অবাক করে দেয়

এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিমদের অর্জনের প্রশংসায় তাদের লিখিত আর্টিকেলগুলো দেখতো, তবে সে সম্ভবত এই লাইনগুলো লেখার জন্য লজ্জিত হতো। আমরা এখানে 'সম্ভবত' বলেছি কারণ লজ্জিত হওয়া একটি গুণ এবং একজন অসৎ ব্যক্তির কাছ থেকে তার লজ্জিত হওয়ার আশা করা যায় না।

ইসলাম মুসলমানদের কাজ করতে এবং উন্নতি করতে আদেশ করে। পরিতৃপ্তি মানেই এক কাপড়ে তুষ্ট থাকা এবং অলস হয়ে বসে থাকা নয়। মুসলমানরা মোটেও এরকম নয়। পরিতৃপ্তি মানে নিজের উপার্জনে সন্তুষ্ট হওয়া এবং অন্যের উপার্জনে লোলুপ দৃষ্টি না দেয়া। ইসলামই ইউরোপে সভ্যতা নিয়ে এসেছিল, কারণ ইসলাম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ দেখায় এবং তা অর্জনের জন্য মানুষকে কাজ করার নির্দেশ দেয়। নিম্নোক্ত হাদীসগুলো সহ অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে উপরে বর্ণিত কথাগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট: "সেই সবচেয়ে দয়ালু ও শ্রেষ্ঠ যে অন্যদের কাছে ভালো"; "সবচেয়ে বড় উপকার হলো দান করা"; "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি সে, যে মানুষদের মাঝে বেশি খাবার সরবরাহ করে" এবং "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী হল এমন ব্যক্তি, যে অন্যদের কাছ থেকে কিছু আশা না করে নিজেই কাজ করে এবং নিজের জীবিকা অর্জন করে।"

৮। তার মতে, "ধর্মের অপরিহার্য শক্তি ইতিহাসের সমসাময়িক সভ্যতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করেছে। ধর্মের অপরিহার্য কর্তৃত্ব, যা বিপ্লবের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রতিহত করে, তা ধ্বংস করা উচিত।"

উত্তর: এই ভুয়া বিজ্ঞানী "সভ্যতা" শব্দটি পুনরাবৃত্তি করে এই জাদুকরি শব্দের মাধ্যমে তরুণদের মস্তিষ্ককে সম্মোহিত করার চেষ্টা করে। সে মনে করে যে বিশাল, ভারী শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, ইলেকট্রনিক মেশিন, পরমাণুশক্তি চালিত কারখানা তৈরি করা এবং ব্যভিচারকে সহজতর করার উপায় ও বৈচিত্র্য হিসেবে নারীকে ব্যবহার করা- এসবই সভ্যতা। সে বিদেশি মুদ্রা, মিথ্যা, প্রতারণা এবং ফটকা চোরাচালানের মাধ্যমে একজন নেতা হতে চায়, অথবা শ্রমিকশ্রেণীর ব্যয়ে জীবনযাপন করে নিজের পাশবিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। ইসলামী আলেমগণ যে সভ্যতা বর্ণনা করেছেন এবং মুসলমানদের অর্জন করার আদেশ দিয়েছেন তা হলো "তা'মীর-ই বিলাদ ওয়া তারফীহ-ই ইবাদ" অর্থাৎ এটি হল ভবন, মেশিন ও কারখানা নির্মাণের মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়ন করা এবং জনগণের স্বাধীনতা, কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রযুক্তি ও সব ধরনের রাজস্ব ব্যবহার করা। বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার এ দুটি দিকগুলির মধ্যে প্রথমটি বিদ্যমান আছে। প্রযুক্তির উন্নতিগুলি চমকপ্রদ হলেও অর্থনৈতিক ও প্রায়োগিক আবিষ্কারগুলি জনগণকে দাসত্বের জন্য, নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এবং স্বৈরাচারী শাসন এর উদাহরণ। বিংশ শতাব্দী হলো প্রযুক্তির শতাব্দী। কিন্তু এটি সভ্যতার শতাব্দী হওয়া থেকে এখনও অনেক দূরে।

এই সমাজতান্ত্রিক লেখক তার ধর্ম ধ্বংস করার ইচ্ছার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, কারণ ইসলাম অনৈতিকতা, অসততা, শোষণ, ভণ্ডামি, একনায়কতন্ত্র, নিন্দা এবং এক কথায় মানবতাবিরোধী সব ধরনের খারাপ আচরণকে নিষিদ্ধ করে। একজন দুর্নীতিগ্রস্ত খারাপ ব্যক্তি কখনোই ভালো কিছু হোক এটা চান না। সংকীর্ণমনা পরাজিত ব্যক্তিরা স্পষ্টত ইসলামের গঠনতন্ত্রকে ভয় করে। ইসলাম সভ্যতার গতিরোধ করেছে একথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই অসৎ অবিশ্বাসী ইতিহাসকে বিকৃত বলে। যদি তার ইতিহাস সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকতো, তাহলে সম্ভবত সে নিজেকে এই জঘন্য কথা লেখা থেকে বিরত রাখতো। এমনকি অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছে যে ইসলাম সভ্যতাকে লালন করেছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে আধুনিক উন্নয়নের উপর আলোকপাত করেছে।

এটি স্পষ্ট যে বিজ্ঞানের এই অজ্ঞ প্রতারক লোকটি নিজেই এইসব মিথ্যা রচনা করার মতো এতটা জ্ঞানী বা শিক্ষিত নয়। সে ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে করা আক্রমণগুলো উদ্ধৃত করে ইসলামকে অসম্মানিত করার চেষ্টা করে। যাইহোক, সে ভুল এবং তার জ্ঞানের মত তার দেখা ও বুঝার ক্ষমতাও অপর্যাপ্ত, একারণে সে এসব তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

এখানে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষণকারী ও কেন তারা খ্রিষ্টধর্মকে আক্রমণ করে সে সম্পর্কে লেখা এবং এসব আক্রমণ যে ইসলামের বিরুদ্ধে নয় তা ব্যাখ্যা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

খ্রিস্টাধর্ম কনস্ট্যান্টাইন দ্য গ্রেটের সময় সর্বত্র এর ঐশ্বরিক গুরুত্ব হারিয়ে রাজনৈতিক সুবিধার অর্জনের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। পাদ্রীবর্গ অ-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করেছিল। তারা সবাইকে অন্ধের মত খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেছিল। লুথার এই উন্মাদ আক্রমণে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলো না এমন যেকোনো ধর্ম, যেকোনো জাতির প্রতিই সে চরম ক্ষিপ্ত ছিল। অন্যদিকে, মিশনারি সংগঠনগুলো সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল, সবার বিবেককে বিভ্রান্ত করেছিল এবং প্রতিদিন নতুন নতুন কথার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতো। খ্রিস্টান আক্রমণগুলি, না কোন জ্ঞানের সাথে না কোন বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বরং কখনও কখনও তা রক্তপাতের মাধ্যমে বা কখনও কখনও প্রতারণার মাধ্যমে সংঘটিত হতো, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে খ্রিস্টানদের প্রতি গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল। এটা লেখা হচ্ছিল যে যাজকরা লোকেদের প্রতারিত করছিল, তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্নতার প্রতি বিশ্বাস করতে বাধ্য করছিল এবং সবাইকে তাদের ধারনাগুলোর দাসত্ব করানোর চেষ্টা করছিল। তবে এই আক্রমণ শুধুমাত্র খ্রিষ্টানধর্মের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এমন লোকেরও দেখা মিলল যারা প্রত্যেক ধর্মকেই আক্রমণ করতো। ধর্মকে কলুষিতকরণ ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকেই যাজকদের মন্দ কাজগুলির সূত্রপাত- এ ব্যাপারটি বুঝার পরিবর্তে তারা মনে করেছিল যে এসব ধর্মে থেকেই উদ্ভূত। ধর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে না পড়েই তারা খৃষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত খারাপ দিকগুলো সব ধর্মের ক্ষেত্রেই আরোপ করতো এবং ধর্মগুলোকে আক্রমণ করতো। যারা ধর্মের সাথে চরম শত্রুতা করেছিলো তাদের মধ্যে ভলতেয়ার একজন। লুথারের মত সেও ইসলামের নিন্দা করেছিল এবং আমাদের হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে লুথার যা বলেছিল সেও তাঁকে তেমনি ভেবে তাঁর ব্যাপারে মন্দ কথা বলেছিল। ইসলাম অধ্যয়ন ছাড়াই তারাও সাধারণ খ্রিস্টানদের মতো সমস্ত ধর্মকে আক্রমণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো, জার্মানির ভন হের্ডার বলেছিল, ধর্মের বিরুদ্ধে অন্ধের মত শত্রুতা পোষন করা জোর করে খ্রিষ্টান বানানোর মতই ভুল। সে ধর্ম চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, বিশেষত ইসলাম ধর্ম অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। যার ফলে ইউরোপের লোকেরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পরিচালনার জন্য ইসলামের দেখানো আলোকিত পথের বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ চিন্তাবিদ কার্লাইল তার বই The Heroes এ A Hero Who is the Prophet শিরোনামে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন, নৈতিক গুণাবলী এবং কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন। এই বইটি তিনি ১৮৪১ সালে লিখেছেন। তিনি এই বইটিতে লিখেছেন, “একজন সম্মানিত ব্যক্তি যিনি বারো শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিচালনা করেছেন এবং যিনি পূর্ব ও পশ্চিমে সভ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণ হয়েছেন, তিনি লুথার ও ভলতেয়ার যেমন লিখেছে তেমন কোনো জালিয়াত হতে পারেন না। একজন নিচু মানসিকতার মানুষ কখনোই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারবে না। শুধুমাত্র বিশ্বাস ও নৈতিকতার অধিকারী একজন সত্যিকার মানুষ অন্যদের বিশ্বাস দিতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতিকে উন্নত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদি তা না হতো, তাহলে কেউই তাঁকে অনুসরণ করতো না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল কথা সত্য, কেননা একজন মিথ্যাবাদী কোনো ধর্ম ত দূরে থাক, কোনো বাড়িই প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা।“ কার্লাইলের সময় ইউরোপে কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী বই ছিল না। যাইহোক, তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বহু বছরের অধ্যয়নের কারণে তিনি খ্রিস্টানদের ও ধর্মের শত্রুদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করেননি এবং ইতিহাসের সত্যতা দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে অনেক ইসলামী বই ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হচ্ছে এবং কার্লাইলের ঐতিহাসিক লেখাগুলোর ভুল বোঝাবুঝি এবং অনিশ্চয়তাগুলি স্পষ্ট করা হচ্ছে।

যদি আল কুরআনের বিরুদ্ধে লুথারের ঘৃণ্য লেখালেখি এবং হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভলতেয়ারের কটুক্তিগুলোকে কার্লাইলের A Hero Who is the Prophet লেখাটির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে ভালোভাবে বুঝা যাবে যে ধর্মান্ধ খ্রিস্টান ও ধর্মের অজ্ঞ শত্রুদের দৃষ্টিতে এবং একজন জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষণক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইসলাম কতটা ভিন্ন। কার্লাইলের পর ব্রিটিশ গবেষক লর্ড ডেভেনপোর্ট হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন ও নৈতিক চরিত্রের সৌন্দর্য এবং আল কুরআন যে এমন এক জ্ঞানের উৎস যা মানুষকে সুখ ও শান্তির পথের নির্দেশ করে, এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যারা আল কুরআন ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিন্দা করেছিল তিনি তাদের এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন যা তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

যেমনটি দেখা যায়, বর্তমানে ইসলামের শত্রুরা মিথ্যা বক্তব্যের আগুন জ্বালাবার জন্য তিনটি উৎস থেকে বিষ সংগ্রহ করে: খ্রিস্টান মিশনারি, যারা ভলতেয়ারের মত অন্ধভাবে ধর্মকে আক্রমণ করে, কমিউনিস্ট যারা সব ধরনের সত্যকে নির্মূল করার জন্য মানুষকে প্রাণী ও যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে এবং ধার্মিকতা।

৯। সে বলে, "ধর্ম অর্থ হলো যা আছে তাই মানিয়ে নেয়া, আত্মতুষ্টি, দুর্ভোগ ও বৈষম্য মেনে নেয়া। এটি হল সমাজের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা স্থির করে রাখা। এটি সুখময় জীবন অর্জনে বাধা দেয় যা সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস করে এবং শোষণকে বাধা দেয়। এই নির্যাতন জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে সম্পন্ন হয়। যারা কষ্ট করে তারা জান্নাতের সান্ত্বনা লাভ করে। যা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বাকে খুন করে।"

উত্তর: উপরে বর্ণিত তিনটি উৎস থেকে প্রাপ্ত বিষ দ্বারা সে মুসলিম শিশুদের বিষাক্রান্ত করতে চায়, কিন্তু সে এটি করতে পারবে না। বর্তমানে, যুবকরা ইসলামী বই পড়ে এবং তাদের বিশ্বাস সঠিকভাবে শিখে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন: "একজন ব্যক্তি পরপর দুই দিনে সমান উপার্জন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রতিদিন উন্নতি করতে হবে।" যে বিজ্ঞ যুবক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নির্দেশ শুনেছে এবং রাসূল (দঃ) এর খলিফা, হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত "ছড়িয়ে দাও" এই নির্দেশনাটি সাবধানতার সাথে পড়ে, সে কখনোই এমন কোন অজ্ঞ ব্যক্তির মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে না যে নিজেকে "প্রগতিশীল" মানুষ ভাবে। ইসলাম বৈষম্য অনুমোদনের নির্দেশ দেয় না, বরং সমতা ও এগুলো নির্মূলের আদেশ দেয়। "আমি এমন একজন ন্যায়বান শাসকের সময় এসেছি," এই হাদিস শরীফটি আসমানি কিতাববিহীন অবিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করে। আল-মানাবী ও আদ-দায়লামী কিতাবে লিখিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছ, "জান্নাতে সবার আগে তারাই প্রবেশ করবে যারা ন্যায় বিচারক এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক।" এই হাদিসটি কি দুর্ভোগ এবং বৈষম্য প্রচারের অথবা দুর্ভোগ ও বৈষম্য এড়ানোর নির্দেশ করে? আমাদের পাঠকদের বিবেক অবশ্যই এর সঠিক উত্তর দেবে, এবং এটিও খুব ভালভাবে বুঝা যাবে যে একজন অজ্ঞ লেখক কতটুকু বিপথগামী হতে পারে এবং সে কাদের পরিতোষের চেষ্টা করছে।

ইসলাম যাকাত, ঋণ এবং পারস্পরিক সাহায্য করার আদেশ দেয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে যারা সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য দূর করে এমন আদেশসমূহ পালন করে, তারা জান্নাতে যাবে। যারা কষ্ট ভোগ করে শুধু তারাই নয়; বরং যারা নিজেদেরকে কষ্টদানকারী স্রষ্টার কাছে সঁপে দেয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইসলাম একটি উন্নত ও প্রগতিশীল ধর্ম যা সবার জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা নির্দেশ করে। ইসলাম "বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা" স্থির রাখেনা; বরং শাসকদের বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, যুদ্ধ প্রযুক্তির সমসাময়িক অবস্থার সাথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে এবং অগ্রগতির জন্য সব ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রয়োগে স্বাধীনতা দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজ্ঞানী মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, "সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করুন। যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখুন!" ইসলামের প্রত্যেক খলিফার পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা ছিলেন। তাদের পরামর্শ ছাড়া কিছুই করার অনুমতি ছিল না। ইবাদত এর মধ্যে কোন পরিবর্তন বা সংস্কার অনুমোদিত নয়, কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং পার্থিব বিষয়ে উন্নতির বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোনো জায়গাতেই প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে উঠেছিল। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা ব্যক্তি সুবিধা এবং চিন্তার স্বাধীনতা দেয়। প্রতিটি মুসলিম সমগ্র বিশ্বের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

১০। সে বলে, "ধর্ম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শোষণের ফল। পরিতৃপ্তি এবং তাকদীর মেনে নেয়া অলসতা এবং শোষণের কারণ। উৎপাদনের সকল সম্পদ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেই পুঞ্জীভূত ছিল। জনগণকে পার্থিব সুখের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হতোনা। 'সামান্য খাবার ও এক বস্ত্র' এই দর্শনের মানুষের বেঁচে থাকার ও সংগ্রামের শক্তি দূর করে দিয়েছিল। পরকালীন জীবনের প্রত্যাশা দুঃখ-দুর্দশার কারণ।"

উত্তর: ধর্ম সম্পর্কে কথা বলার জন্য ধর্মের ব্যাপারে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আজকের পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট শোষকদের সাথে ইসলামের তুলনা করার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি আক্রমণ করা ইসলামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা প্রকাশ করে। তার শত্রুতার মাত্রা এতো বেশী যে এটি তার চোখকে অন্ধ করে দেয় এবং রাগ তার বুদ্ধিকে ঢেকে দেয়। পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও নিষ্ঠুর কমিউনিস্ট, যারা উৎপাদনের সকল উপকরণ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পুঞ্জিভুত করে এবং মানুষদের শোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে; বরং সামাজিক সমতার নির্দেশদানকারী ইসলামের প্রতি তার এই আক্রমণ নিছক ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও রাশিয়ার প্রতি উন্মুক্ত দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। যেহেতু তার কোনো ইসলামী জ্ঞান নেই, তাই বারবার সে পরিতৃপ্তি ও

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করে। সভ্যতার নামে সে শুধুমাত্র অর্থনীতি এবং অর্থ উপার্জনের কথা বলে। সে বোঝে না যে পরিতৃপ্তি এমন এক বিষয় যা মানসিক রোগ প্রতিরোধ করে, অসঙ্গতি এবং শত্রুতা দূর করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। পরিতৃপ্তি ইসলামের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্মারক স্থাপনার কাজটি সহজতর করেছে। "যে পরিশ্রম করে সে উপার্জন করবে", ও "প্রতিটি মানুষ যা করবে তারই প্রতিদান পাবে" এই আয়াতসমূহ এবং আল-মুনাভী গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীস-"আল্লাহ তাআলা পরিশ্রম করে উপার্জনকারীদের পছন্দ করেন", "যেসব যুবকেরা কাজ করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের পছন্দ করেন না" এগুলো কি মুসলমানদের কাজ করে উন্নতি করার নাকি অলস হওয়ার নির্দেশ দেয়? উমাইয়া, আব্বাসী, গজনী, ভারতীয় তাম্বুরলাইন, আন্দালুসিয়ান ও অটোমান সভ্যতা যেগুলো মুসলমানদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের এই অর্জন কি কর্মতৎপরতা নাকি আলস্যের নিদর্শন? কোনো এক দরবেশের বলা "সামান্য খাবার ও এক বস্ত্র" কথাটি কি আল কুরআন ও হাদীসের আদেশ পরিবর্তন করতে পারে? উচ্ছসিত অবস্থায় বলা দরবেশের এই কথাটি শুধুমাত্র তার নিজের অবস্থার জন্য যথোপযুক্ত, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ইসলামের নয়। পরকালীন বিশ্বাস পোষণ করা কষ্টকর নয়, বরং এটি ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে শৃঙ্খলা ও সহজতা বজায় রাখে। ইতিহাস স্পষ্টভাবে এটিই দেখায়। ইসলাম আত্মপীড়ন নয়; বরং বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক দুর্ভোগের সমাপ্তি এবং অসুবিধা ও দুঃখ এড়ানোর নির্দেশ দেয়।

১১। তার মতে, "এই দেশগুলো এখনও মরুভূমির আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।"

উত্তর: আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নাযিলকৃত আল কুরআন ও হাজার হাজার হাদীসে বর্ণিত আদেশ ও শিক্ষাসমূহ সারাবিশ্বের জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই শিক্ষা ও আদেশগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য ইসলামী গবেষকগণ হাজার হাজার বই লিখেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি অ-মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিরাও সহজেই এই সত্য প্রকাশ করে। গোথে বলেছে, "যে ব্যক্তি আল কুরআন প্রথমবার পড়ে সে তৃপ্তি অর্জন করতে পারে না, কিন্তু এরপরে এটি পাঠককে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে। এটি তার সৌন্দর্যের মাধ্যমে তাকে জয় করে নেয়।" গিবন বলেছে, "আল-কোরআন শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই বর্ণনা করেনা বরং এতে নাগরিক আইন ও ফৌজদারি আইনসমূহও রয়েছে। আল কোরআন আল্লাহ তাআলার অপরিবর্তনীয় আদেশসমূহ এবং মানুষের সমস্ত বিষয় ও রাষ্ট্র পরিচালনারব আইনগুলো নিয়ে এসছে।"

ডেভনপোর্ট বলেছে, "আল-কোরআন ধর্মীয় দায়িত্ব, দৈনন্দিন বিষয়, আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা, শারীরিক স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য ও অধিকার, মানুষ ও সমাজের জন্য উপকারী বিষয় এবং নৈতিক শিক্ষা, অপরাধীদের শাস্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করে। কুরআন কারিম একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আল-কোরআন প্রতিটি জীবিত এবং নির্জীব প্রত্যেকের অবস্থা নিয়ন্ত্রন করে। নৈতিকতার দিক থেকে এটি খুব সুশৃঙ্খল এবং খুব কঠোর। আল-কোরআন সর্বদা সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়। এটি সামাজিক সমতাকে শক্তিশালী করে। সভ্যতার ক্ষেত্রে এর অনুকূল প্রভাব রয়েছে। অজ্ঞ সমালোচনা দ্বারা কুরআন এর মোকাবেলা করার মতো অযৌক্তিক ও হাস্যকর কাজ কিছুই নেই। এটি মানবজাতির কল্যাণ এবং সুখের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত সবচেয়ে মূল্যবান বই।"

যেমন দেখা যায়, প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি আল কুরআনের সংস্পর্শে আসে এবং সে যতটুকুই বোঝে সে অনুযায়ী কুরআনের সম্মান করে। এই পবিত্র বই সম্পর্কে "মরুভূমির আইন" বলার মতো অনৈতিকতা, হীনতা বা মূর্খতা কিছুই হতে পারেনা।

১১। সে বলে, "প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো মরুভূমির আইন বাদ দিয়ে নিজেদের পশ্চিমা মতাদর্শের দিকে পরিচালিত করছে এবং ধর্মের আফিমকে পরিত্যাগের ফলে তারা বিবেকবান হয়ে উঠছে।"

উত্তর: অমুসলিমরাও ইসলামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, আর এই অজ্ঞ, বর্বর লেখক ইসলামকে আফিম বলে। মোচেইম বলেছে, "দশম শতাব্দীর ঐ কালোদিনগুলোর মত খারাপ দিন আর হতে পারে না যখন পুরো ইউরোপকে অন্ধকার গ্রাস করেছিল। এমনকি যুগের সর্বাধিক অগ্রসর ল্যাটিন জাতিরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে যুক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যুক্তিবিদ্যা জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে উচ্চতর বলে মনে করা হতো। সেই সময়ে মুসলমানরা স্পেন এবং ইতালিতে স্কুল তৈরি করেছিল। ইউরোপীয় যুবকরা জ্ঞান অর্জনের জন্য এই স্কুলগুলোতে ভিড় করতো। ইসলামী গবেষকদের শিক্ষা-পদ্ধতি শেখার পর, তারা খ্রিস্টান স্কুল চালু করেছিল।"

বিশ্ব ইতিহাসের বইগুলিতে লিখিত সর্বসম্মতিক্রমে প্রশংসিত ইসলামিক সভ্যতা তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা কুরআন মজীদের অনুসরণ করেছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় বড় বড় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাকাশ ভ্রমণ শুরু হয়েছে, কিন্তু এই দেশগুলোর একটিতেও মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিয়োগকর্তাদের অপব্যয় ও অপচয় এবং শ্রমিকদের দারিদ্র্যের অবসান ঘটেনি। সাম্যবাদে রাষ্ট্র জনগণকে শোষণ করে; লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র তাদের খাদ্যের জন্য কাজ করে, তারা এখনও ক্ষুধার্ত ও নগ্ন; এবং এক নিষ্ঠুর, রক্তলোলুপ সংখ্যালঘু শ্রেনি তাদের খরচে জীবনযাপন করে। তারা প্রাসাদে একটি আনন্দদায়ক জীবনযাপন করে এবং সবধরনের নিষ্ঠুর, জঘন্য কাজ করে। যেহেতু তারা কুরআন মজীদ মান্য করে না, তাই তারা শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে পারে না। সভ্য হওয়ার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের অনুকরণ করা, পরিশ্রম করা এবং তারা যা করে সে অনুযায়ী কাজগুলো সম্পাদন করা প্রয়োজন; কেননা,আল কুরআন ও হাদিস আমাদের বিজ্ঞান ও শিল্পে অগ্রগতি অর্জনের নির্দেশ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আদী ও আল-মুনাভী (রাহমাতুল্লহি তাআলা আলাইহিমা) বর্ণিত এক হাদিস ঘোষণা করে, "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর সেসব বান্দাকে পছন্দ করেন যে উন্নতি করে এবং কারুকাজ করে।" হাকীম-তিরমিযী এবং আল মুনাভী গ্রন্থে লিখিত অন্য একটি হাদীসেত ঘোষণা করা হয়, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের নৈপুণ্য দেখতে পছন্দ করেন।" তবে শুধুমাত্র এটি অর্জন করাই সভ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অর্জিত সুবিধাগুলো সবার মাঝে সমানভাবে বন্টন করা উচিত এবং শ্রমিককে তার শ্রমের মূল্য দেয়া উচিত। আর এই সুবিচার শুধুমাত্র কোরআন আল-কারিম অনুসরণ করেই পাওয়া যায়। আজ ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়া সেসব ক্ষেত্রে সফল হয়েছে যেসব ক্ষেত্রে তারা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে। যাইহোক, যেহেতু আল কুরআনে ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে সুযোগ-সুবিধাগুলো বন্টন করা হয় না, তাই লোকেরা শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে পারে না এবং শ্রেণী দ্বন্দ্ব এড়াতে যায় না। যারা কুরআন মজীদের অনুসরণ করে না, তারা কখনোই সুখী হতে পারে না। যারা বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সাথে কোরআনকে মান্য করে অর্থাৎ, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তাদের এই আনুগত্যের মাত্রা অনুসারে এই পৃথিবীতে তারা অনেক উপকার লাভ করে। আর যারা বিশ্বাস করে এবং মান্য করে, তারা দুনিয়া ও পরকালে এথেকে উপকার লাভ করে; তারা এই পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে এবং পরকালে অশেষ রহমত ও সীমাহীন কল্যাণ অর্জন করবে। ইতিহাস এবং দৈনন্দিন ঘটনা উভয়টিই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এই কথাটি সত্য। কুরআন মজীদে বর্ণিত পথ অনুসরণ না করলে তারা মুসলমান হোক বা না হোক, যত দূরেই থাকুক না কেন, তারা অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করবে এবং তাদের ভবিষ্যত আরও বিপর্যস্ত হবে।

একজন সাকিপ সাবানজী নামে এক সুপরিচিত তুর্কি ব্যবসায়ী বলেছেন যে, যখন তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ হৃদরোগের অপারেশনের জন্য আমেরিকাতে ছিলেন, তখন ওই হাসপাতালে নিয়োজিত একজন প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক অপারেশনের আগে তার কাছে গিয়ে বললো, "আগামীকাল আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন হবে। আপনি আমার ধর্মের নন; আপনি একজন মুসলিম। কিন্তু আমরা সবাই একই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করি। আমরা সবাই তাঁর বান্দা। তাঁর সকল বান্দার কর্তব্য এরূপ অবস্থায় তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। অতএব আমি আজ রাতে আপনার জন্য প্রার্থনা করব।" সাকিপ সাবানজীর অভিব্যক্তি হলো: "পুরোহিতের এই কথাগুলো আমাকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং উত্সাহিত করেছিল, তা আমি প্রকাশ করতে পারছি না।" তার নিম্নোক্ত আর্টিকেল "Turning Towards Spiritual Values" শিরোনামে ৮ই মার্চ ১৯৮১ এই তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ।

"এটা সত্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কোন সীমা নেই। তবে, আরেকটি স্পষ্ট বাস্তবতা হল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতি, বস্তুগত ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানের উন্নতি মানুষের শান্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

আর সর্বোপরি, নির্দিষ্ট কিছু পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির সাফল্য 'আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলী' অর্জনের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়।

'জাপানী মডেল' নামে পরিচিত উন্নয়ন এর একটি উন্মুক্ত উদাহরণ। তুরস্কে আজকের দিনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 'জাপানী ধরনের রপ্তানি' এবং 'জাপানি ধরনের শিল্প' এর আকাঙ্ক্ষা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি হয়।

জাপানীরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল বহরে গাড়ি তৈরি পদ্ধতি শিখেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে, তারা আন্তর্জাতিক, এমনকি আমেরিকার বাজারেও এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা আরও সফলভাবে পণ্য বিক্রি পরিচালনা করতে পেরেছিল।

আমার বিশ্বাস অনুযায়ী, এই অর্জনের তিনটি কারণ রয়েছে:
১। প্রযুক্তি।
২। সুশৃঙ্খলা পদ্ধতিতে কাজ করা।
৩। ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অনুসরণ করা।

নির্দিষ্ট ব্যয় বা কষ্ট সত্ত্বেও এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রযুক্তির স্থানান্তর সম্ভব।
কিন্তু মূল্য পরিশোধ করেও সুশৃঙ্খলা কাজ, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের আনুগত্য এসব স্থানান্তর করা যায় না। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়গুলো আমাদের দেশে অবহেলিত ও মানহীন।

যখন আমরা মনোযোগ সহকারে আমাদের অতীত পর্যবেক্ষণ করি এবং জাপানের সাথে তুলনা করি, আমরা দেখতে পাই যে ঐতিহ্য মেনে চলা, শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ করা এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তুর্কিরা বিশ্বের গুটিকয়েক জাতিগুলোর মধ্যে একটি।

এখানে শক্তিশালী পরিবারিক কাঠামো বিদ্যমান। পরিবারের সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠকে ঘিরে জড়ো হয়। তার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে এবং তিনি তরুণদের রক্ষা করার জন্য দায়িত্বশীল।

তুর্কিরা তাদের দেশ, পতাকা, ধর্ম ও পবিত্রতা রক্ষার্থে লড়াই করে। এটি তাদের জন্য একটি পবিত্র লড়াই।

সে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করে। নতুন কোন কাজ শুরু করে আল্লাহর নাম দিয়ে। সে তার প্রিয়জনদের আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করে।

তুর্কিদের মধ্যে কারুশিল্প ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রনের একটি পদ্ধতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। সমাজের পুরনো ব্যবসায়ীরা, সংঘগুলো, প্রতিটি কারুশিল্পের রক্ষাকর্তা এবং প্রধান-সহকারী প্রধান-শিক্ষানবিশ সম্পর্কগুলো নিয়মানুবর্তিতার উদাহরণ, যেগুলো বাণিজ্য ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে তুর্কিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

শতাব্দী ধরে ইসলামের ধর্ম বিশ্বব্যাপী প্রতিটি কোণে বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ তুর্কীদেরকে মৌলিক আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে এক করে রেখেছে।

১৯৮১ সালের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে আমাদের তুরস্কের একটি চিত্র মূল্যায়ন করার সময় আমাদের অতীতের এই 'আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ' মনে রাখার অনেক সুবিধা রয়েছে তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা এটিকে অবহেলা করেছি।

আমরা আমাদের গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে দায়ী করতে পারিনা, যা আমরা এখন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে সম্পূর্ণভাবে এড়িয় যাওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করছি।

আমাদের জনসংখ্যা, যা বর্তমানে ৫ কোটি ছাড়িয়েছে এবং প্রতি বছর ১০ লক্ষ করে বৃদ্ধি পায়, তাদের জন্য ‘সমসাময়িক সভ্যতার ভিত্তিতে উন্নত একটি দেশ’ এবং ‘মানব সভ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাত্রার মান’ নিশ্চিত করতে বাধ্য। তবে আমরা সফল হব। আমরা যতই সফল হই না কেন, এটি স্পষ্ট যে কেবলমাত্র বস্তুগত উপায়ে ৫ কোটি মানুষকে সুখী রাখা কঠিন হবে।

আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো এমন কোনো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সন্ধান করা এবং তা সকলের কাছে তুলে ধরা, যে মূল্যবোধ এই ৫কোটি মানুষকে একত্রিত করবে এবং একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করার দৃঢ়সংকল্প দেবে। ৫ কোটির মানুষের মধ্যকার ঐক্য অনুধাবন করতে হলে এই প্রশিক্ষণ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যারা বস্তুগত সমস্যার বিষয়ে অসহায় তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রতি ভয় এবং ইসলাম ধর্মই, যা তাদের কাজের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জোগাবে।

এটা বুঝা গেছে যে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রয়োজন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে মহাকাশচারী চাঁদের উপর অবতরণ করেছিলেন তার পকেটে তার ধর্মের একটি বই ছিল।

আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত:

চাঁদ ভ্রমণের প্রযুক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। কিন্তু যদি আমরা এই প্রযুক্তি ও উপায় উদ্ভাবন করি, আমাদের অবশ্যই আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা অব্যাহত রাখতে হবে।

নতুন প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি উৎসাহিত করে আমাদের ইসলামী ধর্মের বিশাল শক্তি ব্যবহার করার অনুসন্ধান বজায় রাখতে হবে। আমরা স্কুলে আধ্যাত্মিক সহায়তা হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষা উপর চাপ দিতে বাধ্য। আধ্যাত্মিক সহায়তা হিসেবে স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আরো সময় নষ্ট হওয়ার আগেই আমাদের উচিত আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা।

ঐতিহ্য মেনে চলার ফলে চিন্তাভাবনা ও কর্ম সম্পর্কে পারস্পরিক সহনশীলতা সৃষ্টি হবে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধা তৈরি হবে, যা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। এটি পারস্পরিক বিরোধকে হ্রাস করবে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। এর ফলে একটি নির্ভরযাগ্য এবং শক্তিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যথায় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত জনগণকে সুখী করা ও পরিচালনা করা খুব কঠিন। এ ধরনের সমাজে সহজেই সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আল কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা হতাশ হয়ো না; চিন্তা করো না। যদি তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তাহলে তুমি অবশ্যই সফল হবে।‘

বর্তমানে আমরা শুনছি ও পড়ছি যে বিশ্বজুড়ে মানুষ একে অপরের সাথে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং তারা যেগুলি প্রত্যাখ্যান করতো সেগুলোকে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। একটি সহজ উদাহরণ দেয়া যাক: আমেরিকানরা দাবি করতো যে ইসলামে অনেক নিষ্ঠুর নিয়মকানুন রয়েছে এবং চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে দেয়া এগুলোর মধ্যে একটি। আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যের সিনেটর ডগলাস হাফের সাম্প্রতিক প্রস্তাব শুনে আমরা না হেসে পারিনি এবং অবাক হয়েছিলাম। তার রাজ্যে ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সে বলেছিল যে মুসলিম দেশগুলিতে যেভাবে চোরের হাত কেটে ফেলা হয় ঠিক তেমনি তার রাজ্যেও চোরেরহাত কাটার ব্যাপারে আইন পাস করা হবে। সিনেটর তার প্রস্তাবে লিখেছিল, ‘এটি আপনাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করতে পারে। কিন্তু আমি অন্য কোন সমাধানের কথা ভাবতে পারিনা। আমি মনে করি ঈশ্বর তাঁর বান্দাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেন। যারা অপরাধ করে, তাদের তাঁকে ভয় করা উচিত।‘ যেমনটি আপনি দেখছেব, দিন দিন মানুষ ইসলামের নিয়মগুলোর কাছাকাছি আসছে। এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের প্রতি আহবানকারী সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের বিশ্বধর্ম হওয়ার সব যোগ্যতা আছে।

আমরা আবারও বলছি যে ধর্ম শক্তির ভান্ডার যা আমাদের ক্ষতিকর এবং মন্দ কাজগুলো থেকে দূরে রাখে, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাধা দেয়, আমাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে,আমাদের ভাল অভ্যাসগুলো উন্মোচন করে আমাদের দয়ালু ও সহায়ক করে তোলে-যারা বড়দের মান্য করে, বিদ্রোহ ও আইন অমান্য করা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখে, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসাহ দেয়, আমাদের ব্যর্থতায় সান্ত্বনা দেয়, আমাদের দুঃখ কমিয়ে দেয়, আমাদের শক্তি ও আশা জাগিয়ে তোলে, আমাদেরকে সঠিক ও খাঁটি মুমিন বানিয়ে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, এক কথায়, আমাদের এই পৃথিবীর শান্তি এবং পরকালের চিরস্থায়ী সুখ অর্জন করতে সক্ষম করে।

আমাদের অবশ্যই আমাদের ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের আদেশ ও নিষেধসমূহ মেনে চলতে হবে এবং এর মূল্য বুঝতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুবিধা ও দুনিয়াবি বিষইয়াদি অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার বর্জন করতে হবে। যেসব ধোঁকাবাজ নিজেদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কুৎসিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'ধর্ম হারিয়ে যাচ্ছে' একথার মাধ্যমে লোকদের প্রতারিত করেছিল, তাদের কারণে এই বরকতময় দেশ এবং এই পবিত্র ধর্মের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তারা সবাইকে বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করেছিলো।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রঁবচকেরা এই দেশের, আমাদের জাতির শান্তি বিনষ্ট করেছে। ধর্মের প্রঁবচকেরা ধর্মকে তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ধর্মের বাইরের বিষয়কে ধর্মীয় বলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একই সাথে ভুয়া বিজ্ঞানীরাও তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য তরুণদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল এবং এ উদ্দেশ্যে, তরুণদের কাছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে গৃহীত হওয়ার জন্য তারা তাদের অবৈজ্ঞানিক, ধ্বংসাত্মক ও বিভেদসৃষ্টিকারী কথাগুলো প্রকাশ করেছিল। ধার্মিকের ভান করে ধর্মের প্রঁবচকরা ধর্মের প্রতি লোকেদের আনুগত্যকে শোষণ করেছিল, আর বিজ্ঞানের প্রঁবচকেরা বিজ্ঞানীর ভান করে ও তাদের ডিগ্রি দেখিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে জনগণের আস্থাকে শোষণ করেছিল। আমাদের অবশ্যই ধর্মের ও বিজ্ঞানের এই ভন্ড লোকদের কৌশল সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়েও এমন কিছু ভন্ড হাজির হয়েছে যারা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এটি প্রকাশিত হয়েছে যে নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী ও দস্যু, যারা তাদের বোমা, টেলিস্কোপিক বন্দুক, অ্যান্টিট্যাঙ্ক রকেট এবং খবর আদান-প্রদানের রেডিও সেটগুলো সহ ধরা পড়েছে, তদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানের ভূয়া লোকে পরিণত হয়েছে। বাকিরা হল তাদের দ্বারা প্রতারিত শ্রমিক ও ছাত্র-ছাত্রী। যেমনটা আমরা সংবাদপত্রগুলিতে পড়ি যে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যাকান্ড বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে বা বিজ্ঞানের এই হাজার হাজার ভন্ডদের দিয়ে এগুলো অনুশীলন করানো হবে, আমরা তাদের ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতায় বুঝতে পারি যে তারা আমাদের দেশকে কী ভয়াবহ বিপর্যয় বা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করছে। আমরা সেই সকল কমান্ডারদের কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো জানি না, যারা জাতির ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলো এবং এই ভয়ানক পথ বন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করেছিলো। রাতদিন আমরা তাদের জন্য দোয়া করি যারা আমাদের রক্ষা করেছিলো। যে কল্যাণ আমরা লাভ করেছি, তার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না, এমনকি যদি প্রতিমুহূর্তে আমরা আমাদের রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি আমাদের রক্ষার জন্য তাদের পাঠিয়েছিলেন! এই অসাধারণ দয়ার জন্য আমাদের প্রতিপালকের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা!

ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটিই মানুষের জন্য খুব প্রয়োজনীয়,খুব উপকারি সহায়ক। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করে। আর ধর্ম শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার এসব উপকরণের ব্যবহার সহজ করে। কমিউনিস্টরা জার্মানি এবং আমেরিকা থেকে চুরি করা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে বিশাল শিল্প, বিশাল কারখানা, চমকপ্রদ রকেট এবং স্যাটেলাইট স্থাপন করেছে। তবুও তাদের মধ্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞান রয়েছে, কোন ধর্মীয় উপাদান নেই। এজন্যই তারা তাদের জনগণকে নির্যাতন, অন্যদের আক্রমণ এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটাতে বৈজ্ঞানিক সামগ্রী ব্যবহার করে। তারা প্রতিটি স্থান অন্ধকূপে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানে তাদের অগ্রগতি সভ্যতা নয়; বরং বর্বরতার সৃষ্টি করেছে। শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সুখের জন্য লাখ লাখ মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে, আমাদের সত্য ধর্ম শিখার এবং সঠিক মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

কুরআন সত্যিকার মুসলমানদের সম্পর্কে কি বলেছে দেখুন:
'ভালো করে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই। তারা হতাশ হবে না।' (সূরা ইউনূস, আয়াত নং ৬২)

আসুন আমরা ইসলামের বিধিবিধানে বিশ্বাস করি, অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলি। এই নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে, আমাদের প্রিয় পাঠকেরা, আমরা একে অপরের সাহায্য করতে সক্ষম হব, আমাদের দেশকে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখ অর্জন করতে সহায়তা করতে পারবো।"

৬-কমিউনিজম এবং ধর্মের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের শত্রুতা

সামাজিক ন্যায়বিচার এমন একটি ধারণা যা প্রাচীনকাল থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে এবং সকল ধর্ম, শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক সম্প্রদায় দ্বারা সমর্থিত ও প্রতিশ্রুত। শুধুমাত্র সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তি ও শ্রেনিগুলোর মধ্যে কোনো ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়াই একটি সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সামাজিক ন্যায়বিচার মানে প্রত্যেকেই তার কাজ, জ্ঞান, প্রতিভা এবং সাফল্য অনুযায়ী যথাযথ পাওনা পাওয়া এবং কেউ অপব্যবহার বা শোষণের শিকার না হওয়া। সামাজিক ন্যায়বিচার মানে এমন ব্যক্তির জন্যও জীবনযাপনের স্বীকৃতি দেয়া যে ন্যূনতম কাজ করে। সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রাথমিক শর্ত হলো প্রতিটি কর্মরত ব্যক্তি যেন ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান অর্জন করতে পারে।

সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে সামাজিক সমতা বুঝায় না। সবার সমান আয় হওয়াটা ন্যায়বিচার নয়; বরং অবিচার হবে, কারণ এটি একটি শ্রেণীতে থাকা সকল শিক্ষার্থী সফল হোক বা না হোক সকলের পরীক্ষায় পাস করার মতো। না প্রকৃতিতে, না সমাজে বা অন্য কোথাও, কোথাও পরম সমতা নেই।

আইনের সমতা মানে একই ক্ষেত্র এবং অবস্থায় সকলের জন্য একই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা। সামাজিক এবং বিশেষত অর্থনৈতিক সমতা দাবি করা ও আশা করা অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এটি ন্যায়বিচারের ধারণা অনুসারে নয়। কিভাবে বিদ্যমান সম্পদ জনপ্রতি ভাগ ও বন্টন করা যায়- তা বিবেচ্য নয়; বিবেচ্য বিষয় হল কিভাবে প্রত্যেকের যোগ্যতার সাথে কাজ করার ও উপার্জনের অবস্থা প্রস্তুত করা যায় এবং কিভাবে প্রত্যেক্যের শ্রমানুযায়ী উপার্জন ও প্রাপ্য নিশ্চিত করা যায়।

সামাজিক ন্যায়বিচার জাতীয় আয়ের সবচেয়ে উপযুক্ত বন্টন নিশ্চিত করে এবং শোষণ ও অবাধ্যতা নির্মূল করে। এটি একটি নির্দিষ্ট এবং ক্ষুদ্র দলের হাতে মূলধন পুঞ্জিভুত হওয়া প্রতিরোধ করে। এটি প্রত্যেককে নিজের মান অনুযায়ী একটি জীবন পরিচালনার অধিকার দেয়। এটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতাবিহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। এই ধরনের সমাজের লোকেরা তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে নিরাপদ বোধ করে।

একটি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদারপন্থী উপাদানটির প্রতি গুরুত্বদানকারী মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার উপলব্ধি করা যায়।

জাতীয়তাবাদ জাতির উন্নতি সাধনে ব্যবহৃত একটি গভীর অনুভূতি। জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝায় নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা, এর অগ্রগতির জন্য কাজ করা, এর মর্যাদা, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও ঐতিহ্য রক্ষা করা ও বজায় রাখা। যে শক্তিটি সামাজিক ন্যায়বিচারের সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক ফলপ্রসূ রূপ উপস্থাপন করে, তা হল ইসলাম ধর্ম। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে তারা একে অপরের ভাই এবং সে অনুযায়ী একে অপরকে ভালোবাসে। এমনকি তারা অমুসলিমদের সম্পত্তি, জীবন ও পবিত্রতায় আক্রমণ করে না। ইসলাম ধর্ম মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা এবং সাহায্য সৃষ্টি করে, বিবাদ প্রতিহত করে, হালাল পথে অর্থ উপার্জন করার নির্দেশ দেয়, প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষকে তার পাওনা দেয় এবং প্রত্যেকের সম্পদ রক্ষা করে। প্রতিটি মুসলমান, তার উপার্জনে সন্তুষ্ট হয়ে শান্তিতে বসবাস করে। কেউ অন্যের সম্পদ এবং জমির ক্ষতি করে না। যারা সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে জানে এবং সেসবের ব্যাপারে আন্তরিক, তাদের অবশ্যই ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাতে হবে। সমাজতন্ত্র মানেই সামাজিক ন্যায়বিচার নয়। এদুটির সাধারণ নামকরণ সত্ত্বেও তারা ভিন্ন এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত। এগুলো ঈমান ও কুফর (অবিশ্বাস) এর মতোই অর্থাৎ, কোনো জায়গায় একটি থাকলে অন্যটি থাকতে পারেনা।

সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদন ও বাণিজ্যের সকল উপকরণ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতা, সকল কর্মজীবি মানুষকে শ্রমিকে পরিণত করা এবং ধর্ম, ইতিহাস, জাতি, দেশ এবং রাষ্ট্রের ধারণাগুলি ধ্বংসকে সমর্থন করে। একজন ব্যক্তির সমস্ত আয় এবং উপার্জন তার কাছ থেকে নিয়ে ফেলে, তাকে খুব সামান্য খাদ্য, পোশাক, গৃহস্থালি জীবনের অপরিহার্য দ্রব্যাদি, ও এক বা দুই কক্ষ তাকে দেয়া হয়, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি সুষ্ঠভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারে না। এভাবে মানুষ সব ধরনের উদ্যোগ, প্রতিযোগিতা, অনুসন্ধান, বিশ্বাস এবং উন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের সব প্রতিভা এবং

ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুর, নির্দয় কেন্দ্রের নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ক্রীতদাস বা রোবটদের মতো, তাদের সমস্ত শক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের খাটানো হয়।

আজ সমাজতন্ত্র লাল এবং হলুদ সাম্রাজ্যবাদ একনায়কতন্ত্রের জন্য একটি মুখোশ এবং একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের উপরোক্ত নীতিগুলির এক বা একাধিকটি যদি হালকাভাবে প্রয়োগ করা হয় বা প্রয়োগ করা না হয়, তবে এটি জাতীয় সমাজতন্ত্র বলা হয়। যদি সবগুলো নীতি নির্যাতন ও খুন-খারাবির সাথে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটিকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম বলা হয়। তাই বলা যায়, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম হল নাস্তিক্যবাদের প্রথম ও শেষ নাম। উভয়টিই মানুষকে বস্তুপূজা এবং ইন্দ্রিয়গত আকাংখা করতে শেখায়। মানুষকে আল্লাহ, তার নিজ সত্বা ও বিবেক সম্পর্কে অসচেতন করে তারা তাকে প্রাণীর মতো শুধু খাবারের জন্য বাঁচতে শেখায়। আর স্বৈরাচারী সংখ্যালঘু শাসকেরা পাগলা কুকুরের মত মানুষদের এবুং একে অপরকে ছদ্মবেশে ও নিঁখুতভাবে হামলা করে এবং হত্যা করে। এইজন্যই প্রতি বছর রাশিয়া ও চীনে লাখ লাখ মানুষ খুন হয়।

কমিউনিজম কেবল নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিতই নয়, বরং ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক ও সংক্রামক। এটি চাতুর্য ও নারকীয় পদ্ধতিতে নিরলসভাবে কাজ করে। এটি শুধুমাত্র বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারনই করেনা; বরং লক্ষ্যবস্তুর দুর্বলতা, দুর্বল জায়গাগুলোতে কিভাবে আঘাত হানতে হয় তাও জানে। দুর্দশা ও দারিদ্রতার সুবিধা নিয়ে এবং উস্কানিমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক ক্রম নষ্ট করে একটি জাতির মধ্যে শ্রেনিদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এটি গুপ্তচরবৃত্তি এবং প্রচারকাজের নেটওয়ার্ক মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে দেয়। টাকা ছড়িয়ে তারা হীন, নীচ ও অজ্ঞ মানুষদের তাদের এই জালে আটকিয়ে ফেলে। অতপরঃ মৃত্যুর হুমকি দিয়ে তাদেরকে সব ধরনের খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে। এই শয়তানি চাল চেলে তাদেরকে ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণভাবেই তাদের লক্ষ্য ধ্বংসে পয়তারা করে।

কোনো দেশ একবার এর ভয়ংকর থাবায় পড়লে তাদের পরিত্রাণের কোনো আশা নেই। কমিউনিজম একটি দেশের জন্য রাজনৈতিক বিপর্যয় এর মত ও জাতির জন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্যানসারের মতই ভয়ংকর এবং মারাত্মক।

কনমিউনিজমকে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির একটি মনে করে নিজেকে প্রতারিত করা উচিত নয় এবং ভবিষ্যৎ গন্তব্য সহ স্বাধীনতার ছাদের নিচে জনগণের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে তাদের ভোটের দ্বারা ক্ষমতায় আসতে পারে এবং মুক্ত বিশ্বে যেমনটি দেখা যায় তেমনি একটি সভ্য এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা উচিত। কমিউনিজমের আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় কথা বিশ্বাস করে, একটি বড় সাপের বিষাক্ত দাঁতে জব্দ হওয়া একটি দুর্বল ব্যাঙের মত অবস্থান তৈরি করা উচিত নয়।

কমিউনিস্টরা দূর থেকে সহজেই বিশ্বাস করে নেয় এমন মানুষদের কাছে চকচকে "জান্নাতের বাগান" হিসেবে যা দেখাতে চেষ্টা করে, তা সম্পূর্ণই প্রচারের আড়ালে থাকা মরণ ফাঁদ যা লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের অস্থি দ্বারা পরিপূর্ণ। এসব যারা গ্রহণ করে এবং তাদের কৌতূহল মেটাতে এসবের ভক্ত হয়ে যায় এবং মায়াবলে মুক্ত বিশ্বের ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড়া প্রচারের স্বাদ নিতে পছন্দ করে, যারা এই অলীক কল্পনার প্রভাবে কমিউনিজমকে পছন্দ করে, সত্য উপলব্ধি করার পর তাদের সেই ভালোবাসা, মায়া অনুশোচনা এবং অনুতাপে পরিণত হয়।

১৯৫২ সালে, ইতালির কমিউনিস্ট নেতা মাসেন্টোকে তার বিদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য ইতালীর আদালতে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কোনভাবে সে জেল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে পালিয়ে যায়, যা ইতিমধ্যেই "জান্নাতের বাগান" হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সেখানে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়াতে, তীব্র বেদনাদায়ক বাস্তবতা দেখে সে বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেনি। কিছুদিনের জন্য, সে তার দুঃখ-কষ্ট গোপন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মুক্ত রাষ্ট্র অস্ট্রিয়াতে পালিয়ে যায়, সেখানে সে বলেছিল যে তার তিন বছরের কারাদণ্ড সম্পূর্ণ করার জন্য যেন তাকে ইতালিতে হস্তান্তর করা হয়। সে বলেছে, “ইতালীর কারাগারের জীবন কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে বসবাসের চেয়ে বেশি আরামদায়ক এবং ভাল, যে দেশগুলোকে আমরা জান্নাত মনে করি।“ আরও কিছু ব্যক্তি ছিলো যারা একই দুঃখ অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এই মৃত্যুফাদ থেকে বেঁচে গিয়েছিলো, এই বিশ্বে তারাও পরিচিত মুখ। এদের মধ্যে- ক্রাভচেন্কো, সাখারভ, কাসিয়ানোভা এবং আরো অনেকে। এটি সুবিদিত সত্য যে প্রায় পনেরো লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ গ্রামবাসী ও শ্রমিক পশ্চিমা দেশগুলো থেকে পালিয়ে যায় এবং

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদ থেকে পালিয়ে স্বাধীন দেশগুলোতে তাদের সুযোগ গ্রহণ করে আশ্রয় নেয়। তাহলে, সেই উচ্ছৃঙ্খল বামপন্থীরা কীভাবে এই দন্ডপ্রাপ্ত লোকদের দুঃখ ব্যাখ্যা করবে, যারা সেই রক্তাক্ত পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, যে দেশগুলোকে তারা "জান্নাত" হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপন করে?

মুখোশধারী বিশ্বাসঘাতক লোকেরা শ্রমিকদের জন্য কারখানা ও অন্যান্য শিল্প, কৃষকদের বিশাল ভূমি এলাকা এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত দেশগুলোর জনগণের শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। এখন দেখা যাক, তারা রুশ জনগণ, ককেশাস, তুর্কিস্তান, ইউক্রেন, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া এবং অন্যান্য দেশগুলোতে কি দিয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকদের যে কারখানা ও ভুমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পরিবর্তে এটি কেবল বিস্তৃত, ফাঁকা সাইবেরিয়া উপহার দেয়নি, যা চিরস্থায়ী বরফে আচ্ছাদিত এবং পঞ্চাশ ডিগ্রি-শূন্য-তাপমাত্রায় সজ্জিত; বরং তীব্র শীতে বনের গাছপালার ঝড়ে পড়ার সাথে সাথে তাদেরও ক্ষুধার জ্বালায় সহজে মারা যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার পরিবর্তে তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। কল্যাণের পরিবর্তে, একটি যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, ক্ষুধা দিয়েছে। আর এটি দেশগুলো লজ্জার দেয়াল দ্বারা ঘেরাও ও লোহার গরাদের পেছনের কারাগার পরিণত করেছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে শুধু রাশিয়ায় এক কোটি সত্তর লাখ নির্দোষ মানুষকে নির্মূল করা হয়েছিল, অথচ সেখানে স্বাধীনতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এটি কোন গল্প নয় বরং স্পষ্ট সত্য ঘটনা।

রাশিয়ায় বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের আগে, হঠাৎ অনেক সমাজতান্ত্রিক দলের উদয় হল। এগুলোর মধ্যে ছিল লেবারার ডেমোক্রেটস, পিজান্ট ডেমোক্রেটস, বলশেভিকি, মেনশেভিকি, ডানপন্থী ও বামপন্থী লিবারেল এবং কাদেত পার্টি। এদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধারনা এবং প্রচারণা উত্থাপন করে। তারা বড় বা ছোট যেকোনো জমায়েতে বক্তৃতা প্রদান করে। এই কার্যক্রম গ্রাম, কারখানা, ছোট কর্মশালা, চত্বর এবং এমনকি সংকীর্ণ রাস্তায়ও অবিচল ছিল। আকর্ষণীয় বক্তৃতা ও মানুষের প্রতি সব ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলগুলি প্রতারণা করতো এবং সম্ভল ও বেকারদের জড়ো করতো। এই অশান্তি কয়েক মাস ধরে চলেছিল। এই বিরতিহীন বক্তৃতা ও কথা সেসব মানুষদের বিস্মিত করেছিল, যারা সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। মানুষ অচেতন এবং মত্ত হয়ে যাচ্ছিলো।

সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি দেয়া দল বলশেভিক কমিউনিষ্ট পার্টি এই দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তারা শুধু শ্রমিক ও কৃষকদের সম্বোধন করতো। তারা বলেছিল যে শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের নিয়োগকর্তার স্থান গ্রহণ করবে এবং ব্যবসা ও ভূখন্ডে সমান অংশীদার হয়ে উঠবে, আর ধনীদের দাসত্ব থাকবে না, তারাও ধনীদের মতো অ্যাপার্টমেন্টে বাস করবে, ধনী ব্যক্তিরাও রাস্তা পরিষ্কার করবে ও ঝাড়ু দিবে, কৃষকদের জমির মালিক বানানো হবে এবং কৃষকদের জমি কর্মরত কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

বলশেভিক পার্টি ও লেবারার পার্টির প্রচারণার ক্ষেত্রে সাধারণ একটি বিষয় ছিল, তা হলো তাদের দাসত্বের অবসানের প্রতিশ্রুতি। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে মুক্তির দিন নিকটবর্তী।

এই সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দলগুলো বারবার বলেছিল যে তারা শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছে যাতে তাদের উচ্চ মানের জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা যায়। শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের অনুসরণ করলে তারা তাদেরও উদ্ধারকারী হওয়ার সম্মানের অংশীদার করবে।

তারা বলতো, “হে শ্রমিক ও কৃষক! তোমরা যদি বুর্জোয়া, পুঁজিবাদি, ভূপতি এবং অন্যান্য সকল শাসকের শোষণ থেকে বাঁচতে চাও, তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দাও এবং এর চারপাশে জড়ো হও।“

বিশেষ করে অবহেলিত শ্রমিক এবং কৃষকেরা তাদের জন্য কোনটি ভাল, কোনটি খারাপ সে পার্থক্য করতে পারত না এবং তারা বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির শিকার হতো। দুঃখের সাথে বলা যায়, আজকের রাশিয়ান শ্রমিকদের দুঃখজনক ও বিপর্যয়জনক পরিস্থিতি তাদের অসচেতনতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল।

বিপ্লবের শুরুতে, কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ পাগলা কুকুরের মতো অনেক বোকা লোককে এমনভাবে নাড়া দিলো যে তাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই নির্দোষ মানুষকে ধরিয়ে দিতো। বেশিরভাগ কমিউনিস্ট নেতারা ইহুদি ছিল, যারা প্রতিশোধের জন্য রাশিয়ান জনগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতো। লেনিন (মৃত্যু: ১৩৪২/১৯২৪) এবং ট্রটস্কি (স্ট্যালিন যাকে

মেক্সিকোতে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলো এবং সেখানেই সে ১৩৫৮/১২৪০ সালে মৃত্যুবরণ করে) কার্ল মার্কস (মৃত্যু: ১৩০০/১৮৮৩) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িকতার পতাকার অধীনে গণহত্যার নীতি অনুসরণ করেছিল। তারা যেসব হত্যাকান্ড ঘটেয়েছিল তা এতটাই কুৎসিত ছিল যে বিবেকবান লোকেরা এটি স্বীকার করতে পারে বা বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রথমত, সামাজিক শ্রেণিগুলোকে একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করা হয়েছিল। ফলে রাশিয়া জুড়ে শত্রুদের কাছ থেকে বন্ধুদের আলাদা করা কঠিন হয়ে উঠেছিল যাতে কার সাথে কে ছিল তাও জানা না যায়। এটি গৃহযুদ্ধের সূচনা করে, যা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার যুদ্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল এবং সমগ্র রাশিয়া রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধ কয়েক বছর ধরে চলেছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। দেশের সর্বত্র পুড়ে গিয়েছিল এবং ধ্বংস হয়েছিল। সমস্ত সরকারি কাজ বন্ধ ছিল এবং বেকারত্ব, অস্থিরতা এবং অসুস্থতা মানুষদের ধ্বংস করে দিচ্ছিল।

বিপ্লবের আগে, সমগ্র রাশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা একটি নিষ্ঠুর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলো যা শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের অবহেলিত নেতারা মনে করেছিল যে তারা একটি স্বররগীয় জীবন অর্জন করবে। পরবর্তিতে শ্রমিক ও কৃষকদের কয়েক বছর সময় লেগেছিল এটা বুঝতে যে তারা কিছুই পায়নি, তাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে, এবং ফাঁদে ফেলা হয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা বুঝতে তারা অনেক দেরি করে ফেলেছিল। এখন স্বৈরাচারী রাষ্ট্র তাদেরকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বাধা দেয় এবং সময়ে সময়ে গণহত্যা সংঘটিত করে।

সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি কে ভোকোশিলোভ ১৯৩৪ সালে রাশিয়ার দেওয়া একটি ভোজের সময় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম সি বুলিটকে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন: “১৯১৯ সালে আমি সজারের দশ হাজার অফিসারকে তাদের স্ত্রীদেরসহ একত্রে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করিয়েছিলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা আমাকে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল। আমি তাদের সবাইকে তাদের ছেলেদের সাথে একসঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের পতিতালয়ে পাঠিয়েছিলাম যাতে তাদেরকে রাশিয়ান সৈন্যরা ব্যবহার করে।“ তিনি আরো বলেন যে, নিঃস্ব নারীরা এই ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করতে পারেনি এবং তিন মাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের কিছুসময় পর, সিজার নিকোলাকে সপরিবারে এমনকি তার শিশুসন্তানকেও ব্রিয়াস্ক বনে হত্যা করা হয়। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় যে রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটেছিলো, সেই সময় হত্যা এবং ক্ষুধা ও অনাহারে মারা যাওয়ার সংখ্যা ছিল ৬৩,৮০০,০০০। রক্ত ও হাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মহীন সরকার যে দেশগুলো দখল করে সেসব দেশে কি নিয়ে আসবে তা স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান এবং নথিগুলো দেওয়া হয়েছে। এই নথিগুলো খুব নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। যারা এখনো জেগে উঠছে না তারা কতই না দুর্ভাগা!

রাশিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ:

তুর্কিস্তানে চৌদ্দ হাজার বড় এবং ছোট মসজিদ, ককেশাস ও ক্রিমিয়ায় ৮,০০০, তাতারিস্তান ও মূল কুর্দিস্তানে ৪,০০০ মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিলো। শুধু বুখারা শহরেই ৩৬০ টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিলো। শুধু একটি মাদ্রাসা (স্কুল) বাকি ছিল যা এখন নাস্তিকতার একটি যাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর সমরকন্দ শহরে উলুগ বে মাদ্রাসা নাস্তিকতার একটি যাদুঘর হিসেবে আছে এবং দুটি গীর্জা অভ্যন্তরীণ বাস্কেটবল এবং ভলিবল খেলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ধর্মের লোকদের হত্যা:

২৭০০০০ এরও বেশি মুসলিম আলেমদের হত্যা করা হয়েছিল। অন্যরা সাইবেরিয়ার ক্যাম্পে নির্বাসিত হয়েছিলেন, যেখানে শূন্যের নীচে ৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ঠান্ডা ছিল। শুধুমাত্র তুর্কিস্তানে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ত্রিশ লক্ষের বেশি মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে তারা আফগানিস্তানে প্রবেশ করলে রাশিয়ানরা অবিলম্বে গ্রামেগুলোতে হামলা চালায়। তারা সব ধরণের খাবার, পোশাক, গৃহস্থ-সামগ্রী এবং গহনা জব্দ করে। তারা আগত মুসলমানদের হত্যা করে, নারী ও শিশুদেরকেও একইভাবে হত্যা করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তারা ট্যাংকসহ কুণ্ডে শহরে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা সেখানকার বড় মসজিদে মুসলমানদের প্রার্থনারত অবস্থায় বোমা হামলা করেছিল, তখন সেখানে শত শত মুসলমান শহীদ হয়েছিল।

যারা বিপ্লব ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেছিল তাদের উপর চালানো কমিউনিস্টদের ভয়ানক গণহত্যা বা সাইবেরিয়ান শিবিরগুলোতে নির্বাসন সম্পর্কে উপরে প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলো বর্বরতার এক উদ্বেকজনক চিত্র তুলে ধরেছে যা সমস্ত মানবতার জন্য একটি পাঠ্য হওয়া উচিত।

ধর্মীয় বই এবং স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করা:

বুখারা, সমরকন্দ, কাকান্ত, কাযান, খিভা, উফা, বাকু, তাসকন্দ, বাখছিসরাই, ডারবেন্ট, তিমিরহান, কাশগার, আলমস্ত, তিরমি ইত্যাদি শহরগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পর তুর্কিদের নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে সাজনো ছিল এবং ইসলামী স্থাপত্যকলা দ্বারা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পে পরিণত হয়েছিল। কমিউনিস্টরা সমস্ত ধর্মীয় কৃতি জব্দ করেছিল, প্রধানত কুরআন আল-কারিমগুলো ও হাদীস শরিফের গ্রন্থসমূহ এবং নির্লজ্জভাবে ও নির্দয়ভাবে সেগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং রাস্তায় পুড়িয়ে দিয়েছিল। এছাড়াও, জনগণকে ধর্মীয়, জাতীয় ও ঐতিহাসিক বইগুলি প্রদান করার আদেশ দেওয়ার পর তারা এই বইগুলি জব্দ করে এবং একইভাবে সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। এদিকে, কিছু মুসলমান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই যালিমদেরকে তাদের বইগুলো দেওয়ার বদলে সেগুলো তাদের বুকে লুকিয়ে রেখেছিল। এই কাজ করতে গিয়ে বই হস্তান্তর করেনি এমন হাজার হাজার ধার্মিক শহিদ হয়েছিল।

ধর্মের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও প্রচারণা:

ধর্মের উপর গুরুতর আঘাত ও ধর্মগুরুদের গণহত্যার পর লক্ষ লক্ষ নির্দোষ লোকের মৃতদেহের উপর প্রতিষ্ঠিত পৌত্তলিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রধানত ধর্মের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত নিপীড়ন ও প্রচারণা চালায়:

১। স্কুলের পাঠ্যক্রমে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল।
২। মসজিদে ইবাদাত করা এবং সকল মন্দিরে উপাসনা করা নিষিদ্ধ ছিল।
৩। রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় লোকদের কোনো স্থান ছিল না।
৪। বাড়িতে তরুণদের ধর্মীয় বা জাতীয় শিক্ষা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।
৫। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টিভি ও রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে ধর্মবিরোধী প্রচারণা প্রচারিত হতো এবং মিথ্যা নাটক প্রদর্শিত হতো।
৬। সর্বদা বলা হতো যে আল্লাহ তায়ালার কোন অস্তিত্ব নেই (নাউযু বিল্লাহ) এবং পবিত্র গ্রন্থগুলো কুসংস্কারপূর্ণ মিথ্যা।
৭। দ্য গডলেস সোসাইটি এবং দি অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ইয়ং গডলেস নামক সংস্থাগুলো কর্তৃক শহর ও গ্রামগুলিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। ধর্ম, আল্লাহ তায়ালা ও নবী (আলাইহিমুস সালাম)দের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হতো এবং নাস্তিকতায় মানুষকে নিয়োজিত করার জন্য নিয়মিত রাত্রিকালীন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
৮। বিনোদনের স্থানগুলোতে, যেমন থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রে আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, কোরআন আল-কারিম, নবীগণ, ধর্মীয় লোক ও ধার্মিক লোকদেরকে সর্বদা উপহাসের পাত্র বানানো হতো। এভাবে, তরুণ মস্তিষ্কগুলো বিষাক্রান্ত করতো।
৯। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য যেমন সালাত, রোজা, হজ্ব এবং যাকাত অবশ্যিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি কালিমা শাহাদাত পাঠ করা বা আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করাও অপরাধে হিসেবে বিবেচিত হত। ধার্মিক লোকেরা উপরে উল্লেখিত ইবাদাত পালন করলে গোপন পুলিশ তাদেরকে নির্বিচারে মামলা দিতো এবং বিশেষ করে "কুসংস্কার প্রচারণা", "রাষ্ট্রের বিরোধিতা" এবং "শাসনের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ" করার দায়ে অভিযুক্ত হলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো।

মৃতদের অসম্মান করা:

১। মৃতদেহের গোসল দেয়া ও জানাজা নামায আদায় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।
২। কেউ মারা গেলে তাকে প্রথমে একটি গর্তের মধ্যে রাখা হতো এবং প্রথমে চুন ও পরে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো।
৩। শহরের কবরস্থান থেকে উত্তোলনকৃত মানুষের হাড় এবং স্মৃতিস্তম্ভ থেকে সংগ্রহ করা পাথর দিয়ে শহরে নিচু জায়গাগুলো ভরাট করা হতো।
৪। গ্রামের কবরস্থান থেকে পাওয়া মানুষের হাড়গুলি মাটিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

প্রিয় পাঠক! তাদের সকল অত্যাচার, গণহত্যা , নির্বাসন দিয়েও কমিউনিস্টরা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক ভালোবাসাকে দূর করতে সক্ষম হয় নি; তারা পবিত্র বন্ধন ভাঙ্গতে পারেনি। তাদের শত প্রচেষ্টা, নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে থাকা বর্তমান ১৪ কোটি মুসলমানদের মধ্যে যেসব মুসলমানদের তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়েছে এবং ধর্মহীন করেছে তাদের সংখ্যা ৫ শতাংশ অতিক্রম করেনি। এমন কোন জাগতিক শক্তি নেই যা ধর্ম বা খোদাপ্রদত্ত ঈমানকে ধ্বংস করতে পারে। তাদেরকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করা যাবে না। একজন মুসলিম তার জীবন দিয়ে দিবে তারপরও তার ধর্ম ও পবিত্রতা বিসর্জন দেবে না। ১৯৮৬ সালের আফগান দুর্ঘটনায় রাশিয়ানরা এটি খুব ভালভাবে বুঝে ছিল। সেসময় হাজার হাজার রাশিয়ান সেনা রকেট ও বিমান দিয়ে আক্রমন করেছিল এবং নারীসহ গ্রামবাসীদের হত্যা করেছিল। মুসলিম শিশুদেরকে বিধর্মী বানানোর জন্য মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। মসজিদ, বিদ্যালয়, ঘর ও খাবারের দোকান পুড়েয়ে দিয়েছিল। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের মৃতের সংখ্যা ১০ লাখেরও বেশি। হাজার হাজার মুসলিম যোদ্ধা শহিদ হওয়ার পরও অবশিষ্ট যোদ্ধারা বিধর্মীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। মুসলিম দেশগুলো থেকে তাদের এই অপকর্মগুলো গোপন করার জন্য রাশিয়ান এমন সব বই তৈরি করেছে ও মুসলিম দেশগুলোতে বিনামূল্যে বিতরণ করেছে, যে বইগুলোতে উল্লেখ করা ছিল- রাশিয়ায় ধর্ম, ইসলামিক বিজ্ঞান ও ইসলামের রীতিনীতি পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। রাশিয়ার মুসলমানরা এই বইগুলি সম্পর্কে অবগত ছিল না, কারণ সে বইগুলো কেবল রাশিয়ার বাইরে বিতরণ করা হয়েছিল। রাশিয়ায় তা বিতরণ করা নিষিদ্ধ করা হয়, অন্যথায় এটা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। ১৯৮৬ সালে আলজেরিয়ার জনগণের মধ্যে বিতরণ করা এই বইগুলির কয়েকটি আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। উচ্চ মানের কাগজ এবং গিল্ডেড বাইন্ডিং করা এই অফসেট-প্রক্রিয়াভুক্ত আরবি বইগুলির উপর "১৪০০ হিজরী, তাসকন্দ" লেখা আছে। এই বইগুলোতে কিছু সংখ্যক কমিউনিষ্ট মুসলমানদের পাগড়ি এবং পোশাক পরিধানরত অবস্থার ছবি চিত্রিত হয়েছে যেন তারা মুফতি, ইমাম বা ধর্মীয় কার্যালয়ের প্রধান! এই কমিউনিস্ট প্রচারণা আফগানিস্তানে রাশিয়ান কর্তৃক মুসলমানদের নির্যাতনের বিপরীত। এই প্রচারণা পদ্ধতি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম এবং কমিউনিজমের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানে না, সে এই কৌশল ও মিথ্যাগুলো দ্বারা সহজেই প্রতারিত হবে এবং ইসলামের এই চরম শত্রুদের বন্ধু ভেবে কঠিন দুর্যোগে পতিত হবে।

এটিকে সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র যাই বলা হোক না বা এমনকি দেশের ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন অথবা এর প্রচারণা যতই মধুর ও ধূর্ত হোক না কেন, কমিউনিজম এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা নিজেকে সবসময় সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিপরীতে প্রমাণ করে। এটি একটি বিধর্মী, নির্দয় ও নিষ্ঠুর সংখ্যালঘুদের একনায়কতন্ত্র। এ কারণেই এই কমিউনিস্ট ইসলামের চরম শত্রু। আসলে, রাশিয়ার নাম হল ‘The Union of Soviet Socialist Republics’, যা 'কমিউনিজম' শব্দটি ধারণ করে না। কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানির নাম ছিল ‘The German Democratic Republic’ এবং যুগোস্লাভিয়ার নাম ছিল ‘The Federal Republic’। একইভাবে, রেড চীন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য সকল কমিউনিস্ট দেশ তাদের নামে কিছুটা প্রজাতন্ত্র ধারণ করে। কমিউনিজম বিশ্ব মানবতার জন্য একটি বিপজ্জনক অর্থকে জাগিয়ে তোলে এবং যারা এর ফাঁদে পড়েছে তারা একে প্রচুর ঘৃণা করে, এমনকি কমিউনিস্টরাও এই নামটি ব্যবহার করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং স্বাধীন দেশের শিরোনামগুলি সংযুক্ত করে তাদের নিজস্ব দেশের নামকরন করা প্রয়োজনীয় মনে করে।

কমিউনিজম যতই ছদ্মবেশ নিক না কেন, সেই ছদ্মবেশ সামান্য প্রকাশ হলেই নিষ্ঠুর শাসন নিজেই তা প্রকাশ করে। প্রথম দর্শনেই কমিউনিজমের প্রতিনিধিত্বকারিদের চিহ্নটি কী? এর বিভিন্ন শিরোনাম যেমন ডেমোক্রেটিক, রিপাবলিক, পিপলস বা কিংডম, থাকলেও কিভাবে প্রথম দর্শনে কমিউনিজমকে চেনা যায়? এটা নির্দেশ করা যাক। কমিউনিজমের একক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মের প্রতি শত্রুতার নীতি। এমন একটি দেশ যেখানে সবকিছুই রাজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে মুসলমানদেরকে পশ্চাদপদ এবং কট্টরপন্থী বলা হয় এবং যেখানে নন-কমিউনিস্টরা "ফ্যাসিবাদী" হিসেবে গণ্য হয়, যেই নামই হোক না কেন এটি একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। যে দেশ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের নীতি থেকে যত দূরে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যত শ্রদ্ধাশীল হয়, সে দেশ কমিউনিজম থেকে তত দূরে থাকবে। ধর্মের প্রতি শত্রুতা পোষণের পাশাপাশি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ হল কমিউনিস্টের আসল পরিচয়।

যারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের কট্টর নীতি সমর্থন করে এবং যারা বিদ্যালয় থেকে ধর্মীয় শিক্ষাগুলো বাদ দেয়ার চেষ্টা করে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা। কমিউনিজমের প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা হল,

"যৌথীকরণ ও ধর্মের প্রতি শত্রুতার মাধ্যমে সবকিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।“ একবার সবকিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে হয়ে গেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গডলেস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

মুক্ত দেশগুলোতে কমিউনিজম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে World Communism Organization কমিউনিজমের কেনা কমোরেডদের ১৮টি নির্দেশনা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ১০টি নিম্নরূপ:

১। তোমাদের দেশে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক দলগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করো। যদি তারা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তাদেরকে সহযোগিতা করো।
২। তোমার জাতিকে যতটা সম্ভব ততটা শ্রেনী এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত করো।
৩। সর্বদা কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ স্থাপন করার চেষ্টা করো।
৪। কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করো এবং চেষ্টা করো। সবাইকে বিশ্বাস করাও যে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তোমার দেশের জন্য কোনো হুমকি থাকবে না। যারা তোমার চিন্তা চেতনা এবং উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে এবং যারা বিভ্রান্তি উস্কানিমূলক ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে তাদেরকে দোষারোপ করো।
৫। মাযহাব ও তরীকার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো। সরাসরি অথবা গোপনে ধর্মের প্রতি শত্রুতার মনোভাব তৈরি করো।
৬। আদর্শ লোক যাদেরকে জনগণ অনেক ভালোবাসে তাদের জন্য ব্যানার তৈরি করো। তারাও তোমার দলের এটা দেখাও।
৭। উপন্যাস, কবিতা, নিবন্ধ এবং কার্টুনের মাধ্যমে শ্রমিক এবং গ্রামবাসীদের দারিদ্র্যতাকে অতিরঞ্জন করে তোলো।
৮। মুক্ত দেশগুলোর প্রতি বিরোধী মনোভাব বজায় রাখো এবং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রচার করো।
৯। শ্রম ইউনিয়ন, যুব সংগঠন, এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখো।
১০। জনগণের মধ্যে বিরাজমান অস্বস্তি গুলোর কারণ অনুসন্ধান করে সেসব বের করো এবং তা জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করো।

কমিউনিজমের বিপর্যয়গুলো ধরার জন্য সামান্যতম সুযোগ অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে এবং কমিউনিজমের এই বীজগুলিকে নিরস্ত্র করতে হবে।

কমিউনিস্ট প্রগতির বিরুদ্ধে সহযোগিতা করা, সংগঠিত হওয়া এবং সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কমিউনিস্টদের শুভেচ্ছা জানানো, তাদের প্রতি খুশি হওয়া, তাদের বই, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন ক্রয় করা, দোকানে প্রদর্শন করা বা বিক্রি করা, অথবা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন সমর্থন করা ইত্যাদি কমিউনিজমের ছুরিকে আরো ধারালো করবে।

সরকার প্রধানরা রাশিয়ান কমিউনিস্টদের তাদের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করতো, তাদের বিভিন্ন কাজের প্রশংসা করতো, তাদের ডিনারের আমন্ত্রন করতো এবং তাদের বিভিন্ন নতুন ধারনার কথা শুনতো। কিন্তু যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তখন তাদের এই বন্ধুরাই তাদেরকে, তাদের সন্তানদেরকে, এমনকি ছোট নাবালক বাচ্চাদেরকেও হত্যা করেছিল।

কমিউনিজমে বোধগম্যতা, বিশ্বস্ততা, মানুষের মূল্য, দয়া, বিশ্বাস বা যুক্তির স্থান নেই।

১৯৮০ সালে রাশিয়ান দ্বারা পরিচালিত আফগান গ্রামে বিমান হামলা কমিউনিস্ট অত্যাচার ও বর্বরতার একটি নতুন ও ভয়ানক প্রমাণ।

কমিউনিস্টরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে যারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি, বিবেক ও নৈতিকতায় বিশ্বাস রাখে। সে এই মানব অনুভূতিগুলিকে তার শাসন ও নীতির বিরুদ্ধে অসুস্থতা, নির্বুদ্ধিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচনা করে। তার পাসওয়ার্ড হলো “বিভক্ত করো এবং শাসন করো।“

কমিউনিজমের ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একটি সূত্র রয়েছে:

একই পদ্ধতিতে বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করা, অর্থাৎ জোরপূর্বক তাদের মুখে থুথু দেওয়ার এটির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার, সৎ লোকদের থেকে এটিকে দূরে রাখা এবং এটিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়া।

রাশিয়ান বিপ্লবের সময় ৫কোটি ২০লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো, যার মধ্যে ৪কোটি ছিল কৃষি ও কারখানা শ্রমিক। প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো যে, "কৃষকদের জমি দেয়া হবে এবং শ্রমিকদের ব্যবসায়ের অংশীদার করা হবে।" কিন্তু তা না দিয়ে উল্টো দরিদ্র কৃষকদের সামান্য জমি ও শ্রমিকদের মালিকানাধীন কুটিরগুলো দখল করে নেয় এবং যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো এবং আল্লাহর কথা বলতো তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল।

লাল বিপ্লব হল একটি লোভী দানব যা শ্রমিকদের শক্তির ছদ্মবেশে শ্রমিকদেরই ক্ষতি করে। এটি এমন গণহত্যা ও লুণ্ঠন সৃষ্টি করে যে, যারা এই গণহত্যা ও লুটপাট কাজে তাকে সঙ্গ দিয়েছিলো, তারাও এই গণহত্যা ও লুটপাট থেকে রক্ষা পায় নি।

কমিউনিজমের কারণে জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিদ্বেষ মানবতাবিরোধী এক দুঃখজনক রূপে পরিণত হয়েছিল এবং কিছু নিষ্ঠুর নেতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করেছিল। তখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে এটি কতটা মিথ্যা ছিল, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানের চতুর্থ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:
"সাম্রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দা, ভূমি, বাড়ি, ফ্যাক্টরির মালিকদের, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের, সকল ধর্মীয় মানুষ এবং তাদের আলেম ও গবেষকদের, সকল কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ বাহিনী এবং সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী, এক কথায় যারা বিপ্লবের বাইরের, কমিউনিস্ট পার্টির তাদের সবার চরম শত্রু।"

বিপ্লবের জন্য লেনিনের মূলমন্ত্র ছিল: "সক্রিয় কর্মীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মেরে ফেলুন যাতে আমাদের করার মতো সামান্য কাজ বাকি থাকে।"

পরিশেষে বলা যায়, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো তারা ব্যতীত সকল নেতারা নিজেদের শতভাগ নিরাপদে রেখেছিলেন।

লেনিনের মতে, "লাল আধিপত্য রক্ষণাবেক্ষণ লাল বিপ্লবের ধারাবাহিকতার উপর নির্ভরশীল।" এটিই ছিলো শাসক কর্তৃক শ্রমিকদের বিরতিহীন গণহত্যার কারণ। রেড চায়নায় কমিউনিস্ট একনায়ক মাও এর আদেশে প্রতিটি পাওনা পরিশোধ আন্দোলনের সময় ৩০০,০০০ শ্রমিককে হত্যা করা হয়। এই খুন ধর্ম ও পরকালের বিশ্বাসের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন সংখ্যালঘুদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।

রাশিয়া আজ কোন স্তরে পৌঁছেছে? তাদের জনগণ কতটা সুখী? এই বিষয়গুলো স্পষ্ট না করেই নিচু মানুষিকতা হবে এই কথা বলা যে, "তারা স্পেসে ভ্রমণ করছে", অথবা নিষ্ঠুর সংখ্যালঘুদের বিলাসবহুল, চমৎকার এবং আনন্দদায়ক জীবনযাত্রার প্রশংসা করা। এক সময় মিসরের পিরামিডও শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ছিল। আমরা কি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও লাশের উপর এবং ক্ষুধার্ত, দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমিকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অর্থ দিয়ে নির্মিত শিল্প-কারখানা ও রকেটগুলোতে সামাজিক কল্যাণের নিদর্শনগুলো চিহ্নিত করতে পারি? অর্থ সংস্থানকে জীবন লক্ষ্য হিসেবে প্রদর্শন করা জীবনের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা।

আমরা খুব অবাক হই যে কিছু লেখক বা অন্যরা এখন যা লেখে বা বলে তার এক শতাংশও উচ্চারণ করতে পারলে তারা কি কমিউনিস্ট দেশে ছিলো?

হে যুবক! তোমার বিশুদ্ধ হৃদয় এবং সতেজ আত্মা এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যার প্রতি সমর্থনকারি। কিন্তু তুমি পরে এর জন্য অনুতাপ করবে।

কমিউনিজমের অত্যাচার থেকে মানবতা রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হল তাদের মধুর বিষ ও চকচকে কলুষতায় পতিত না হওয়া। আর এর জন্য প্রয়োজন জনগণের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবিড় বিশ্বাস, শান্তিপূর্ণ হৃদয় এবং ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতায় বসবাস। কিন্তু এটি শুধুমাত্র একটি ঐশ্বরিক, অনমনীয় এবং অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ অনুসরণ এবং নৈতিকতা এবং উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ করার দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এই বিশুদ্ধতা শুধুমাত্র ইসলাম দ্বারাই সরবরাহ করা যেতে পারে যা সব ধরনের কুসংস্কার ও অত্যাচার থেকে মুক্ত। ইসলাম পরিপূর্ণ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং কমিউনিজমের ভয়ংকর লোকদের থাবা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী ঢাল সরবরাহ করে। ইসলাম পরিচর্যা করার দ্বারা কমিউনিজমের ধ্বংস সম্ভব। ইসলাম ও কমিউনিজম একসাথে থাকতে পারে না। এটি একটি সুবিদিত বিষয় যে কিছু স্বৈরাচারী, যারা মুসলিম দেশগুলোর উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করেছে, তারা তাদের দেশগুলোর "The Socialist Islamic Republic" এ ধরনের নাম দিয়েছে। তাদের "সোস্যালিজম" শব্দটির ব্যবহার মুসলমানদের জন্য নয়; বরং কমিউনিস্টদের জন্য। ইসলাম ও সমাজতন্ত্র শব্দদুটি একত্রে ব্যবহার করাটা মুসলমানদের প্রতারিত করার একটি ফাঁদ, কেননা ইসলাম ও সমাজতন্ত্র একসাথে হতে পারে না। একজন মুসলিম কখনো সোস্যালিস্ট হতে পারে না। এই কারণেই কমিউনিস্ট বর্বররা মুসলিম দেশগুলোর জনগণকে কমিউনিস্টদের ধরে ফেলতে প্রথমে ইসলামকে আক্রমণ করে প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। ধর্মের প্রতি কমিউনিস্টদেরও শত্রুতা পেছনেও একই কারণ রয়েছে।

প্রতিটি জাতির মধ্যে অজ্ঞ, অযৌক্তিক, অধার্মিক, অনৈতিক কিছু লোক রয়েছে যারা প্রলোভিত, প্রতারিত হয়ে কমিউনিস্ট হয়ে যেতে পারে। লাল এবং হলুদ কেন্দ্রগুলি দ্বারা প্রস্তুত কৌশলগুলি দ্বারা তারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের চক্রান্ত করতে পারে। এই ধরনের ভয়ানক ও রক্তাক্ত বিপ্লবের ছড়িয়ে পড়া থেকে জাতির সুরক্ষার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইসলামী নীতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রত্যেক বাবার অবশ্যই তার সন্তানকে আল কুরআন কিভাবে পড়তে হবে তা শিখাতে হবে, তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে, কিভাবে ওযু, গোসল করতে হয়, সালাত আদায় করতে হয়, রোজা রাখতে হয়, কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম তা শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদেরকে এর অনুশীলন করাতে হবে। এভাবে বেড়ে উঠা কোনো মুসলিমকে কমিউনিস্টরা বিভ্রান্ত করতে পারে না। এর মধ্যে স্পষ্ট উদাহরণ হলো রাশিয়ান ও চীনা নিপীড়ন ও বর্বরতার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ক্রন্দন করছে। তারা সব ধরণের অত্যাচার, নির্যাতন ও এমনকি মৃত্যু সহ্য করে, কিন্তু কমিউনিস্ট হয় না। তারা হয় মৃত্যুবরণ করে অথবা পালিয়ে যায়।

তারা কখনোই মুসলমানদের প্রতারণা করতে বা ইসলামী দেশে বিপ্লব আনতে সক্ষম হবে না দেখে নিষ্ঠুর কমিউনিস্টরা ইসলামী দেশগুলোতে আক্রমণের জন্য ভারী শিল্প ও যুদ্ধের মাধ্যমগুলি উন্নত করার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে সমস্ত মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য তারা অস্ত্র, রকেট, ফিউশন বোমা, নতুন জেট যোদ্ধাদের এবং রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতএব, বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে, সাম্প্রদায়িক পার্থক্য দূর করতে হবে এবং আহলে সুন্নাহের অধীনে একত্রিত হতে হবে, যা পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। কমিউনিস্টদের দমন করতে নতুন অস্ত্র তৈরির জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

যখন বিশ্বাসের ঐক্য, নৈতিকতার ঐক্য এবং ন্যায়বিচারে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবাই এক হয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করবে, তখন কমিউনিস্টদের অভিযান আর হুমকির মতো হবে না।

১৯৮২ সালে ইউরোপের বিখ্যাত লেখক রজার গ্যারুডি কর্তৃক খোলা গেটের মাধ্যমে, মহাসাগরের অধিনায়ক কস্টিও, তার জাহাজের গতিপথ ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল; বেজার্ট, যিনি ব্যালেট বিশ্বের সুপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ে পা রাখেন। মহান পণ্ডিত ও লেখক রজার গ্যারুডি ৮ এপ্রিল, ১৯৮৩ সালে বেনগাজিতে Garyunes University এর কনফারেন্স হলে বলেছেন,

“এটা সত্য যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমরা চেয়েছ কেন আমি ইসলামকে বেছে নিয়েছি। ইসলামকে পছন্দ করে আমি একটি আধুনিক যুগ বেছে নিয়েছি।“

৭০ বছর বয়সের রজার গ্যারুডিই, কয়েক দশক ধরে ফ্রান্সে সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে রক্ষা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে তিনি বারবার ফরাসী ও পশ্চিমাদের কাছে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এই ভেবে যে এই অনন্য ব্যবস্থায় মানুষের পরিত্রাণ নিহিত আছে। তিনি আধুনিক ফরাসি কমিউনিস্টের 'আধ্যাত্মিক স্থপতি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেখানেই কমিউনিস্টদের দ্বারা

আয়োজিত কোনো সভা, সম্মেলন বা সেমিনার ছিল, সেখানেই গ্যারুডি উপস্থিত ছিল। তিনি তার ধারনা, কলম ও বক্তৃতার মাধ্যমে ক্যাথলিক ও খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে গুরুতর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

একদিন পশ্চিমাদের শিল্প, লেখনী ও রাজনৈতিক জগতে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়: “রজার গ্যারুডি ইসলাম গ্রহণ করেছে!” সংবাদ সংস্থাগুলোর টেলেক্সের মাধ্যমে এই সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, ক্রেমলিন এই সংবাদ শুনে ভয়ংকরভাবে হতবাক হয়েছিল, কারণ ক্রেমলিন ফরাসি কমিউনিস্টদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুকে হারিয়েছিল; গ্যারুডি ছিল একজন সুপরিচিত স্কলার, যার লেখনীর মাধ্যমে শেষ বছরগুলিতে মার্কসবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

এই মহান মানুষটি এখন সত্য বলছে: “ইসলাম এমন ধর্ম, যুগেরা যার অনুসরণ করে। অন্যান্য ধর্মগুলো যুগের পেছনেই ছুটে। অর্থাৎ, ইসলাম ব্যতিরেকে সমস্ত ধর্ম যুগে যুগে পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত হয়েছে এবং তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলি সময়ের শর্ত অনুযায়ী বিকৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন আল-কারিম অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই যুগ যুগ ধরে প্রাধান্য বিস্তার করছে। আল কুরআন নয়, বরং সময়ই এর অনুসরণ করে। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে কোরআন এখনও আগের মতোই নতুন আছে। যুগে যুগে ঘটে যাওয়া ঘটনা এটি। এই ঘটনা ভয়াবহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় যা ইতিহাসে অনেক যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। ইসলাম কেবল বস্তুবাদী বা ইতিবাচকবাদের উপরই জয়ী নয়, বরং অস্তিত্ববাদের উপরও জয়ী। যাইহোক, এগুলোর কোনটিই ইসলামের উপর জয়ী নয়।

ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু ব্যাখ্যা করেছেন।
‘পরকালের জন্য এমনভাবে কাজ করো যেন তুমি আগামীকালই মারা যাবে এবং এই পৃথিবীর জন্য এমনভাবে কাজ করো যাতে তুমি মরেও অমর হয়ে থাকো’। ইসলাম শুধু জাগতিক বিষয়ের নিয়ন্ত্রন করে না বরং আধ্যাত্মিকতারও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, এই দুটির একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যাবে না। কিভাবে এ দুটি আলাদা হবে যেখানে ইসলামই বলেছে: 'জ্ঞান অর্জন করো সুদূর চীন দেশে থাকলেও’, এবং 'বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশ্বাসীদের হারানো সম্পদ; যেখানেই সে এটি খুঁজে পায়, সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করা উচিত!’ জ্ঞান ও কাজ ইসলামে সীমাবদ্ধ নয়। এই দুটো বিষয় সম্পর্কে কোন সীমা নেই, যা বিশ্বকে বিস্মিত করে, ইসলাম বিশ্বকে বিস্মিতই করেছে।

“মানুষকে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত প্রাণী বলে সংজ্ঞায়িত করে ইসলাম এটি বুঝিয়েছে যে, মানুষের শোষণের শিকার হওয়া উচিত নয়। এটি এমন সব নিয়মনীতির সমাহার যা অপচয়, আড়ম্বরতা, বিলাসিতার অনুমোদন দেয় না; সেসব উপার্জনকে আয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যা ঘাম ঝরার মাধ্যমে অর্জিত হয়; সুষম ও নৈতিক শাসনের মাধ্যমে বর্ধিত সম্পদ গরিবদের মাঝে বন্টন করে; সুদ নিষিদ্ধ করে যা অলসতার কারণ এবং এভাবেই বেআইনী সম্পদ ধ্বংস করে। ইসলাম এটিকে বাধ্যতামূলক করেছে যে খলিফা ও ক্রীতদাস একই অধিকার ভাগাভাগি করবে। উটের ঘটনাটি ছিল একজন রাজার তলোয়ারের চেয়েও তীব্রতর বাস্তবতা: এক শহরে থেকে অন্য শহরে ভ্রমণের সময় হযরত উমর ও তাঁর ক্রীতদাস পালাক্রমে উঠের পিঠে আরোহণ করছিল এবং খলিফা ও ক্রীতদাস পালাক্রমে উটের দড়ি ধরে হেটে চলছিল। ন্যায় ও আইনের ক্ষেত্রে এখানেই ইসলামের বিপ্লব।

মার্কসবাদ এবং পুঁজিবাদ উভয়ই এমন ব্যবস্থা যা মানুষকে শোষণ করে। এগুলোর বিপরীতে ইসলাম একটি স্বর্গীয় ধর্ম যা মানবতার প্রতি মানুষের প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করে।

৭- একজন খাঁটি মুসলিম মূলত কি পছন্দ করে?

প্রথম বিষয়টি হলো, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ তাদের বইয়ে যা লিখেছেন সে অনুযায়ী ঈমান শুদ্ধ করা। এটি একমাত্র মাযহাব যা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল মহান লোকদেরকে তাদের প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করুন! চার মাযহাবের আলেমগণ, যারা মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছেছেন এবং তারা যাদের শিক্ষা দিয়েছেন সেই আলেমদেরকে আহলে সুন্নাতের আলেম বলা হয়। ঈমান শুদ্ধ করার পর, ফিকাহের জ্ঞান, অর্থাৎ শরীয়াতের নিয়মানুযায়ী ইবাদতসমূহ পালন করা অর্থাৎ শরীয়তের আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। একজন ব্যক্তির প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কোনপ্রকার অনিচ্ছা বা অলসতা ছাড়া পালন করা উচিত, এবং নামাজের শর্ত-রুকন ও তা'দীলে আরকান সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। যাঁর নিসাব পরিমান সম্পদ আছে তার যাকাত আদায় করতে হবে। ইমাম-ই আযম আবু হানিফা বলেন, "এছাড়াও, মহিলাদের অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত সোনা ও রুপার যাকাতও দিতে হবে।"

কোন তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কারো তার মূল্যবান জীবন নষ্ট করা উচিত নয় যদিও তা অনুমিত (মুবাহ) হয়। হারাম কাজে কোনোভাবেই সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমাদের গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র, গান করা নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। আমাদের নফসকে আনন্দ দান করে এমন কাজের দ্বারা আমাদের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। এগুলো হলো মধু মিশ্রিত ও চিনিতে ঢাকা বিষ।

কোনো মুসলমানের গীবত করা উচিত নয়। গীবত করা হারাম। (গীবত অর্থ হলো কোন মুসলমান বা জিম্মির অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা। তবে হারবীদের দোষ, প্রকাশ্যে পাপ কাজ করা লোকদের পাপ, যারা মুসলমানদের নির্যাতন করে এবং যারা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে তাদের দোষ সম্পর্কে মুসলমানদের জানানো দরকার। এভাবে মুসলমানগণ তাদের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। যারা ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে ও লেখে, তাদের সেই মিথ্যাচার প্রকাশ করে দেয়া গীবত নয়। (রদ্দুল মুহতার: ৫-২৬৩))

কারো জন্য উচিৎ হবে না যে এক মুসলমানের কথা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া। এটি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এই দুই ধরনের পাপ করবে তাদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এছাড়াও মিথ্যা বলা ও কাউকে অপবাদ দেয়া হারাম; এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এই দুই পাপ কাজ প্রত্যেক ধর্মেই হারাম। এই পাপের শাস্তি খুবই কঠিন। মুসলমানদের ত্রুটিগুলো গোপন করা, তাদের গোপন পাপ ছড়িয়ে না দেয়া এবং তাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেয়া খুবই সওয়াবের কাজ। একজনের অধীনে যারা থাকে (যেমন স্ত্রী, শিশু, ছাত্র, সৈনিক) তাদের প্রতি ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি দয়া দেখানো উচিত। কাউকে তার ভুলের জন্য অপমান করা উচিত নয়। কোন নগণ্য কারণে কাউকে বার বার আঘাত করা বা মনে কষ্ট দেয়া বা শপথ করানো উচিত নয়। কারো সম্পত্তি, জীবন, সম্মান বা পবিত্রতায় আক্রমণ করা উচিত নয়। কারো কাছে বা সরকারের কাছে ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা উচিত। ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান উভয়টিই হারাম। যাইহোক, যদি অন্য কোন উপায় না থাকে তখন তা দেয়া ঘুষ হবে না। যেমন, নির্যাতন-অত্যাচারের অধীনে থাকলে। যাইহোক, এমন পরিস্থিতিতেও ঘুষ নেয়া হারাম। প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ত্রুটি দেখা এবং প্রতি ঘন্টায় আল্লাহর সামনে করা কৃতকর্মের ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। তাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেন না এবং তিনি তাদের জীবিকা নির্বাহ বন্ধ করে দেন না। শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পিতামাতার আদেশ বা সরকারের আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে এবং শরীয়তের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশগুলো প্রতিরোধ করতে হবে যা ফিতনা সৃষ্টি করে। (মাকতুবাতে মাসুমিয়্যা বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডের ১২৩ তম চিঠিটি দেখুন)।

ঈমান শুদ্ধিকরণ ও ফিকাহের আদেশ পালন করার পর, একজন ব্যক্তিকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সময় ব্যয় করা উচিত। আলেমগণ যেভাবে শিখিয়েছেন সেভাবে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ করা উচিত। ঐ সকল জিনিসের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা উচিৎ যা হৃদয়কে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে। যত বেশি তুমি শরিয়ত মেনে চলবে, তাঁর স্মরণে তত বেশি স্বাদ পাবে। শরীয়ত মেনে চলতে অলসতা করলে, সেই স্বাদ ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে, অবশেষে এই স্বাদ আর থাকবেই না। আমি ইতিমধ্যেই যা লিখেছি তার চেয়ে বেশি আর কি লিখতে পারি? একজন যৌক্তিক ব্যক্তির জন্য এসব যথেষ্ট হবে। ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে ও মিথ্যাচারে বিশ্বাস করে তাদের ফাঁদে পা দেয়া উচিত নয়।

৮- এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের প্রত্যুত্তর

নিম্নলিখিত চিঠিটি আব্দুল হাকিম আরওয়াসী (কুদ্দিসা সিররুহ)'র দেয়া এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের প্রত্যুত্তরের সরল অনুবাদ, যা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনশীল বছরগুলোতে তিনি মাদ্রাসাত আল-মুতাহাসসিসীন এ ধর্মতত্ব বিভাগে তাসাউফের সিনিয়র অধ্যাপক থাকাবস্থায় দিয়েছিলেন। মাদ্রাসাটি অবস্থিত ছিল ইস্তাম্বুলের সুলতান সেলিম মসজিদের ভিতরে।

যদি তোমরা পারো, তাহলে তোমাদের সব শক্তি-ক্ষমতা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাও! তবুও, তোমরা তা করতে পারবে না। এই মহাবিশ্বের বাইরের জগত অস্তিত্বহীন। কিন্তু এই অস্তিত্বহীন জগতটিও মহান আল্লাহর অধীনে।

কোন এক অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি মহান ওলী ইব্রাহীম বিন আদ'হাম(কুদ্দিসা সিররুহ) এর কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন:

যদি তুমি ছয়টি জিনিস গ্রহণ করো, তাহলে তুমি যাই করো তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। এই ছয়টি জিনিস হল:

১। যখন তুমি কোন পাপ করার ইচ্ছা করো, তখন তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) দেয়া কোন খাবার খাবে না! তাঁর দেয়া খাবার খেয়ে তাঁর অবাধ্যতা করা কি তোমার জন্য যৌক্তিক হবে?

২। যখন তুমি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করো, তখন তাঁর রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাও। তাঁর রাজ্যে বসবাস করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কি তোমার জন্য উপযুক্ত হবে?

৩। যখন তুমি তাঁর অবাধ্য হতে চাও, তখন এমন জায়গায় পাপ করো না যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পান; বরং এমন স্থানে পাপ করো যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পান না! এটা স্বভাবতই অনুচিত যে, তাঁর পৃথিবীতে বসবাস করে, তাঁর খাদ্য গ্রহণ করে এমন জায়গায় পাপ কর্ম করা যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পান!

৪। যখন মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার রুহ কবজ করতে আসবে, তখন তাকে তুমি একটু তাওবা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলো! তুমি সে ফেরেশতাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না! তিনি আসার আগেই তওবা করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ আছে, তাই তিনি আসার আগেই তাওবা করো। কারণ মৃত্যুর ফেরেশতা অপ্রত্যাশিতভাবে আসে।

৫। যখন দুজন ফেরেশতা মুনকার ও নাকির কবরে তোমাকে প্রশ্ন করতে আসবে, তখন তাদের ফিরিয়ে দিও! তখন তাদেরকে তোমার পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ দিয়ো না!

"এটা অসম্ভব", তার কাছে উপদেশ চাইতে আসা ব্যক্তিটি বলল। তখন শেখ ইব্রাহিম বললেন, "তাহলে এখন তোমার উত্তর প্রস্তুত করো!"

৬। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন: "পাপীরা সবাই জাহান্নামে যাও!", তখন বলো যে কি তুমি যাবেনা!
লোকটি বলল, "কেউ আমার কথা শুনবে না" এবং তারপর সে লোকটি তওবা করল। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তার অনুশোচনাবোধ অস্বীকার করেননি। আওলিয়াদের কথায় আধ্যাত্মিক প্রভাব রয়েছে।

ইব্রাহীম ইবনে আদ'হাম(কুদ্দিসা সিররুহ)কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন: 'হে আমার সৃষ্ট মানবজাতি! আমার কাছে চাও, আমি তা গ্রহণ করবো, আমি তোমাদের চাওয়া পূরণ করবো!' অথচ আমরা চাওয়ার পরও তিনি দেন না? হযরত ইব্রাহীম বললেন:

"তুমি আল্লাহর কাছে চাও কিন্তু তুমি তাঁর আনুগত্য করো না। তুমি তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানো, কিন্তু তুমি তাঁকে অনুসরণ করো না। তুমি কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত

করো, কিন্তু তুমি এটির আদেশ নিষেধ পালন করো না। তুমি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ ভোগ করো, কিন্তু তাঁর শুকরিয়া আদায় করোনা। তুমি জানো যারা ইবাদাত বন্দেগী করে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, কিন্তু তুমি এর জন্য প্রস্তুতি নাও না। তুমি জানো যে তিনি অবাধ্যদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তুমি এতে ভীত নও। তুমি তোমার পিতা এবং পিতামহের সাথে কি ঘটেছে দেখেছো, কিন্তু তারপরও সতর্কতা অবলম্বন করো না। তুমি তোমার নিজের দোষত্রুটি দেখতে পাও না, কিন্তু অন্যদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করো। এ ধরনের লোকদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ তাদের উপরে পাথর বর্ষণ হয় না, তাদেরকে মাটিতে দাবিয়ে দেয়া হয় না এবং আকাশ থেকে তাদের উপর আগুন বর্ষণ হয় না! তারা এর থেকে বেশি আর কি চায়? তাদের প্রার্থনার প্রতিদান হিসেবে এসব যথেষ্ট হবে না?"

(আল্লাহ তায়ালা সূরা মূমিন এর ৬০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "আমার কাছে দোয়া করো, আমি কবুল করবো (আমার কাছে চাও, আমি দিবো)"। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যে ব্যক্তি দোয়া করবে, তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে; আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস থাকতে হবে; হারাম কাজ করতে পারবে না, বিশেষ করে হারাম জিনিস খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকা; ফরয কাজগুলো আদায় করতে হবে; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে; রমজান মাসে রোযা রাখতে হবে; যাকাত প্রদান করতে হবে; আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে জিনিসটি চাওয়া হচ্ছে তার কারন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সবকিছু সৃষ্টি করেন। একটি নির্দিষ্ট জিনিস চাওয়া হলে, তিনি ঐ জিনিসের কারণ সৃষ্টি করেন এবং সেই জিনিসটি কার্যকরি করে তোলেন। মানুষ এই কারণের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে এবং ঐ জিনিসটি অর্জন করে। তিনি তাঁর আওলিয়াদের জন্য সাধারণ উপায় থেকে পৃথক ব্যবস্থা করেন। যখন আওলিয়ায়ে কেরামগণ কোন দোয়া করেন অথবা তাদের উসিলায় দোয়া করা হয়, তখন তাদের কারামত হিসেবে কোনো কারণ ছাড়াই চাওয়া জিনিসটি দিয়ে দেয়া হয়।)

এই পৃথিবীতে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে তুমি নিজে আসো নি, তাই তুমি নিজের ইচ্ছায় সে অবস্থায় যেতে পারবে না। যে চোখ দিয়ে তুমি দেখো, যে কান দিয়ে তুমি শুনতে পাও, যে অঙ্গগুলি দ্বারা তুমি অনুভব করতে পারো, যে বুদ্ধি দিয়ে তুমি চিন্তা করো, যে হাত-পা তুমি ব্যবহার করো, যে সকল রাস্তা তুমি অতিক্রম করো, যেসব জায়গায়, এক কথায়, তোমার শরীর এবং আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিটি অংশ এবং কার্যপ্রক্রিয়া, সবকিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা এবং তিনিই সব সৃষ্টি করেছেন। তুমি তাঁর কোন কিছু অন্যায় কাজে ব্যবহার করতে পারো না! তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর সংরক্ষণকারী, অর্থাৎ, তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন ও শ্রবণ করতে পারেন এবং তিনি অস্তিত্বশীল সবকিছু সর্বদা বিদ্যমান রাখেন। এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সকলের অবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অসচেতন হন না । তিনি কাউকে তাঁর সম্পত্তি চুরি করতে দেন না। তিনি তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের শাস্তি প্রদানে অসমর্থ নয়। তিনি কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেন না, উদাহরণস্বরূপ, তিনি যেমন চাঁদ, মঙ্গল বা অন্যান্য গ্রহে মানব্জাতিকে সৃষ্টি করেননি, তেমনি যদি তিনি পৃথিবীতেও কোনো মানুষ সৃষ্টি না করতেন, তবুও এতে কোন পার্থক্য হতো না।

একটি হাদীস কুদসীতে আছে, "যদি তোমার সকল পূর্বপুরুষ ও বংশধর, যুবক ও বৃদ্ধ, জীবিত ও মৃত, মানুষ ও জিন, আমার সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ, সবচেয়ে অনুগত বান্দা (আলাইহিস সালাম) এর মতো হতো, আমার মহাত্ম্য বৃদ্ধি পেত না।" অপরদিকে, যদি তোমরা সবাই আমার শত্রু হতে, যারা আমার বিরোধিতা করে এবং আমার নবীদের অবমাননা করে, তবুও আমার মহাত্ম্য হ্রাস পেত না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তোমাদের কাউকেই তাঁর কোন প্রয়োজন নাই; বরং তোমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং তোমরা যা কিছুই কর, সবকিছুতে তাঁকে তোমাদের প্রয়োজন।"

তিনি সূর্যের মাধ্যমে আলো এবং তাপ প্রদান করেন। তিনি চাঁদ থেকে আলোর তরঙ্গ (জোছনা) প্রতিফলন করেন। কালো মাটি থেকে তিনি অনেক রঙ, মিষ্টি-সুগন্ধযুক্ত ফুল এবং সুন্দর চেহারা তৈরি করেছেন। বাতাস থেকে তিনি শ্বাস প্রশ্বাস প্রদান করেন হৃদয়ে প্রাণ সরবরাহ করেন। লক্ষ বছর দূরে থাকা তারার থেকে তিনি পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং যেই মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে শেষ পর্যন্ত সেই মাটিতেই তোমাকে দাফন করা হবে। কম্পনের মাধ্যমে, তিনি কার্যকরি কণা সৃষ্টি করেন। (একদিকে তোমরা যা অপছন্দ করো ও ঘৃণা করো সেই ময়লা তিনি তাঁর সর্বাধিক ক্ষুদ্র প্রাণী (জীবাণু) এর মাধ্যমে মাটিতে পরিণত করেন; যার উপর তোমরা বিচরণ করো সেই মাটিকে গাছের কারখানা থেকে প্রোটিনের মতো তোমাদের দেহের গঠনমূলক পদার্থে পরিণত করেন, যা ডিমের সাদা অংশের অনুরূপ। অপরদিকে, পৃথিবীর জলকে ঘূর্ণায়মান গ্যাসের সাথে মিশিয়ে, উদ্ভিদ তৈরির জন্য আকাশ থেকে পাঠানো শক্তির মধ্যে ভর করে, তিনি অনমনীয় এবং মিষ্টি পদার্থ ও তেলগুলি তৈরি করেন শক্তির উৎস হিসেবে যা তোমাদের শরীর এর

অভ্যন্তরীণ বিন্যাস নিয়ন্ত্রন করে)। এভাবে, গাছপালা বা উদ্ভিদে যা তিনি মাঠ, পাহাড়, মরুভূমির ও নদীতে তৈরি করেছেন; প্রাণিতে যেগুলোকে তিনি পৃথিবী ও সমুদ্রে বাঁচিয়ে রাখেন, তাতে তোমাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদের শরীরে গিয়ে তোমাদের পুষ্টি দেয়। তোমাদের ফুসফুসে রসায়ন ল্যাবরেটরি স্থাপন করে, তিনি তোমাদের রক্ত থেকে বিষকে কমিয়ে দেন এবং তদস্থলে দরকারী অক্সিজেন রাখেন। তোমাদের মস্তিষ্কে পদার্থবিদ্যা ল্যাবরেটরি স্থাপন করে, তোমাদের স্নায়ুগুলির মাধ্যমে উপলব্ধি শক্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যেমন তিনি লোহার পাথরের মধ্যে চৌম্বকীয় শক্তি রেখেছেন, তেমনি বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা যা তিনি তোমাদের ব্রেইনে স্থাপন করেছেন তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের হৃদয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা, আদেশ এবং কর্ম রেখেছেন যা একইসাথে প্রস্তুত করা হয়। তোমার হৃদয় খুব কঠিন সমীকরণের মাধ্যমে কাজ করে, যা তুমি খুব অসাধারণ মনে করো, এর মাধ্যমে তিনি তোমার রক্ত নালীর ভেতরে রক্তের নদীর প্রবাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি তোমার স্নায়ুর মধ্য জালের মত অনেক পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি তোমার পেশীতে অনেক ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তু মজুদ করে রেখেছেন। এরকম আরো অসংখ্য কিছুর দ্বারা তিনি তোমাকে সাজানো গোছানো পরিপূর্ণ একটি শরীর দিয়েছেন। তিনি এক বিন্যাস ও তোমাদের দেয়া নাম পদার্থবিদ্যার নিয়ম, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা জৈবিক ঘটনা এসবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সবকিছু স্থাপন করেছেন ও মানানসই করেছেন। তিনি তোমাদের অভ্যন্তরে একটি শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মন এবং চেতনার মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু সতর্কতা তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা নামের এক সম্পদ, যুক্তি নামের মানদণ্ড, মাধ্যম হিসেবে চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, যাকে তোমরা চাবি বলো, উপহার দিয়েছেন। তুমি যেন এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারো, এজন্য তিনি তোমাকে মিষ্টি এবং তিক্ত সতর্কতা, ইঙ্গিত, প্রবণতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন। আর সবচেয়ে বড় রহমত হিসেবে, তিনি একজন বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য নবী (আলাইহিমুস সালাম) এর মাধ্যমে নির্দেশাবলী পাঠিয়েছেন। পরিশেষে, তোমার শরীর নামক যন্ত্র টি পরিচালনা ও এর পরীক্ষার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়ে তিনি তোমার শরীরকে তোমার কাছেই হস্তান্তর করেছেন যাতে তুমি এটি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারো। তিনি এসব এজন্য করেন না যে, তোমাদের তাঁর প্রয়োজন আছে বা তোমার কোন ইচ্ছা বা সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন বলে; বরং তিনি এসব করেন তোমাদের তাঁর সকল জীবের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অবস্থান ও কর্তৃত্ব দান করে তোমাদের সুখী করার জন্য। যদি তিনি তোমাদের হাত, তোমাদের পা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে তোমার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে দেয়ার পরিবর্তে, সেগুলো তোমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, ফুসফুসের প্রসারণ-সংকোচন ও রক্ত-সঞ্চালন ইত্যাদির মতো তিনি তোমাদের অজান্তেই ব্যবহার করতেন, যদি তিনি জোর করে তোমার হাত ও পায়ের ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরিচালনা করতেন,যদি তোমাদের প্রতিটি কাজ কম্পন ও তোমাদের চলফেরা আকস্মিক হতো, তবে কি তোমরা তোমাদের নিজেকে ও তোমাদের অঙ্গপত্যঙ্গের মালিকানা দাবী করতে পারতে? যদি তিনি তোমাদের বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির প্রভাবের অধীনে পরিচালিত করেন জীবজন্তুর নির্জীব বা অযৌক্তিক এবং অবচেতন শক্তির মতো এবং যদি তিনি দলবদ্ধ প্রাণিদের মত তোমাদেরও সামান্য খাবার রিযিক দিতেন, যা তোমরা এখন অগণিত অর্জন করো, তাহলে কি তোমরা সেই সামান্য খাবার গ্রহণ করতে পারতে?

তুমি তোমার জন্মের পূর্বে ও জন্মের সময়ে তোমার অবস্থা নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছো? যে পৃথিবীতে তুমি বাস করো, পানাহার করো, চলাফেরা করো, নিজেকে নিয়ে আনন্দ করো, তোমার রোগ প্রতিকারের উপায়গুলো এবং বন্য ও বিষাক্ত প্রাণীর আক্রমণ থেকে ও শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়গুলি আবিষ্কার করো, সেই পৃথিবী সৃষ্টির সময় তুমি কোথায় ছিলে, কি অবস্থায় ছিলে? এই পৃথিবীর সৃষ্টির সময় যখন পাথর ও মাটি আগুনের তাপে কঠিন হচ্ছিল এবং যখন সর্বশক্তিমানের রসায়ন গবেষনাগারে পানি ও বাতাস নিঃসরণ হচ্ছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছো? আজকে যে ভূমি নিজের বলে দাবি করছো, তা যখন সমুদ্রে ভাসমান ছিলো, যখন পাহাড়-পর্বত, নদী,মালভূমি ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছিলো, তখন তুমি কোথায় ছিলে? যখন আল্লাহ তা'আলার শক্তির মাধ্যমে সমুদ্রের লবণাক্ত জলগুলি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে মেঘ তৈরী হচ্ছিলো এবং যখন সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছিলো, এবং পোড়া ও শুকনো মাটি তা থেকে খাদ্য (আকাশে বিদ্যুৎ ও শক্তি তরঙ্গের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যের জন্য) এবং যখন এই (আলো ও তাপের রশ্মির প্রভাব দ্বারা আলোড়িত) পদার্থগুলি কোষগুলিকে স্পন্দিত ও পুষ্ট করে তুলছিল সেসময় তুমি কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে?

আজ তারা বলে যে তোমরা বানরের বংশধর, আর তোমরা এটি বিশ্বাসও করো। যখন তারা বলে যে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে জীবিত রাখছেন, তোমাকে মৃত্যু দান করছেন এবং একমাত্র তিনিই সবকিছু করেন, তা তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না।

হে মানুষ! তুমি কি? তুমি তোমার বাবার ধমনীতে তুমি কী ছিলে? একসময় তুমি তোমার বাবার ধমনীর মধ্যে ছিলে যাকে তুমি মূর্খ, সেকেলে, পশ্চাদ্গামী হিসেবে অপমান করো, তিনি তোমার কারণে অস্বস্তি বোধ করতেন। ঐ সময় কে তোমাকে নড়াচড়া করতে শিখিয়েছিলো, কেন তুমি তাকে ফাঁদে ফেলেছো? যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাকে একটি আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি তোমাকে একটি আমানতের মত হেফাজত করেছেন। যখন তিনি তোমাকে অত্যন্ত দয়ামায়া করে একজন পবিত্র মহিলার কাছে ন্যস্ত করেছিলেন, যেখানে তুমি পুষ্টি আহরোণ করেছো এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি তোমাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছেন, কেন তুমি তাকে ধন্যবাদ দেয়ার পরিবর্তে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এত নেয়ামত দিয়েছে তাঁকে ধন্যবাদ দেয়ার পরিবর্তে তোমার অসুবিধার জন্য তোমার পিতাকে দায়ী করে তাকে অপমান করছো? তদুপরি, কেন তুমি তোমার আমানত সকলের দ্বারা নষ্ট করা আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছো?

যখন তোমার চারপাশের লোকেরা তোমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করে, তখন তুমি বিশ্বাস করো যে, তুমি সেসব তোমার বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি, দিয়ে ও তোমার প্রতিভা বিকশিত করে তৈরি করেছো। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা তুমি ভুলে গিয়েছো; তুমি সেই মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমানতের মালিকানা দাবি করার চেষ্টা করছো। তুমি মালিক এবং শাসক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন এবং প্রতিনিধিত্ব করতে চাও।

অন্যদিকে, যখন তোমার আশেপাশের লোকেরা তোমার ইচ্ছাগুলি অনুসরণ করে না, যখন মনে হয় বাহ্যিক বাহিনী তোমাকে পরাভূত করে ফেলেছে, তখন তুমি নিজের মধ্যে অনুশোচনা, হতাশা, অসম্পূর্ণতা এবং অযোগ্যতা ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পাওনা। এরপর তুমি দাবি করো যে তুমি কোন কিছুর মালিক নও, তুমি সবকিছুর দাসত্বের অধীন, তুমি একটি যন্ত্রের মতো, যা স্বয়ংক্রিয় কিন্তু ভাঙা স্প্রিংযুক্ত। তুমি ক্বদর তথা ভাগ্যকে কোন শাশ্বত জ্ঞান নয়; বরং স্বৈরাচারী চাপ বা বল প্রয়োগ হিসেবে বুঝো। এই কথাটি বলার সময় তোমার মুখটি যে রেকর্ড-প্লেয়ারের মতো নয় এ সম্পর্কে তুমি অসচেতন নও।

যখন তোমার প্রিয় খাবার তোমার টেবিলে না থাকে, তখন তুমি নিজেকে সংযত করে তোমার সামর্থ্যের অধীন শুকনো রুটি খেতে পারো, যদিও তুমি খাওয়া- না খাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন এবং ক্ষুধায় মারা যেতে পারো, কিন্তু এই শুকনো খাবারগুলো জোর করে তোমাকে খাওয়ানো হয়না। তুমি খাবারটি খাও ঠিকই, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করো যে তুমি তোমার ইচ্ছা থেকে বঞ্চিত হচ্ছো এবং তথাপি এতোক্ষন যা করেছো তা কোন অনৈচ্ছিক আন্দোলনের কারণে কোনো ক্রমধারা নয়। যাইহোক, যদিও বাধ্যবাধকতা পালনের ক্ষেত্রে তুমি নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী, তবুও তখন তুমি নিজেকে বাধ্য বা দাস এককথায় বাহ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে নিছক কিছুই নয় মনে করো।

হে মানুষ! এই তুমি কে? যখন তুমি সফলতা বা বিজয় অর্জন করো, তখন তুমি সবকিছু হওয়ার দাবি করো। আর যখন বিপরীতটা ঘটে তখন ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণে তুমি কিছুই নয় বলে দাবি করো। তুমি কি আসলেই 'সবকিছু' না 'কিছুই নয়'?

হে মানবজাতি! হে অভাব এবং খামখেয়ালীপনায় ভাসতে থাকা মানুষ! তুমি 'সবকিছু'ও নও, আবার 'কিছুই নয়'ও নও। যেকোনো ক্ষেত্রে তুমি এই দু'টির মাঝামাঝি। তবে হ্যাঁ, তুমি উদ্ভাবক, প্রভাবশালী এবং সবকিছু উপর বিজয়ী হওয়া থেকে দূরে। কিন্তু তোমার একটি স্বাধীনতা, সুযোগ এবং একটি আকাঙ্ক্ষা বা পছন্দ আছে যা তুমি কর্তৃত্বে রুপান্তর করতে পারো। তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার (যিনি অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারি এবং কোনপ্রকার শর্ত ছাড়াই একক মালিক) হুকুমে একজন দাপ্তরিক, দায়িত্ববান এবং যৌথ কাজের অংশীদার। তাঁর দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম ও বিধিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তুমি তাঁর দেয়া যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্বগুলি আমানত হিসাবে পালন করবে। তিনিই একমাত্র হুকুমদাতা, একক শাসক এবং একক মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো হুকুমদাতা নেই, তাঁর অনুরুপ কোন শাসক বা মালিকও নেই। তুমি যে লক্ষ এবং উদ্দেশ্যগুলি দাবি করো এবং এত চিৎকার করে নিজের গৌরবগুলি নিয়ে গর্ব করো এগুলো সবই মিথ্যা এবং অর্থহীন, এসবই একমাত্র তাঁকেই মানাই। তাহলে কেন তুমি তোমার অন্তরের মিথ্যাকে সমর্থন করো এবং বহুইশ্বরবাদে বিশ্বাস করো? কেন তুমি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করো, যাকে তুমি অতুলনীয় ও একক শাসক এবং সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জানো? অথচ তুমি হাজার হাজার কাল্পনিক মূর্তির পেছনে দৌঁড়ো এবং বিপর্যয়ে পতিত হও? তুমি যার পেছনেই দৌঁড়াও না কেন, তা কি এমন আদর্শ,

পছন্দ আর বিশ্বাস নয় যা তোমাকে টেনে নিয়ে যায়? কেন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকিছুর মধ্যে আদর্শের সন্ধান করো? কেন তুমি সরাসরি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করো না এবং তোমার বিকল্পগুলো এই বিশ্বাসে ও এই বিশ্বাসের কাজগুলো ব্যয় করোনা ?

যখন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে জানো এবং তাঁর নিয়মাবলী ও আইন লঙ্ঘন না করে কাজ করো, তখন তুমি একে অপরকে কতই না ভালোবাসবে, ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবে! আল্লাহ তায়ালার দয়া এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন থেকে কি সৃষ্টি করে না? তুমি যে সকল অনুগ্রহ লাভ করো তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের কারণে গরে ওঠা ভ্রাতৃত্বের ফল, তাঁর দয়া ও উদারতা। তুমি যে সকল সমস্যা বা দুর্যোগের শিকার হও, তা হল ক্রোধ, বিরক্তি ও শত্রুতার ফল যা অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের জন্য এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোযোগী না হওয়ার জন্য হয়েছে। আর এগুলো নিজেই নিয়ম তৈরি করা এবং যারা আল্লহর সাথে প্রতিদন্দ্বিতা করতে চায় তাদের অনুসরণ করার ফল, এক কথায় তাঁর একত্ববাদে একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁকে বিশ্বাস না করার ফল।

এক কথায়, সকল প্রকার মানবিক সমস্যাগুলির প্রধান কারণ হলো আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে যেয়ে বহুইশ্বরবাদে বিশ্বাস করা। চারদিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এতো উন্নতির পরেও মানবতার বিরুদ্ধে এতো নৃশংসতা হচ্ছে, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস এবং পারস্পরিক ভালোবাসার অভাবের ফল। তবে কঠিন মানুষেরা চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা একে অপরকে ভাল না বাসলে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে না। আর যতক্ষন না তারা আল্লাহকে জানে, তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে সার্বভৌম শাসক হিসেবে গণ্য করে এবং তাঁর ইবাদাত করে, ততক্ষন মানুষ একে অপরকে ভালবাসতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর পথ ব্যতীত যা কিছু চিন্তা করা হয় তার সবই দ্বন্দ্ব ও দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করে। তুমি কি দেখো না যে মসজিদে গমনকারিরা একে অপরকে ভালোবাসে এবং যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে ভালোবাসা?

যাইহোক, তুমি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তুমি যার ইবাদত করবে, যাকে তোমার ভালোবাসা দিবে, তাদের প্রত্যেকেই তোমার বিরোধিতা করতে পারে। আর তাদের সবাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন। তিনি একক শাসক যার কোন অংশীদার, সমকক্ষ, বিপরীত বা সমতুল্য নেই এবং তিনিই একমাত্র সত্তা যার সমতুল্য অস্তিত্ব অসম্ভব।

তুমি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যারই অনুসরণ করো, উপাসনা করো, ভালোবাসো এবং পরম শাসক হিসেবে গণ্য করো, জেনে রেখো যে তারা তোমাকে সাথে নিয়েই আগুনে জ্বলবে।

Markaj-I dâ'ira-I iflâs es bî nawâî
Sar shâr-I khodgâmî wa nâ âshinâî
As-Sayyid Abdulhakîm-î arwâsî

অংশ- ৩
জীবনি
৯- সৈয়দ[১] আব্দুল হাকিম আরওয়াসী এর জীবনি
(সৈয়দ ফাহিম আরওয়াসী এর একজন শিষ্য)

তিনি শেষ খলিফাতুল-মুসলিমীন সুলতান মুহাম্মদ ওয়াহিদ আদ-দীন খানের শাসনামলের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম[২] ছিলেন। তিনি ভোয়ানের নিকটবর্তি বাশকাল শহরে ১২৮১ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ সালে আঙ্কারায় ইন্তেকাল করেন। যখন কমিউনিস্ট, ফ্রিম্যাসন, ওয়াহাবী, ধর্মত্যাগী, রাফীদী, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলমান শিশুদের নিজ ধর্মবিশ্বাস থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের সকল প্রকাশনা, প্রচারণা, সার্বভৌম শক্তি ও সম্পদ নিয়ে ইসলামের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতা, ধর্মানুশাসন ও বই রচনার মাধ্যমে আহলে সুন্নাতকে[৩] ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং যুবকদের উপর যে বিষাক্ত মিথ্যাচার আরোপ করা হয়েছিলো তা দক্ষতার সাথে মোচন করেছিলেন। এই কাজের জন্য তিনি অনেক কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছিলেন (রহীমাহুল্লাহু তায়ালা)। আব্দুল হাকিম এফেন্দির পিতা খলিফ মুস্তফা এফেন্দী হাক্করী (পূর্ব আনাতোলিয়ান শহর) শহরের ইউকসোকোভার সাকিতান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

আব্দুল হাকিম এফেন্দির দাদা সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান ছিলেন সাইয়্যেদ আবদুল্লাহর পুত্র। সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহকে আরভাসে সৈয়দ ফাহিম এর শিয়রের পাশে দাফন করা হয়েছে। সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর আরভাসী পরিবারের ধারাবাহিকতার জন্য সাইয়্যেদ আব্দুর রহমানের মা তাকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল- তাহির, আব্দুর রহীম, লুৎফী, আব্দুল হামীদ ও মুহাম্মদ। সৈয়দ তাহির বসরার গভর্নর ছিলেন। সাইয়্যেদ আব্দুর রহীম ১২০০ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে, তাঁর পুত্র হাজী ইব্রাহীম ও তাঁর নাতি আব্দুল আজিজকে দোয়ু বায়াজিদে আহমদ হানি সমাধিস্থলে সমাধিত করা হয়। আবদুল আজিজ এফেন্দির তিনজন সন্তান, তারা হলেন মুহাম্মদ আমীন, ওমর এফেন্দি এবং সৈয়দা খাদিজা। তাদের প্রত্যেকের সন্তান ও নাতিগণ প্রত্যেকেই ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং দক্ষ ছিলেন। মুহাম্মাদ আমীন এফেন্দির চার পুত্র ছিল। তাদের নাম আবদুল আজিজ, আব্দুল কাদির, আব্দুল হাকিম ও মাহমুদ এফেন্দি। আব্দুল হাকিম এফেন্দির পুত্র আহমাদ এফেন্দী তুর্কি দৈনিক পত্রিকার কলাম লেখক থাকাবস্থায় ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৮ সালের শেষ দিন ইস্তানবুলে মারা যান।

১। সৈয়দ: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর।
২। আলেম: ইসলাম বিশেষজ্ঞ।
৩। আহলে সুন্নাত: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যিকার এবং পূর্ণাঙ্গ অনুসারি।

সাইয়্যেদ আবদুর রহমান ছিলেন তাঁর সময়ের মুর্শিদে আকমল (পরিপূর্ণ মুর্শিদ)। আল্লাহ তায়ালার হাজার হাজার প্রেমিক তাঁর সোহবায় (ধর্ম প্রচারণায়) উপস্থিত হতেন এবং ফয়েজ অর্জন করতেন। তিনি দূরবর্তী দেশগুলোতে পরামর্শপত্র পাঠাতেন। তাঁর ফারসি ভাষায় লিখিত চিঠি যা ইরিসানের বাদশাহ শরফুদ্দীন আব্বাসীকে পাঠানো হয়েছিলো তা খুবই মূল্যবান। এমনি এক চিঠিতে তিনি তাঁর মুহাম্মদ কারিম খান, মুস্তফা ও ফইজুল্লাহ বেগ এর জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন ও তাদের জন্য দোয়া করেছেন।

শরাফুদ্দীন বেগ তাঁর অন্য একটি চিঠিতে নিম্নোক্ত লাইন যুক্ত করেছেন: (১১৯২ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৮ সালে মওলানা সাহেব এই ফকিরের (তিনি নিজেকে ইঙ্গিত করেছেন) কাছে চিঠিটি লিখেছেন। তিনি বলেন যে কষ্ট মোকাবেলায় ধৈর্যের প্রয়োজন এবং ধৈর্যের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। কয়েকমাস পর আমার পিতা আব্দুল্লাহ হান বেগ মারা যান। মওলানা সাহেবের কারমাত এ থেকেই বুঝা যায়।) সাইয়্যেদ আবদুর রহমানকে হোসাবে দাফন করা হয়।

সৈয়দ লুৎফী এফেন্দীর এগারো জন পুত্র ছিল।

সৈয়দ লুৎফী এফেন্দির প্রথম পুত্র ছিলেন আব্দুল ঘানী, যার পুত্র ছিলেন মীর হক, তার পুত্র ছিলেন আবদুর রহমান, তার পুত্র মুহাম্মদ সাঈদ এফেন্দী। লুৎফুল্লাহ ইফেন্দির দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন আব্দুল গাফফার এফেন্দী, তার ছেলে শরীফ, তার ছেলে মুহাম্মদ শফিক এফেন্দী। লুৎফুল্লাহ এফেন্দির তৃতীয় পুত্র ছিলেন মুহাম্মদ, যিনি হযরত সৈয়দ ফাহিমের সৎ পিতা ছিলেন। তাঁর পুত্র তাহির, যার পুত্র ছিলেন রেসুল, তার পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ এফেন্দী।

লুৎফুল্লাহ এফেন্দির চতুর্থ পুত্র ছিলেন রেসূল এফেন্দী। তাঁর পঞ্চম পুত্র সৈয়দ সিবগাতুল্লাহ এফেন্দী ছিলেন সৈয়দ ত্বহা হক্কারীর শিষ্য। তাঁর পুত্র ছিলেন জালালুদ্দীন, তার পুত্র ছিলেন আলী, তার পুত্র সালাহাদদীন এফেন্দী। তার দুই পুত্র কামরুন ইনান ও জয়নাল আবেদীন ইনান বিটলিসের সিনেটর ও সংসদ সদস্য ছিলেন।

তাঁর ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন জামালুদ্দীন, তার পুত্র ছিলেন আব্দুল মজিদ, যার পুত্র ছিলেন সা'দুল্লাহ, তার পুত্র ছিলেন মুহীউদ্দীন, যার পুত্র ছিলেন আব্দুর রহমান, যার পুত্র লুৎফুল্লাহ, যার পুত্র ছিলেন নূরুল্লাহ এফেন্দী।

আব্দুল হামিদ এফেন্দির দুই পুত্র ছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মোল্লা সাফী, যার নাতি ছিলেন আব্দুল হামীদ এফেন্দী। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত সৈয়দ ফাহিম আরওয়াসী (কুদ্দিসা সিররুহ)।

সৈয়দ মুহাম্মদের সাত পুত্র এবং হামিদা হানীম নামে এক কন্যা ছিল। হামিদা হানীম ছিলেন তীমুর[১] বংশের হুররেম বেগ এর স্ত্রী। তার ছিলো তিন পুত্র, তাদের নাম সালিহ, মামদুহ ও সাঈদ। সাঈদ বেগের দুইজন সন্তান ছিলেন তৌফিক বেগ ও আমিনা হানিম। আমিনা হানীম ছিলেন মক্কী এফেন্দির প্রথম স্ত্রী। তার দ্বিতীয় স্ত্রী আফিফা হানিম। সৈয়দ মুহাম্মদের প্রথম পুত্র ছিলেন মাহমুদ এফেন্দী। তার তিনজন কন্যা ছিলো, তাদের

নাম যুবায়দা, মারইয়াম ও আসমা। আসমা হানীম ছিলেন আবদুল হাকীম এফেন্দির প্রথম স্ত্রী এবং তিনি খুবই ধর্মপ্রাণ ও পবিত্রা মহিলা ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন আয়েশা হানিম যিনি সৈয়দ ফাহিম আরওয়াসী (কুদ্দিসা সিররুহ) এর নাতনী ছিলেন। তিনি আহমদ মক্কী এবং মুনির এফেন্দির মা ছিলেন। তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন আইশা হানীম কিন্তু তাকে নিনে হানীম বলে ডাকা হতো এবং তার চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন বদরিয়া হানীম। তাঁর পঞ্চম স্ত্রী ছিলেন মাইদা হানীম, তিনি ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে মারা যান।

সৈয়দ মুহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র মুহীউদ্দীন এফেন্দী। তাঁর দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে ছিল। তার কন্যাদের মধ্যে বেয়াজ হানীম ছিলেন ফারুক বেগের মা এবং জালিহা হানিম ছিলেন আবদুর রহিম যাপসুর মা। তার দুজন পুত্র হলেন হাসান এফেন্দি ও মুস্তফা এফেন্দি। হাসান এফেন্দির সাত পুত্র এবং সাত কন্যা ছিল, তাদের মধ্যে চারজন পুত্র শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পঞ্চম পুত্র মাজহার এফেন্দী ছিলেন নাসিবে হানিমের স্বামী। ষষ্ঠ পুত্র মুহীউদ্দীন এফেন্দী আঙ্কারায় মৃত্যুবরণ করেন। সপ্তম পুত্র নাজমুদ্দিন এফেন্দী আদালতের আপিল বিভাগের সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন নাইমা হানিমের স্বামী এবং আহমদ এফেন্দির জামাতা। তাঁর কন্যাদের মধ্য থেকে নিনে আইশা হানিম ছিলেন আবদুল হাকীম এফেন্দির স্ত্রী, দিলবার হানিম ছিলেন ত্বহা এফেন্দির স্ত্রী ছিলেন, ফাতিমা হানিম ছিলেন সৈয়দ ইব্রাহীম এফেন্দীর ও সাবিহান হানিম ছিলেন আব্দুল্লাহ বেগের স্ত্রী।

মুস্তফা এফেন্দির নয় পুত্র ও দুই মেয়ে ছিল। প্রথম ছেলে ছিলেন সৈয়দ আব্দুল হাকীম এফেন্দী, দ্বিতীয়জন ইব্রাহীম এফেন্দী, তৃতীয় ত্বহা এফেন্দী, চতুর্থ আব্দুল কাদির এফেন্দী, পঞ্চম শামসুদ্দীন এফেন্দী, ষষ্ঠ জিয়াউদ্দীন এফেন্দী, সপ্তম ইউসুফ এফেন্দী, অষ্টম মাহমুদ এফেন্দী, নবম কাসিম এফেন্দী। আব্দুল হাকিম এফেন্দি সবার বড় ছিলেন এবং সবার শেষে মারা যান। আব্দুল কাদির এফেন্দির তিন নাতি জয়নাল আবেদীন, বদরুদ্দীন ও ফাহরুদ্দীন এখনও জীবিত আছেন।

শামসুদ্দীন এফেন্দির এক পুত্র ও দুই মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন আফিফা হানিম ছিলেন মক্কী এফেন্দির স্ত্রী। দ্বিতীয় মেয়ে, নাজিফা হানিম ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে মারা যান। তার ছেলে জামাল এফেন্দী ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ইস্তানবুলের কিরাজলী মসজিদের ইমাম ও খতিব (প্রচারক) ছিলেন এবং জালালুদ্দিন রুমীর মসনবী শরীফে তার গভীর ও অসামান্য জ্ঞান ছিল। তিনি ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ সালে ইস্তানবুলে মৃত্যুবরণ করেন। ইউসুফ এফেন্দির পুত্র সৈয়দ ফারুক ইশিক ছিলেন কোর্ট অফ একাউন্টের প্রধান এবং ভোয়ান প্রদেশের একজন সিনেটর। তিনি ১৯৭২ সালে আঙ্কারায় মারা যান। ফারুক বেগের দুইজন সন্তান, সৈয়দ নৌজাদ ও সৈয়দ রুচান তারা এখনও জীবিত এবং তাদেরও পুত্র আছে। ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৯৭১ সালে সৈয়দ রুচানকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাউন্সিল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মাহমুদ এফেন্দির মা ছিলেন মরিয়ম হানিম। তার অন্য সকল ভাই ও বোনরা হানো হানিমের সন্তান।

মাহমুদ এফেন্দির মেয়ে রুকাইয়া হানিম। মুস্তাফা এফেন্দির প্রথম কন্যা মু'তাবার হানিম ছিলেন তৈমুর বংশের সাঈদ বেগের স্ত্রী এবং একইসাথে আহমদ মক্কী এফেন্দির ফুফু এবং শাশুড়ী ছিলেন। ১৩৪১ হিজরীতে তিনি মারা যান এবং তাকে এদির্নিকাপি কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে ছিল রাবিয়া হানিম।

সৈয়দ মুহাম্মদের তৃতীয় পুত্র ছিলেন নূরুদ্দীন এফেন্দী। তাঁর ছিলো দুই পুত্র তাদের নাম মাজিদ এফেন্দী ও আলী এফেন্দী। মজিদ এফেন্দির পুত্র ইজ্জত বেগ নাফিয়া হানিমের স্বামী ছিলেন এবং তিনি ভোয়ানে ১৯৮১ সালে মারা যান। তাঁর চারজন সন্তান ছিল।

সৈয়দ মুহাম্মদের চতুর্থ পুত্র ছিলেন আহমদ এফেন্দী। তার ছিলো তিন সন্তান, তারা হলেন উবাইদ, শওকত ও শিহাবউদ্দিন।

সৈয়দ মুহাম্মদের পঞ্চম পুত্র ছিলেন হামিদ পাশা। তাঁর ছিলো চার পুত্র, আহমদ, আব্দুল্লাহ, ফাহমি ও ইব্রাহীম এবং তিন মেয়ে, নাফিয়া, নাসীবা ও আয়েশা। তাদের মধ্যে সাঈদ ইব্রাহিম আরওয়াস ছিলেন আবদুল হাকীম এফেন্দির জামাতা এবং তিনি বছরখানেক ভোয়ানে এম.পি. হিসেবে সেবা প্রদান করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে আঙ্কারায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছেলে ছিলেন সৈয়দ সিদ্দীক এবং তার মেয়ে ছিলেন গুলসুম ও হামিয়্যাত। সৈয়দ আহমদ ছিলেন মুহাম্মাদ সিদ্দীক এফেন্দির জামাতা এবং নাঈমা হানিমের পিতা। মুহাম্মদ সিদ্দীক এফেন্দী ছিলেন হযরত সৈয়দ ত্বহা এর নাতি অর্থাৎ, সৈয়দ উবাইদুল্লাহর পুত্র এবং শহীদ আব্দুল কাদের

এফেন্দীর ভাই। নাফিয়া হানিম ছিলেন ইজ্জত বেগের স্ত্রী। নাসীবা হানিম মাজহার এফেন্দীর স্ত্রী এবং আয়শা হানিম মুহাম্মদ মাসুম এফেন্দীর স্ত্রী ছিলেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ এর ষষ্ঠ পুত্র হলেন, হুসাইন এফেন্দী। তাঁর চারজন পুত্র; তারা হলেন জালাল, আলাউদ্দিন, সৈয়দ গাজি এবং বাহাউদ্দীন। জালাল এফেন্দির পুত্র সাঈফুদ্দীন বেগ হলেন রুকাইয়া হানিমের স্বামী এবং আইদিন, জালাল এফেন্দি ও লাইলা হানিমের পিতা। আইদিন এফেন্দি ১৯৮৩ সালে আনাওয়াতান পার্টির পক্ষ থেকে ভোয়ানের এম.পি. হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সন্তানরা হলেন জুনাইদ, মালিহ রুচান, ফাতিহ এবং মুরাদ এফেন্দি। তারা তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ এর সপ্তম পুত্র ইউসুফ এফেন্দি।

সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তাদের মধ্যে আনোয়ার ও শাফিয়া ছিলেন আসমা হানিমের সন্তান। শাফিয়া হানিম সালিহ বেগের স্ত্রী ছিলেন। তিনি অভিবাসনের সময় মোসুলে মৃত্যুবরণ করেন। আনোয়ারও ১৩৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৯১৮ সালে এসকিশেহিরে অভিবাসনের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আহমদ মক্কী উচিশিক এফেন্দি তার বাবার কাছ থেকে এবং আরবি ও ফারসি বই থেকে বিশদভাবে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন এবং তিনি ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৭ সালে ইস্তানবুলে মারা যান। তাকে বালুম কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার মাধ্যমে তিনি একজন সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারি ছিলেন, যার সমতুল্য সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। তিনি অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ঐ সকল ব্যক্তিদের ঔষধ প্রদান করতেন যারা বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অজ্ঞ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা সমগ্র ইস্তানবুল শহর ও ইসলামী বিশ্বকে তার পবিত্র উপস্থিতি দ্বারা সম্মানিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। সৈয়দ আহমেদ মক্কী এফেন্দির চার পুত্র- বাহিক, বাহা, মাদানী ও হিকমত এবং এক কন্যা জাহিদা। তারা প্রত্যেকেই নীতিনৈতিকতা ও ধর্মপালনে আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাতি, ত্বহা উচিশিক, ফাহিম ও মুহাম্মদ এফেন্দি এবং তাঁর কন্যা শফীয়া হানীম, তারা একেকজন একেকটি রত্ন ছিলেন। সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির তৃতীয় পুত্র সৈয়দ মুনির এফেন্দী ইস্তানবুল পৌরসভার বিক্রয় বিভাগে বহু বছর ধরে কাজ করেছেন এবং তার সততা, অধ্যবসায় এবং সুন্দর আচরণের জন্য তাঁর সহকর্মী-সহযোগীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছেন। তিনি ১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৯ সালে মারা যান। তাকে বাগলুম কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল।

১৩৩২ হিজরীর (১৯১৪ সাল) রজব মাসে সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দী বাশকালা থেকে স্থানান্তরিত হন। তিনি ১৩৩৭ হিজরীতে ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন। তিনি প্রথমে আইয়ুব সুলতানের ইয়াজিলী মাদ্রাসায় এবং পরে গুমুশশুয়ু পাহাড়ে মুর্তাদা এফেন্দি টেক্কেসিতে স্থায়ী হন। বিভিন্ন মসজিদে খুতবা দেওয়ার সময় এবং ভেফা উচ্চ বিদ্যালয়ে ও সুলতান সেলিম মসজিদের সুলেইমানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক থাকাকালীন তিনি ইসলাম প্রচার, ইসলামের শত্রুদের নীরবে পরাজিত করা শুরু করেন। ১৩৩৭ হিজরীর জিলক্বদ মাসের ৮ তারিখ মোতাবেক ১৯১৯ সালের ৫ই আগস্ট সুলতানের ফরমানে (আদেশে) সুলাইমানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একটি মাদ্রাসায় সিনিয়র অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ফরমানে বলা হয়েছিল,

দার আল খিলাফত আল-আলিয়া সুলাইমানিয়া মাদ্রাসার নিম্নলিখিত শূন্য পদের জন্য নিযুক্ত হলেন-দাবরালি উইলদান ফাইক এফেন্দি মুহাদ্দীস পদে; হক্কারীর মধ্যে অন্যতম একজন উলামা আব্দুল হাকিম এফেন্দী তাসাউফ শিক্ষক পদে;..... হক্কারীর একজন প্রাক্তন প্রতিনিধি সৈয়দ ত্বহা এফেন্দি ফিকহে শাফেয়ীর শিক্ষক পদে। এই “আল-ইরাদাতুস-সানিয়্যা” (রাষ্ট্রীয় প্রতিলিপি) পরিপূর্ণ করার জন্য, মাশিক্কাত আল-ইসলামিয়্যাহ (ধর্মীয় বিষয়ক কার্যালয়)কে নিযুক্ত করা হয়েছে। মুহাম্মদ ওয়াহিদ আদ-দীন।"

এই ফরমানটি জারিদা-ই ইলমিয়্যা এর ১৪৮৪ পৃষ্ঠার ৪৮ নং ইস্যুতে লেখা রয়েছে।

মুরতদা এফেন্দী, যিনি মক্কা আল-মুকাররমার আহমদ ইয়াকদস্তের কাছ থেকে ফয়েয পেয়েছিলেন, তিনি শিপইয়ার্ডের প্রধান হিসাব রক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১১৫৮ হিজরীতে গুমুশসুয়ুর কাছাকাছি ইদ্রিস কিয়োস্ক এ সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ১১৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরন করেন এবং সমুদ্রমুখি একটি প্রাচীরে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর ছেলেদেরও সেখানে

দাফন করা হয়েছিল। এই মসজিদটির প্রথম ইমাম আব্দুল্লাহ কাশগরি এর পর তাঁর পুত্র উবাইদুল্লাহ এফেন্দী দশ বছর ধরে ইমাম ছিলেন। ঈসা এফেন্দি ছিলেন পরবর্তী ইমাম, যিনি ১২০৬ হিজরীতে মারা যান। সেলিম খান তার জন্য একটি সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তিতে আব্দুল্লাহ এফেন্দির জামাতা ছালাবি উবাইদুল্লাহ এফেন্দী ১২০৮ হিজরী সালে মারা যান। সর্বশেষ আব্দুল হাকিম এফেন্দী যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, তাকে ইমাম ও খতিব (প্রচারক) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানে এবং অন্যান্য মসজিদ ও বিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম প্রচার করতেন।

হুসেইন হিলমি এফেন্দি বলেছেন, “১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৯ সাল থেকে শুরু করে সাত বছর ধরে অব্যাহত সাহচার্য বজায় রাখার পর এবং আমি যখন আঙ্কারায় ছিলাম তখন প্রায় সাত বছর ধরে বারংবার তাঁকে পরিদর্শনের পর, আমি কি সেই দরজা (আবদুল হাকীম এফেন্দী) থেকে এই পৃথিবী ও পরকালের জন্য যা কিছু দরকার তা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম? যদিও আমি ইসলামিক জ্ঞান অধ্যয়ন করতে পারিনি এবং ইসলামিক গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম, তবে আমি সেই মহান ওলীর পৃষ্ঠপোষকতা, দয়া ও সমবেদনাসহ কিছু ইলম (জ্ঞান) এবং ইখলাস (বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা) বোঝার সক্ষমতা অর্জন করেছি। আমি দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকে অনেক প্রজ্ঞাবান ও কৌতূহলী মানুষদেরকে তার কাছে আসতে দেখেছি এবং আগত ব্যক্তিগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস তার কাছ প্রশ্ন করতেন এবং পরিপূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর নিয়ে ফিরে যেতেন। যাইহোক, এমন মানুষও ছিল যারা পার্থিব সুবিধার জন্য বা শত্রুতা পোষণের জন্য তাঁর নিকট আসতো। তিনি তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন নম্র, সহানুভূতিশীল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি, তিনি বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন না, সবার সাথে নম্র-ভদ্র ও শালীন আচরণ করতেন। যারা আল্লাহর জন্য তাদের বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে ইসলামি গবেষকদের কাছে এসেছিল এবং যারা ফয়েয গ্রহণ করেছে, তারা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে। যারা বলে যে তারা তাদের দরজা থেকে ফয়েয নিয়েছে কিন্তু তারা ইবাদত বন্দেগী থেকে বিরত থাকল এবং সকল প্রকার হারাম[১] ও খারাপ কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, তবে তাদেরকে মুনাফিক ও শোষক হিসেবে গণ্য করা হয়।“

উপরে বর্ণিত ইদ্রীস কিয়োস্ক ইদ্রাস হাকিম বিন হুসামাদ্দীন কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। বায়েজীদ ও ইয়াভুজ যুগের একজন অভিজ্ঞ আলেম এই ব্যক্তি ইরানী সীমান্তে বসবাসরত ২৫ টি জনগোষ্ঠীকে অটোমান শাসনের অধীনে নিয়ে এসেছিল কাছে। এভাবে তিনি চালদিরান বিজয়ে ব্যাপকভাবে অবদান রাখেন। তিনি ৯৩২ সালে মারা যান। তাকে একটি ঝর্ণার পাশে তীরে দাফন করা হয়েছে যা তিনি বুলবুলের রীলের পাশে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী জয়নব খাতুন ইদ্রিস কিয়োস্কের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং মসজিদটি তার স্ত্রীর নামে পরিচিত। মসজিদ এলাকাতেই কারিয়াকদি টেক্কে (একটি দরবেশ কুটির) আছে। এর পিছনে গুমুশসুযু ঝর্ণা। কারিয়াকদি টেক্কেটিকে কোলাক হুসেইন টেক্কেও বলা হয়। এটি ৩য় মুস্তাফা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। দরবেশ মুহাম্মদ ১২৩০ সালে এই টেক্কের পেছনে একটি মৌলবীখানা নির্মাণ করেছিলেন।

সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দী ধর্মীয় জ্ঞানে এবং তাসাউফের মা'আরফের[২] জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অসম্ভব বলে মনে করতো সেসব কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেসের জন্য তাঁর কাছে আসতো, কিন্তু তারা সন্তুষ্ট হয়ে যেতো, কারণ এক ঘন্টা তাঁর সোহবতে থাকলেই সেসব প্রশ জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তারা উত্তর খুঁজে পেতো। যারা তাঁর তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ, পৃষ্ঠপোষকতা) এবং ভালবাসা অর্জন করেছি, তারা অসংখ্য কারামত[৩] দেখতে পেতো। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি কখনো এমন কথা বলতে শোনা যায়নি, "আমি ব্যক্তিগতভাবে ..." তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বিবেচনায় নেয়া হবে না ...। এই উঁচু ব্যক্তিরা কি লিখেছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা কেবল তাদের বরকত লাভের জন্য পড়ি।" যাইহোক, তিনি নিজেও একই জ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হুসেইন হিলমি এফেন্দির শ্বশুর ইউসুফ জিয়া আকিশিকও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং কারমুর্সেল টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির একজন পরিচালক ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি স্বপ্নে আব্দুল হাকিম এফেন্দির হাতের তালু চুম্বন করলাম এবং এই বিষয়টি তাকে জানানোর জন্য পরদিনই আইয়ুব সুলতানে তার বাড়িতে গেলাম। আমি সর্বদা তার সাথে দেখা করার সময় যেভাবে তার চুম্বন করি সেভাবেই তাঁর হাত চুম্বনের জন্য ঝুঁকলাম। তিনি তাঁর বরকতপূর্ণ হাত আমার দিকে প্রসারিত করে হাতের তালু দেখিয়ে বললেন, 'গত রাতে আপনি যেভাবে এটি চুম্বন করেছেন সেভাবেই এখন চুম্বন করুন' এবং উদারতাস্বরূপ তিনি অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করে শুনালেন।“

১. ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ।
২. আল্লাহ সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান যা আওলিয়াদের অন্তরে ফুঁকে দেয়া হয়।
৩. বিস্ময়কর কিছু কাজ যা আল্লাহ তায়ালা ওলী আওলিয়াদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

যারা আবদুল হাকিম এফেন্দিকে অনেক ভালোবাসতেন, হুসেইন হিলমি এফেন্দী তাদের মধ্যে একজন। তিনি বর্ণনা করেন, “একবার আমি এবং দারুশ শাফাকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন তুর্কি শিক্ষক যার নাম রিফকি এফেন্দি, আমরা আব্দুল হাকিম এফেন্দির বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাতের নামাজের পর, তিনি নিরবে বসে ভীষণ চিন্তা করছিলেন। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি হঠাৎ বললেন, ‘উঠো এবং এখান থেকে চলে যাও!’ এটা খুবই অস্বাভাবিক ছিল এবং আমরা সাধারণত অনুমতি নিয়ে তারপর বের হতাম। আমরা চলে যাবার সময়ের প্রথা অনুযায়ী তাঁর হাত চুম্বন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি করো! এখনি যাও!’ রিফকি এফেন্দি দৌড়ে বাগান হয়ে রাস্তায় চলে গেলেন। আমি আমার জুতার ফিতা বাধার জন্য বাগানে দাঁড়ালাম। একজন আমার কাছে এসে বলল, ‘তুমি এখনো এখানে কেনো! এক্ষুণি যাও!’ আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি আব্দুল হাকিম এফেন্দি। আমি বললাম আমি আমার জুতোর ফিতা বাঁধছিলাম। তিনি বললেন এই কাজটি আমার রাস্তায় করা উচিত। আমি তখন লাফ দিয়ে রাস্তায় যেয়ে জুতার ফিতা বাঁধলাম। পরের দিন সকালে আমরা শুনলাম যে, আমরা সামনের গেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর পুলিশ পিছনের গেট দিয়ে বাগানে ঢুকে বাড়ি তল্লাশি করে এবং আব্দুল হাকীম এফেন্দিকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়।“

১৩৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৩১ সালে আব্দুল হাকিম এফেন্দীকে তাঁর বাড়ি থেকে মেনেমিনের আদালতে নেয়া হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্য প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকাগুলি সংবাদ প্রকাশ করে এইভাবে, “রিয়েকশন গ্যাং এর আখিসার শাখার সক্রিয় কমান্ডার শেখ আব্দুল হাকিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে!” যেন পাহাড়ের গেরিলা সেনাপতিকে দীর্ঘ যুদ্ধের পর গ্রেফতার করা হয়েছে। এই পত্রিকাগুলো সারা দেশের মানুষকে সন্ত্রাসবাদে পূর্ণ করে দিয়েছিল এবং মুসলমানদের উপর আগুন ছিটিয়েছিল। অপরাধের ধারণা অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল: কুরআন শিক্ষকদের ঘর অনুসন্ধান করা হয়েছিল; কুরআনের পুস্তিকা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। মুসলমানদের কোরআন ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলো চিলেকোঠা ও গর্তে লুকিয়ে রাখতে হতো। মদ্যপানের আসরগুলোতে ইসলামের শত্রুরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চিৎকার করে বলতো, "আমি আরব মুহাম্মাদকে তার কবর থেকে বের করে আনব এবং তার পা কেটে ফেলব!"(নাউযু বিল্লাহ) তারা কতিপয় তোষামোদকারী ও চাটুকার ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত হতো। যখন তারা তাদের পকেটে হাজার টাকার নোট ব্যবহার করল, তারা ব্যাংক রশিদ নষ্ট করা শুরু করল। আর্মেনিয়ানদের মাধ্যমে তারা রোমানিয়া থেকে সুন্দর সুন্দর ছেলেদের ক্রয় করে আনতো পুলের মধ্যে তাদের সাঁতার কাটার দৃশ্য দেখার জন্য। এই ক্ষেত্রে, অত্যধিক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল এবং অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু আযান তাদের গানের মাধ্যমে আনন্দ উদযাপনে বাধা দেয়, তাই তারা বলেছিল যে মিনারগুলি ভেঙে ফেলা উচিত। আল্লাহ তায়ালার আদেশগুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা মানুষদের ইসলাম থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করতো এই কথাগুলো বলে: "আমার মেয়ে! তোমার চুল খুলে দাও! রাক্ষসের মত বসো না!” নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা একে অন্যের কাছ থেকে নতুন ধর্ম ও অলৌকিক কিছু সৃষ্টির আশা করেছিল। যুবকদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দৈনিক পত্রিকা হাকীকত এ (২ রমযান, ১৩৯০ হিজরী; ২ নভেম্বর, ১৯৭০, নং ১৯৫) সন্ত্রাসবাদ কিভাবে বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত আর বিবেককে দগ্ধ করছিল তা প্রকাশ করে “Our Distressful Days” এই শিরোনামে এমন একটি নথি প্রকাশিত হয়েছিল ।

ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচারে করতে করতে অনেক দূরে গিয়েছিল, তখন একদিন দৈনিক পত্রিকাগুলি আগের দিন যাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল তাদের সম্পর্কে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিল, "আব্দুল হাকীম ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত আগামীকাল ঘোষণা করা হবে।“ হুসেইন হিলমি এফেন্দি সেই দিন সম্পর্কে নিম্নলিখিত লেখাটি লিখেছেন:

"সেই রাতে আমি অনেক যিকির করেছিলাম এবং অনেক দোয়া করেছিলাম। ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আব্দুল হাকিম এফেন্দী এবং আমি আইয়ুব মসজিদের মাঝখানের গেটের বাম দিকে স্তম্ভে মুখোমুখি বসেছিলাম। তিনি হাসছিলেন। তিনি তাঁর ওভারকোটের ডান দিকের

ভেতরের পকেট থেকে একটি সাদা প্যাকেট বের করলেন এবং এটি খুলে আমাকে একটি মিছরি দিলেন। আমি এটি খেলাম এবং জেগে উঠলাম। আমি এখনও সেই স্বপ্ন এবং মিছরির স্বাদ অনুভব করি। আমি আনন্দের সাথে সকালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি সকালে একটি পত্রিকা কিনেছিলাম এবং বড় অক্ষরে লেখা শিরোনামটি দেখলাম: "অ্যাটর্নি জেনারেল মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছিল, কিন্তু আদালত তা গ্রহণ করেনি।" আদালত ১৯৩১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আবদুল হাকিম এফেন্দি ও তাঁর সাথে থাকা পাঁচজনকে বেকসুর খালাস করে দেন। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আমার স্বপ্নে মিছরি খাওয়ার বিষয়টি এই খুশির সংবাদের প্রতীক যা সত্য হয়েছে।“

হুসেইন হিলমি এফেন্দীর আব্দুল হাকিম এফেন্দিকে এক পরিদর্শনকালে তাঁকে বাগানে একজন লোকের সাথে কথা বলা অবস্থায় দেখতে পান। তিনি লোকটি চলে যাওয়া পর্যন্ত একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এরপর আবদুল হাকীম এফেন্দী তাকে ডাকলেন। তারপর কি হয়েছে তা হিলমি এফেন্দি ব্যাখ্যা করেছেন:

“আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং আদবের সাথে বসলাম। আমি আমার সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকাতে পারছিলাম না আর আমার চোখ সরাচ্ছিলাম না। তিনি বললেন, “তুমি কি এই লোকটি চেনো? তার নাম মাজহার তোবুর। তিনি আমাদের পছন্দ করেন এবং আমরা তাকে পছন্দ করি। কিন্তু তিনি আমাদের কথা শোনেন না। তিনি আঙ্কারার একটি উচ্চ বিদ্যালয় রসায়ন পড়ান। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছি এবং বলেছি এইভাবে এইভাবে করুন, কিন্তু তাকে যা বলা হয়েছে তিনি তা করেন না। তিনি নিজের মতামত অনুযায়ী কাজ করেন। তাই, তিনি আগে-ভাগে নিজের পাঠ-প্রস্তুতি এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেই খুব ক্লান্ত হয়ে যান। তার ছাত্ররা, তাদের বাবা-মা এবং স্কুল প্রশাসন তাকে পছন্দ করে না। তিনি যদি আমাদের কথা শুনতেন, তবে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করত।' তার পরামর্শ ব্যাখ্যা করার পর তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমার এই পরামর্শটি ভুলে যেও না। যখন তুমি একজন শিক্ষক হবে, তখন আমাদের স্মরণ করো। আমি যা বলি তাই করো। এটা তোমার জন্য খুবই উপকারী হবে।' কিন্তু আমি এই দয়া ও পিতৃতুল্য পরামর্শের বিপরীতে একটি গুরুতর অসম্মানজনক ভুল করে বললাম, ”জনাব, আমি একজন ফার্মাসিস্ট অফিসার এবং আমি হাসপাতালে কাজ করি। শিক্ষকেরা আমাদের চেয়ে ভিন্ন। তারা শিক্ষা দেন কিন্তু আমরা শিক্ষা দেই না।' এই অপ্রয়োজনীয় ও অশোভন উত্তর দিয়ে আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করিনি মনে হয়েছিল। আমি এখনও আমার সেই ভুলের জন্য কষ্ট পায়। যখন আমি এটা মনে করি, তখন আমার চোখ অশ্রুতে ভিজে যায় এবং আমার হৃদয় ক্রন্দন করে। ওহ যদি শুধু একবার... আমি এক মুহূর্তের জন্য বিনীতভাবে আচরণ করতাম, কেবল যদি আমি বলতাম, ‘আনন্দের সাথে, জনাব!' যদি আমি সেই বরকতপূর্ণ হৃদয় ভেঙ্গে না দিতাম, যাতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক ভালোবাসতেন, যা তিনি প্রতি মূহুর্তে প্রকাশ করতেন এবং তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত ফয়েয এবং মারিফতের ভান্ডার যা আওলিয়া কেরামদের হৃদয়েও বিচরণ করেছিল। আমি এখনও আমার সেই আচরণের জন্য লজ্জা অনুভব করি এবং আমার নীচতা দেখতে পাই।

সৌভাগ্যবসত, আল্লাহ প্রদত্ত দয়া, ধৈর্য, ক্ষমা ও বদান্যতার ধারক এই মহান ব্যক্তি দরদমাখা কন্ঠে আবারো বললেন, 'তুমি যখন একজন শিক্ষক হবে, তখন আমার এই কথাগুলো ভুলে যেও না। তুমি এর দ্বারা উপকৃত হবে’। আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া! আমি বললাম, ‘আনন্দের সাথে, জনাব!’ আল্লাহ তায়ালা আমাকে দ্বিতীয়বার অসম্মাঞ্জস্য কাজ করা থেকে রক্ষা করেছেন।

আমাকে ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৭ সালে বার্সা সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে আমাকে শিক্ষক স্টাফের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। একদিন স্কুলের সামনে আব্দুল হাকিম এফেন্দির উপদেশগুলো একে একে মনে করছিলাম। 'তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আমি একজন শিক্ষক হব। তিনি এই কাজটি অর্জনের জন্য কিভাবে কাজ করতে হবে তাও দেখিয়েছিলেন’, নিজে নিজে এই কথাগুলো বলে আমার চোখ ভিজে গেলো। আমি তাঁর রুহের মাগফিরাতের জন্য কুরআন কারিম তিলাওয়াত করলাম এবং স্কুল ভবনে প্রবেশ করলাম। আমি ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬০ সালে অবসরে যাওয়া পর্যন্ত তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছি। আর আমি এখনও তার পরামর্শ অনুসরণ করি। সবাই আমাকে পছন্দ করে। প্রতিটা কাজে আমি সবসময় সফল হই। আমি আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করেছি।

আব্দুল হাকিম এফেন্দি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন কথা বলেননি। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন তাঁর চোখ শুধু তাকিয়ে ছিল এবং তাঁর চেহারা অনেক হাস্যোজ্জল ছিল। তিনি হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'আমি' আরশ আল-ইলাহী (স্বর্গীয় স্থান) দেখেছি। কত সুন্দর, কত সুন্দর! আমি আমার বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলিনি। আমি সচেতনভাবেই কথাটি বলছি।'"

কায়সারির আবদুল কাদির বেই যিনি তুলার ব্যবসা করতেন এবং বহু বছর ধরে আব্দুল হাকিম এফেন্দির খেদমত করেছেন, তিনি হিলমি এফেন্দীকে বলেন:

"গ্রীষ্মকালে একদিন বরকতপূর্ণ আইয়ুব মসজিদে আব্দুল হাকিম এফেন্দী এবং আমি একসঙ্গে দুপুরের নামাজ আদায় করেছিলাম। তারপর আমরা হযরত খালিদ (বিখ্যাত সাহাবি) এর মাজারে প্রবেশ করলাম। ঐ সময় ওখানে কেউ ছিল না। আমরা কবরের পায়ের দিকে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে বসতে বললেন এবং আমার চোখ বন্ধ করতে বললেন। যখন আমি চোখ বন্ধ করলাম, তখন দেখলাম হযরত খালিদ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের কাছে আসলেন। তিনি লম্বা এবং সুঠাম দেহের অধিকারি ছিলেন এবং তার চেহারা মোবারকে সুন্দর দাড়ি ছিল। আব্দুল হাকিম এফেন্দি আমাকে তাঁর হাতে চুমু দিতে বললেন। আমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে আমি তাই করলাম। তারা নিরবে একে অপরের সাথে কথা বলছিলেন। আমি তাদের শুনতে পারছিলাম না। আমি সম্মানের সাথে তাদের দেখছিলাম। আব্দুল হাকিম এফেন্দি আমাকে আমার চোখ খুলতে বললেন। যখন আমি চোখ খুললাম তখন আমি দেখলাম যে আমরা দুজন কবরের পাশে বসে আছি। আমরা সেখান থেকে বের হলাম। তখন আসর নামাজের আজান হচ্ছিলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি দেখেছি। আমি তাকে সব বললাম। তিনি আমাকে বললেন তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি যেন এই বিষয়ে কাউকে না বলি। তাঁর মৃত্যুর পর আজ চব্বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। আজকে আমি আপনার কাছে প্রকাশ করেছি কারণ আপনি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করছেন।"

১০- সৈয়দ ফাহিম আরওয়াশী এর জীবনি
(সৈয়দ ত্বহা আল হাক্কারী এর একজন শিষ্য)

সৈয়দ মুহাম্মদ ফাহিম বিন আব্দুল হামীদ ইফেন্দী ১২৪১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ সালে মারা যান। তাঁর মা ছিলেন আমিনা হানীম। তিনি ভোয়ান জেলার মুকস এর আরওয়াস গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি লম্বা এবং চিকন মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যম আকারের দাড়ি ছিলো। তার নাকের মাঝখানের অংশটুকু একটু উঁচু ছিল। তার কপাল ছিল প্রশস্ত। তিনি চেহারার রঙ ছিলো সাদা। তার চোয়ালে সবগুলো দাঁত ছিলো এবং খুব সুন্দর দাঁত ছিলো। তিনি বড় আকৃতির পাগড়ি ব্যবহার করতেন। তিনি সাদা রঙের এমন এক পোষাক পরিধান করতেন যা তিন টুকরা কাপড় বিশিষ্ট, সবুজ বা নীল রঙের লম্বা পোশাক, উলের মোজা এবং চামড়ার চপ্পল পরিধান পরতেন। তিনি তার জীবনের শেষ কয়েক বছরে চশমা ব্যবহার করেছেন। তার চোখ ছিল কালো এবং চুলের অধিকাংশ অংশই সাদা ছিল। তার দুই ভ্রুর মাঝখানে সংযুক্ত ছিল। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন সফরে বের হলে সবসময় ঘোড়া ব্যবহার করতেন। শেষ সময়ে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তার নিজর পাগড়িটি অনেক কষ্টে বহন করতেন। নামাজ আদায় করার সময় তিনি আবানী নামক একটি কাপড় দিয়ে তার পাগড়ি পেঁচিয়ে নিতেন। শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি লম্বা ছিলেন, তাই তার কবরটিও ছিল লম্বা, যা পরে আর্মেনিয়ানরা ধ্বংস করে ফেলে। তিনি বিস্ময়কর চেহারার অধিকারী ছিলেন। মানুষ তাকে দেখে ভয় পেতো। যারা তাকে দেখেছিল তারা তাকে আল্লাহ তায়ালার একজন প্রিয় বান্দা হিসেবে চিনেছিল। ভোয়ানে এবং তার সময়ে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী ছিলেন, এমনকি কৃষি, শিল্প ও রাজনৈতিক জ্ঞানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ছিলো আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জ্ঞান। ভোয়ানের গভর্নর তাকে জিজ্ঞাসা করে তার সমস্যার সমাধান করতেন। তিনি তার সারাজীবনে কখনো জামায়াতের সাথে নামাজ ও তাহাজ্জুদ ছেড়ে দেননি।

মাদ্রাসায় ধর্মীয় ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকালে তিনি মুর্শিদে কামিল হযরত সৈয়দ ত্বহা আল-হাক্কারী (যিনি পূর্ব আনতালিয়ার কুতুব ছিলেন) এর তাওয়াজ্জুহ লাভ করেছিলেন।

যখন তিনি আবিরী, বুলানিক, মূশ এ মুতাওয়াল পড়ার উদ্দেশ্যে শামদিনান ত্যাগ করেন, তখন তার মুর্শিদ তাকে বললেন, "বইয়ের কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে স্বরণ করো! আমাকে কল্পনা করো!" পরবর্তীতে একদিন তার উস্তাদ মোল্লা রাসূল সিবকীর কাছে মুতাওয়াল পড়ার সময় একটি বাক্য বুঝতে পারছিলেন না। তার উস্তাদ দ্বিতীয়বার তা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি তার উস্তাদকে পুনরায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে বলেন। মোল্লা রাসুল আস-সিবকী বেশ কয়েকবার বাক্যটি পড়লেন এবং বুঝালেন অতঃপর বললেন, "আজ আমি ক্লান্ত, আমি আগামীকাল আবার ব্যাখ্যা করব।" পরের দিন তিনি আবারো ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। যখন তার উস্তাদ বারবার তা পড়ছিল, হযরত সৈয়দ ফাহীম তার চোখ বন্ধ করে মুর্শিদের দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলেন। সৈয়দ ত্বহা তাঁর হাতে একটি বই নিয়ে সৈয়দ ফাহিমের সামনে হাজির হলেন। তিনি সৈয়দ ফাহিমের সামনে বইটি খুলে দিলেন। এটি মুতাওয়াল এর ওই পৃষ্ঠাই ছিল, যাতে অস্পষ্ট বাক্যটি লেখা ছিলো। সৈয়দ ত্বহা বাক্যটি সুন্দর করে ব্যাখ্যা সহকারে পড়লেন এবং সৈয়দ ফাহিম মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনলেন এবং দেখলেন যে তিনি একটি অতিরিক্ত ওয়ায়ে-আতিফা (ওয়া) পড়েছেন। যখন সৈয়দ ত্বহা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন তিনি চোখ খুললেন এবং দেখলেন যে তার উস্তাদ মোল্লা রাসুল তখনও ওই বাক্যটি পড়ছেন এবং চিন্তা করছেন। তখন তিনি নিজে এই বাক্যটি পড়ার অনুমতি চাইলেন এবং তার মুর্শিদ থেকে যেভাবে শুনেছিলেন ঠিক সেইভাবে 'ওয়া' যোগ করে পড়লেন। তার শিক্ষক তাকে বললেন, "এখন এর অর্থ স্পষ্ট।" তারা উভয়েই এখন অর্থটি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন। মোল্লা রাসুল বলেন, "আমি বিগত বিশ বছর ধরে এই লাইনগুলি না বুঝে পড়ছি ও ব্যাখ্যা করছি, এখন আমি স্পষ্টভাবে এর অর্থ বুঝতে পারলাম। এখন আমাকে বলো। এটা সঠিকভাবে পড়া তোমার নিজের যোগ্যতার বাইরে। আমি বহু বছর ধরে এটা বুঝতে পারিনি। তুমি কিভাবে এটা করলে? তুমি একটি ওয়া যোগ করলে এবং অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল?" হযরত সৈয়দ ফাহীম তার শিক্ষককে বললেন, যিনি মূশের আলাউদ্দিন পাশা মসজিদের দরজার পাশে বিশ্রাম করছেন, তিনি রবীতার মাধ্যমে কীভাবে এটা শিখলেন।

হযরত সৈয়দ ফাহীম বছরে একবার মুকস ছেড়ে যেতেন এবং এক মাস বা দুই মাস তিনি ভোয়ানে অবস্থান করতেন। যারা তাকে ভালোবাসতো, তারা তার চারপাশে ভীড় করতো এবং ফয়েজ লাভ করতো। তিনি সচরাচর আহমদ নামে তার এক শুভাকাঙ্খির ঘরে অতিথি হতেন, যিনি তাকে অনেক ভালোবাসতেন, তার

এই শুভাকাঙ্ক্ষী সেই সময় আদালতের প্রথম সচিব ছিলেন। যে বছর তার এই শুভাকাঙ্খি আহমেদ হজ্জে গিয়েছিলেন, সে বছরও সৈয়দ ফাহিম তার বাড়িতে ছিলেন। একদিন মাঝরাতে তিনি তার একজন সঙ্গীকে ডেকে বললেন, “সবাইকে জাগিয়ে তুলুন! আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব এবং ..... এর ঘরে যাব।“ তাকে বলা হল, “হুজুর, এই মধ্যরাত্রে কি রওয়ানা হওয়া অনুপযুক্ত হবে না? আমরা কি আগামীকাল রওয়ানা হতে পারিনা?” তিনি বললেন, "না, আমরা এখনি যাব। আহমদ বেই এর পুত্রদের বলুন।“ আহমদ বেই এর পুত্র আসলেন এবং ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলেন, “হুজুর, আমরা যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। বাবা শুনলে অনেক কষ্ট পাবে। কিভাবে আমরা তাকে উত্তর দিবো? দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন।" তারা অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছিল। হযরত সৈয়দ ফাহীম বললেন, "না। আমি তোমাদের উপর খুব সন্তুষ্ট। আমাদের যখন যা প্রয়োজন ছিলো তোমরা তা পূরণ করেছো। আমি তোমাদের জন্য অনেক দোয়া করি। কিন্তু এখন আমাদের যেতে হবে।“ আহমদ বেই এর ছেলেরা বললো, “ঠিক আছে আপনি যেমনটি চাইবেন তাই হবে।“ মাঝরাতে তারা তাদের অন্য এক শুভাকাঙ্খির বাড়িতে গেলেন। পরের দিন তার পুত্র মুহাম্মদ আমীন এফেন্দী তাকে বলেছিলেন যে আহমাদ বেই এর পুত্ররা গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,”বাবা! আমরা সকাল পর্যন্ত তাদের ঘরে থাকলে কি হতো?” হযরত সৈয়দ ফাহীম বললেন, “হে আমার পুত্র! এখন কাউকে এই কথা বলো না। গত রাতে মক্কা আল-মুকররামায় আহমদ বেই ইতেকাল করেছেন। এই ঘর এখন অনাথদের ঘর হয়ে গেছে। এই সম্পত্তি এখন তার সন্তানদের হয়ে গেছে। আমরা সবকিছু ব্যবহার করতাম এবং পানাহার করতাম, কারণ আমি জানতাম যে আহমদ বেই নিজ ইচ্ছায় আমাদের সবার জন্য সবকিছু হালাল করেছেন। কিন্তু এখন আমরা তার উত্তরাধিকারী, যাদের সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম না, তাদের সম্পদ ব্যবহারে অনুমতি প্রাপ্ত নয়। আমি হঠাৎ করেই চলে এসেছি কারণ তাদের অধিকার অন্যদের দ্বারা নষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার।“ এক মাস পরে হাজীদের কাফেলা ফিরে আসলো এবং কাফেলার সবাই ফিরে আসল, কিন্তু আহমদ বেই ফিরে আসলো না। “তিনি মধ্যরাতে মক্কায় মারা যান”, তারা বলেছিল। পরবর্তিতে দিন গণনা করা হয়েছিলো এবং তা ঐ মধ্যরাতের সাথে মিলে গিয়েছিলো।

একবার হযরত সৈয়দ ফাহিম তাঁর শিষ্যদের সাথে ভোয়ানের একটি হ্রদের তীর দিয়ে হাঁটছিলেন, তখন আহতামার দ্বীপের আর্মেনিয়ান চার্চের একজন যাজক উপস্থিত হল এবং সে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। তাঁর শিষ্যদের কয়েকজন ভাবলেন, “একজন যাজক যাকে আমরা আল্লাহর শত্রু বলে থাকি, সে যদি পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে, তাহলে হযরত সৈয়দ ফাহিম যাকে আমরা মহান ওলী এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয় একজন বান্দা হিসেবে জানি, তিনি তীর দিয়ে হাঁটাচলার পরিবর্তে একই রকম করতে পারেন না?” হযরত সৈয়দ ফাহিম এই চিন্তার বিষয়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তার চটিজুতা তাঁর বরকতপূর্ণ পা থেকে খুলে ফেললেন এবং হাতে নিয়ে তাদের একটি অপরটিতে আঘাত করতে লাগলেন। তাদের একেকটি আঘাতে সেই যাজক একটু একটু করে পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলো। যখন যাজকের ঘাড় পর্যন্ত পানি পৌছে গেলো তখন তিনি আরও একবার আঘাত করলেন এবং যাজক সম্পূর্ণ ডুবে গেল। এরপর হযরত সৈয়দ ফাহিম তাদের দিকে তাকালেন যারা ঐ যাজকের ব্যাপারে চিন্তা করছিলো এবং বললেন "সে যাদুবলে পানিতে চলছিলো যাতে সে তোমাদের ঈমান ধ্বংস করতে পারে। যখন আমি আমার চপ্পলগুলোকে আঘাত করলাম, তখন তার জাদু ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে ডুবে গেল। মুসলমানরা যাদু ব্যবহার করে না এবং আল্লাহ তাআলা কাছ থেকে কারামাত চেয়ে নেয়াকে লজ্জাজনক মনে করে।“ তিনি তার কারামত দিয়ে যাজকের যাদু ভেঙে দিয়েছিলেন।

আব্দুল ওয়াহাব এফেন্দী ১৯৬৩ সালে মারা যান এবং তিনি রিফাত বেই এর পিতা ছিলেন। রিফাত বে ছিলেন একজন সাবান প্রস্তুতকারক। আব্দুল ওয়াহাব এফেন্দি বলেন, "যখন আমি এরজুরুমে মাদ্রাসায় পড়াশুনা শেষ করেছিলাম, তখন আমি আরো অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলাম। বলা হয় যে, আমি যে মহান গবেষককে খুঁজছিলাম তিনি ছিলেন আব্দুল জলিল এফেন্দি, যিনি বিটলিসে বসবাস করতেন। আমি বিটলিসে তার কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল যে তিনি চলে গেছেন এবং ভোয়ান থেকে তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি ধৈর্য ধরতে না পেরে ভোয়ানে গেলাম এবং জানলাম যে আমি তাকে শাহবানিয়া মসজিদে মুকসের শায়খ হযরত সৈয়দ ফাহিম যিনি সম্প্রতি ভোয়ানে এসেছেন তার সাথে পাবো। আমি তাঁকে মুকসের শাহবানিয়ার মসজিদে পেলাম। তিনি মিম্বরে কথা বলছিলেন এবং প্রত্যেকে তার বক্তব্য থেকে উপকৃত হচ্ছিলেন। আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দেখলাম যে সবাই আদবের সাথে বসে আছে, তাদের মাথা ছিল অবনত। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে উজ্জ্বল চেহারার ও ভদ্র একজন ব্যক্তি উঁচু একটি জায়গায় বসেছিল। প্রত্যেকে আদবের সাথে তার দিকে মুখ করে বসেছিল। আমি ভেবেছিলাম এই বিস্ময়কর ব্যক্তিটি অবশ্যই আব্দুল জলিল এফেন্দি হবেন। কিন্তু ঐ মূহুর্তে এমন কেউ ছিল না যাঁর কাছে আমি তার

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কারণ সকলেই মাথা নিচু করে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ একটা যুবক আমার কাছে এসে বলল আমি কাকে খুঁজছি। হযরত আব্দুল জালীলের কথা উল্লেখ করার পর, সে পিছনের সারিতে মাথা নত করে বসে থাকা একজন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বলল, 'উনি ওখানে। যদি আপনি চান তবে বসতে পারেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম বক্তাটি কে? 'হযরত সৈয়দ ফাহীম', যুবকটি বলল, যাকে আমি অনেক বছর পর সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দি হিসেবে জানলাম। একটু পরেই আযান দেয়া হল। সুন্নাত নামাজ আদায় করা হলো। হযরত সৈয়দ ফাহীম ইমামতি করলেন। আমরা সবাই কাতার সোজা করে দাড়ালাম। যখন ইমাম সাহেব 'আল্লাহু আকবার'-তাকবীর বললেন, তখন আমরা, পুরো জামায়াত কাঁপতে লাগলো যেন বিদ্যুতের শক দেয়া হয়েছে। তারপর থেকে ৬০ বছর পার হয়েছে। যখনই আমি স্মরণ করি যে ওই ইমাম তাকবীর বলছেন, তখনই আমি কাঁপতে থাকি এবং আমার হৃদয়ে এক উত্থান অনুভব করি যেমনটি সেদিন হয়েছিল।"

হযরত সৈয়দ ফাহিমের কারামত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদার মাত্রা সঠিকভাবে মাপা বা বর্ণনা করা যায় না। তাঁর সর্বাধিক সুস্পষ্ট কারামত হলো আরিফ[১] এর উপর পরিপূর্ণ

১। একজন মহান ওলী যিনি আল্লাহ তা'আলার সত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে সকল জ্ঞান অর্জন করেছেন। মর্যাদার দিক বিবেচনা করে আরিফ এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল কামিল।একজন আরিফ কামিল যিনি এই জ্ঞান তাঁর শিষ্যদের হৃদয়ে ঢেলে দিতে পারেন তাকে "মুকাম্মিল" বলা হয়।
জ্ঞান অর্জন করা, ওলী মুকাম্মিল হওয়া যেমনটি ছিলেন হযরত আব্দুল হাকিম এফেন্দি। "প্রভাবের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা প্রমাণ করে কারণ নিঁখুত হওয়া।"

হযরত সৈয়দ ফাহিম আল-আরওয়াসী ইসলামের একজন মহান আলেম এবং সুফিইয়্যা আল আলিয়্যা[১] দের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি সিলসিলাত আল-আলিয়্যাতে ৩৩তম ছিলেন। তিনি সৈয়দ ত্বহা আল হাক্করী এর থেকে পরিপূর্ণ সোহবাত অর্জন করেন। ১২৬৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৩ সালে সৈয়দ ত্বহা এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি নিয়মিত তাঁর ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ সালিহ এর সাথে দেখা করতে যেতেন যিনি ১২৮১ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৪ সালে ইন্তেকাল করেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আব্দুল হাকিম এফেন্দী ও তাহা-আল হাক্করী এর জীবনী পড়ুন। তাঁর বাবা ছিলেন মোল্লা আব্দুল হামিদ এফেন্দি।

তাঁর দাদা ছিলেন সৈয়দ আব্দুর রহমান, যিনি সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির দাদা ছিলেন। আব্দুল হামিদ এফেন্দি হলেন মোল্লা সফিউদ্দিনের নাতি যিনি সৈয়দ ফাহিম এফেন্দির ভাই ছিলেন এবং তিনি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ ফাহিম এফেন্দির ৯ পুত্র এবং ৪ মেয়ে ছিল:

১। রাশেদ এফেন্দীর এক ছেলে যার নাম মুহাম্মদ বাকির এবং এক মেয়ে ছিল যার নাম আয়েশা হানিম। আয়েশা হানিম আব্দুল হাকিম এফেন্দীর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন।

২। মুহাম্মাদ আমিন এফেন্দী তাঁর ভাইদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি একজন গবেষক, ধার্মিক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। হিযাজ থেকে ফিরে আসার পর তিনি তূর-ই সীনাতে ইন্তেকাল করেন। ফাতিমা নামে তার একটি মেয়ে ছিল।

৩। মুহাম্মদ মাসুম এফেন্দী ছিলেন একজন জ্ঞানী ও খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি আব্দুল হাকিম এফেন্দির পূর্বেই আরওয়াসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে আব্দুল হাকিম এফেন্দি ১৯৫৭ সালে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। তিনি সংসদে যোগ দেওয়ার আগেই ইস্তানবুলে ইন্তেকাল করেন এবং তাকে এদির্নেকাপি কবরস্থানে দাফন করা হয়। ত্বহা এফেন্দীর দ্বিতীয় পুত্র যিনি ছাতাক শহরে বসবাস করতেন, তিনি ১৪০০ হিজরীতে মক্কায় হজ্ব পালনের সময় মারা যান। তাঁর পুত্রগণ হলেন অর্জুমান্দ, আতাউল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ও আন্দার এফেন্দি। তাঁর তিনজন কন্যাও ছিল। তাঁর তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদ আমীন গারবী ইফেন্দী ছিলেন ইব্রাহীম আরওয়াস বেগের জামাতা। তার ছেলে মুরাদ ও হামিদ এফেন্দি ইস্তানবুলে আছেন। তাঁর চতুর্থ পুত্র বাকির এফেন্দী ১৩৯৯ হিজরীতে কোনিয়ায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর চার সন্তান। তাঁর পঞ্চম পুত্র সেলিম এফেন্দি ১৩৯২ হিজরীতে অরওয়াসে মারা যান। তার পুত্র জয়নাল আবেদীন এফেন্দি ইস্তানবুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর ষষ্ঠ পুত্র সালাহ উদ্দিন ইফেন্দী ১৯৩৯ সালে মারা যান। তার পুত্র হলেন ইয়াহিয়া এবং তার

কন্যা সাহাবাত ও মুযায়্যান। তাঁর সপ্তম পুত্র ইব্রাহীম এফেন্দী। তাঁর অষ্টম পুত্র বদরুদ্দিন এফেন্দি এবং তার পুত্ররা হলেন হাবিব, মুহিব এবং ইরফান ইফেন্দী।

৪।মুহাম্মদ সিদ্দিক এফেন্দি ভোয়ানের মুফতি থাকাবস্থায় আর্মেনিয়ানদের দ্বারা শহীদ হন। তাকে ভোয়ানের গুরপিনার শহরের আশায়ী খায়মায এ দাফন করা হয়। তার পুত্র ফাহমি এফেন্দী ও মাশুক এফেন্দী গুরপিনার শহরের ইমাম।

১। তাসাউফের জ্ঞানে পারদর্শি ব্যক্তিবর্গ। যাদের মর্যাদা অনেক উঁচু। আউলিয়াগণ

৫। সৈয়দ হাসান এফেন্দি ১৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৮ সালে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তার তিন পুত্রের মধ্যে নাজিমুদ্দিন এফেন্দি ১৯৫৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ রশিদ এফেন্দি ১৯৪৫ সালে এবং সিদ্দিক এফেন্দি ১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। প্রথম সন্তানের তিন পুত্র, দ্বিতীয় সন্তানের এক ছেলে-সাইদ এফেন্দি এবং তৃতীয় সন্তানের ছিল চার পুত্র। মুহাম্মদ রশিদ এফেন্দি হিজরেত হানিমের স্বামী ছিলেন।

৬। মোল্লা হুসেইন এফেন্দী ছিলেন ধার্মিক কাশিম এফেন্দীর পিতা, যিনি ভোয়ানের প্রাক্তন মুফতি ছিলেন এবং শামসুদ্দিন ও ইহসান এফেন্দির পিতা ছিলেন।

৭। মাজহার এফেন্দি। তাঁর পুত্রের নাম মাজহার, তার পুত্রের নাম আব্দুল আহাদ এবং তার পুত্র মুহাম্মদ নূরী, বাহজাত, সারওয়াত, ফাতিহ এবং নাজদাত এফেন্দি।

৮। মুহাম্মদ সালিহ এফেন্দী। তাঁর ছেলে মাজহার এফেন্দি।

৯। নিজামুদ্দিন এফেন্দি। তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনের ঘরে দুজন সন্তান ছিল। সদরুদ্দিন এফেন্দি ও হিজরেত হানিম। ১৩৯৩ হিজরীতে সদরুদ্দিন এফেন্দি দিয়ারবাকিরে ইন্তেকাল করেন। তাকে ভোয়ানে দাফন করা হয়েছিল। তার চারজন সন্তান ছিল, সবাই তার দ্বিতীয় স্ত্রীর। তাদের মধ্যে একজন ওয়াহবি এফেন্দি ইস্তানবুলের ছেমবেরলিটাশ এ কৃষিবিদ ছিলেন। নাসীবা হানিম ছিলেন সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট হায়াতি ছিফটলিক বেগের স্ত্রী। আসিয়া হানিম এর স্বামী হলেন আবদুর রহমান ইকিনজি যিনি ইসলাম প্রচার করতেন। সারিয়া হানিম ভোয়ানে থাকেন। সাঈদ এফেন্দী হিজরত হানিম এর পুত্র এবং সম্মানিত কাসিম এফেন্দী হিজরত হানিম এর চার জামাতার মধ্যে একজন। দ্বিতীয়জন হলেন আইদিন বেগ, যিনি রুকিয়া হানিমের ছেলে এবং হযরত আব্দুল হাকিম এফেন্দির ভাতিজা। তৃতীয় জামাতা হলেন ফার্মাসিস্ট তার নাম ফাতিহ ইলমিয বেগ। তিনি ফাতিহতে কুমরুলু ফার্মেসির মালিক ছিলেন। চতুর্থ জামাতা হাবিব এফেন্দী।

হুসেইন ও আমিন পাশা হলেন সৈয়দ ফাহিম এফেন্দীর দুইজন জামাতা। তাঁর তৃতীয় মেয়ে এসমা হানিম এর তিন পুত্র, তাদের নাম শাওকি, ফারুক ও নবি।

সৈয়দ ফাহিম এফেন্দী কুদ্দিসা সিররুহ ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন আব্দুল হাকিম এফেন্দি, যিনি ছিলেন একজন ওলীয়ে কামিল। সৈয়দ ফাহীম এফেন্দী ১৩০০ হিজরীর ১৭ জমাদিউস সানী (এপ্রিল, ১৮৮৩ সাল) তারিখে লিখিত চিঠিতে লিখেছেন:

“আমার প্রিয়, সম্মানিত সৈয়দ ইবরাহিম ও সৈয়দ ত্বহা! আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উভয়কে রক্ষা করুন! আমি আপনাদের জন্য অনেক দোয়া করি। আপনারা জানেন যে আপনাদের ভাই সৈয়দ মোল্লা আব্দুল হাকিম গত শরৎকালে এখানে ছিলেন এবং অধ্যয়ন শুরু করেছেন। এই অধম যত্নসহকারে এবং আমি যা বলেছি তা পরীক্ষা করার মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সেও আমার মতো তার ব্যক্তিগত অধ্যয়নে এবং পাঠের সময় খুবই মনোযোগী ও দুর্দান্ত। পড়াশুনা ছাড়া আর অন্য কোন কাজে ব্যয় করার মতো সময় আমি তার জন্য রাখিনি। এখন সে সমসাময়িক পদ্ধতি অনুযায়ী সব বই সম্পন্ন করেছে। আমি আমার শিক্ষকের কাছ থেকে যেভাবে স্নাতক সম্পন্ন করেছি ঠিক একইভাবে আমি তাকে পদ্ধতিগত বিজ্ঞান, ফিকহ ও হাদীসে স্নাতক সম্পন্ন করিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে তাকে আপনাদের ভাই হিসেবে বিবেচনা করবেন না। ইলমের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করুন। আমি আপনাদের ভালোর জন্য এই চিঠি লিখছি। এ ছাড়া ইলমের অপমান করা মানে আল্লাহ তায়ালাকে অপমান করা। আমার এই ছোট্ট চিঠি থেকে অনেক সচেতন হওয়ার বিষয় আছে! আস-সৈয়দ ফাহিম রহীমাহুল্লাহি তায়ালা।“

তিনি তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন: “আমার প্রিয় পুত্র! আমার চোখের মনি সৈয়দ মোল্লা আব্দুল হাকিম! আমার অগণিত দোয়ার পর, আমি তোমার কাছ থেকে কোন খবর না পাওয়ায় আমার মনে অনেক কষ্ট জমে আছে। আল্লাহ তায়ালা সব গোপন জানেন। আমি বলতে পারি যে আমার হৃদয় সব সময় তোমার সাথে আছে, তিনি অবশ্যই জানেন। কিন্তু আমার চিন্তা দূর করার জন্য তোমার উচিত ছিলো সবসময় তোমার সুবিধা অসুবিধার খবর দেয়া। এভাবে ভালোবাসার বন্ধন সচল হবে। যদি সে আমার চোখের মনি হয় এখানে ফকির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য! আমাদের শরীরের ও চারপাশের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চয়তা দিন দিন বাড়ছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হৃদয় ও আমাদের সকল ভাইদের অন্তরের নিশ্চয়তা দান করুন! আমিন। অনুগ্রহ করে আমার দোয়াগুলো আব্দুল হামিদ, হাসান ও সৈয়দ ইব্রাহিমকে বলবে। আমি ত্বহা এফেন্দি এবং মাজহার এফেন্দির জন্য অনেক দোয়া করি। তুমি আমার প্রতিনিধি হিসেবে আমার এই দোয়া তুমি যার জন্য উপযুক্ত মনে করো তাকে বলবে। এছাড়াও যারা নেহরীতে আছে তাদের অবস্থা, তারা ভাল আছে না খারাপ আছে, এ সম্পর্কে লিখো। আমরা নেস্টোরিয়ানদের অত্যাচার সম্পর্কে শুনেছি এবং তারা যে চারশত মুসলিম হত্যা করেছে তাও জেনেছি। আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চায় যে তারা কি করেছে এবং তারা কেন এমন করেছে। ওয়াস সালাম। ৩ জানুয়ারি, ১৩০১। তোমার দোয়াপ্রার্থী, পাপী সৈয়দ ফাহিম।“

সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দীর তাঁর ভাই ত্বহা এফেন্দির কাছে লিখিত একটি চিঠি:

“মুবারকপূর্ণ বাগানের তরুণ বীজ, ত্বহা এফেন্দী! আপনার লেখা সুন্দর চিঠি আমি পেয়েছি। আমরা এটা শুনে খুব খুশি হয়েছি যে আমার প্রিয় পুত্র এবং তার সঙ্গীরা নিরাপদ আছে এবং এটি আমাদের সত্যিকারের মাতলুব (প্রিয়) এর জন্য আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ তৈরি করেছে। একটি লাইন:

জীবন থেকে বসন্ত চলে যাওয়াটা আমার জন্য না।

আল্লাহ তায়ালা আপনার এই তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দিন। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘পথপ্রদর্শকের কল্পিত ছবি হুবহু তার মতোই হওয়া জরুরি কিনা’।

আমার প্রিয় পুত্র, এটা একই রকম হওয়া জরুরী নয়। রাবিতা এর উদ্দেশ্য হলো দৃষ্টি বা মনোযোগের পরিবর্তন করে কল্পনার দিকে নিয়ে যাওয়া। এটা কল্পনার চিন্তা করা এবং কল্পিত ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য আশা করা। কল্পিত ব্যক্তিকে জানা বা চিনতে পারা জরুরি নয়। এটিকে কল্পনা বা চিন্তার ফল হিসেবে ধরে নেয়া যায়। বেশিরভাগ সময়ই আত্মা শরীরের আকারে এবং অন্যান্য রূপে দেখা যায় কারণ এটি সংযুক্ত দেহের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেরূপ এবং যে অবস্থাতেই দেখা যাক না কেন, যদি কল্পিত বিষয়টি সুন্দর, মিষ্টি এবং আনন্দদায়ক দেখা যায় এবং যদি এটি ভালবাসা ও (অন্তরের) শান্তি বৃদ্ধি করে, তবে বুঝতে হবে যে এটি রহমানী (আল্লাহর পক্ষ হতে)। কল্পনার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টা করুন। এর মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিন। যদি কল্পিত বিষয়টি কুৎসিত এবং ভয়ানক হয় তাহলে বুঝতে হবে এটি শয়তানী দৃষ্টি। এর দিকে তাকাবেন না, এটিকে চলে যেতে দিন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, যিকির করার সময় অন্য যা কিছু মনে আসে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে কী করতে হবে। হে আমার প্রিয় বৎস! এই সকল চিন্তাধারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে দুটি উপায়ে চলে যাবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম উপায় হলো, রাবিতার সময় দৃশ্যমান কল্পনার দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দিতে হবে, অন্যটি হলো বেশি বেশি যিকির করতে হবে, পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়ে ও নিজ ইচ্ছায় অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাবিতা করতে হবে। ১৮ অক্টোবর ১৩০৮।“

১১- সৈয়দ ত্বহা আল হাক্কারি এর জীবনি

(মাওলানা খালিদ আল বাগদাদী এর একজন শিষ্য)

সৈয়দ ত্বহা বিন আহমাদ বিন ইব্রাহীম (কুদ্দিসা সিররুহ) মহান আউলিয়া কেরামদের একজন ছিলেন। তিনি আব্দুল কাদির জিলানীর বংশধর। তিনি মওলানা জিয়া উদদীন খালিদ আল-বাগদাদী এর একজন যোগ্য খলিফা ছিলেন এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন।

তাঁর দুইজন সন্তান ছিলো, তাদের একজনের নাম উবাইদুল্লাহ এবং আরেক সন্তানের নাম আলাউদ্দিন। আলাউদ্দিন এফেন্দীকে শামযিনানের হিজনে গ্রামে দাফন করা হয়। তাঁর নাতি মুহাম্মদ সিদ্দিক এফেন্দি মরিয়ম হানিমকে তার স্বামী মুস্তফা এফেন্দির মৃত্যুর পর বিয়ে করেছিলেন। মরিয়ম হানিমের ঘরে ত্বহা এফেন্দি জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ ত্বহা এফেন্দির এক ছেলে মুহাম্মদ সিদ্দিক এফেন্দী, ইরাকি সরকারের ডেপুটি মোসুল থাকাবস্থায় বাগদাদে মারা যান। অটোমান সাম্রাজ্য যখন বিভক্ত হয়ে যায় তখন তাঁর অন্য দুই পুত্র মুহাম্মদ সালিহ দারু ও মাজহার এফেন্দি তাদের সম্পত্তি নিয়ে ইরাকে বসবাস করতেন। তারা ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ সালে তুরস্কে স্থানান্তরিত হন।

ইসলামের ত্রয়োদশ শতাব্দীর কুতুব হযরত মাওলানা খালিদ ভারতে ছিলেন, যেখানে তিনি গোলাম-ই আলী আব্দুল্লাহ আদ-দেহলবীর উপস্থিতিতে সম্মানিত হন। তিনি তার উপযুক্ত মর্যাদা (ফজল) ও পরিপূর্ণতা (কামালিয়াত) অর্জনের পর আল্লাহ তা'আলার সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বাগদাদে বাড়ি ফিরে আসেন। যেহেতু সমগ্র বিশ্ব মাওলানার হৃদয় থেকে উদ্ভূত আলো (আধ্যাত্মিক আলো) দ্বারা আলোকিত হয়েছিল, তখন সৈয়দ আব্দুল্লাহ, যিনি অধ্যয়নকালে তাঁর বন্ধু হয়েছিলেন, তিনি সুলাইমানিয়ায় তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সোহবত লাভ করে তার যোগ্য খালিফা (খলিফা আল-আকমাল) হয়েছিলেন। তিনি হযরত মাওলানাকে তার ভাতিজা সৈয়দ ত্বহার অসাধারন গুণাবলীর কথা বলেছিলেন। মওলানা তার পরবর্তী সফরের সময় ভাতিজাকে নিয়ে আসার আদেশ দেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ হযরত মাওলানার নির্দেশ মোতাবেক সৈয়দ ত্বহাকে বাগদাদে নিয়ে যান। হযরত মাওলানা সৈয়দ ত্বহাকে দেখা মাত্রই তাকে দ্রুত হযরত আব্দুল কাদির জিলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে গিয়ে ইস্তিখারা (স্বপ্নের দ্বারা বর্ণনা করা) করার আদেশ করলেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লহি আলাইহি তাকে অবগত করলেন যে তাঁর তরীকত সবচেয়ে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে সময়ে তার দরবারে কোনো বিশেষজ্ঞ নেই এবং মওলানা তার সময়ের বিশুদ্ধ প্রদর্শক ছিলেন, এবং তাকে তৎক্ষণাৎ মাওলানার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই আধ্যাত্মিক আদেশের ভিত্তিতে, সৈয়দ ত্বহা দুই সুলূক অর্থাৎ, আশি দিন মওলানার অধীনে অধ্যয়ন করেন এবং পরে বারদা সুর শহরে গমন করেন। যখন সৈয়দ আবদুল্লাহ মারা যান, তখন তিনি নেহরীর শহরে চলে যান এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া শুরু করেন। বেয়াল্লিশ বছর তিনি সেখানে তাঁর শিষ্যদেরকে ফয়েয দিয়েছেন। সমগ্র স্থান হতে তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা দীক্ষা নেওয়ার জন্য তার কাছে পতঙ্গের মত জড়ো হতে থাকে।

তিনি তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া একটি ছোট্ট বাড়িতে ইবাদত পালন করতেন। অন্য সময়ে তিনি আকলী (বিজ্ঞান) ও নকলী (বর্ণনাকৃত) বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি দুনিয়াবি এবং রাজনৈতিক কোন কাজে সহযোগিতা করতেন না, তাঁর উপস্থিতিতে দুনিয়া ও রাজনৈতিক বিষয়ে কোন আলোচনাও করা যেত না। তিনি প্রতিদিন মাকতুবাত পড়তেন। তিনি সবার অন্তরে উপদেশ (সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং কারও প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ বা শত্রুতা না করে ধৈর্য্যশীল হওয়া পাশাপাশি সরকারের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারকে সাহায্য করা) অঙ্কন করে দিতেন। ১২০০ বছর ধরে তাঁর সকল শিক্ষকরা সর্বদা ইসলামের এই নৈতিকতা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তারা সবাই রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাদের কখনো সরকার বিরোধী বিদ্রোহ করার কথা শোনা যায়নি, ইতিহাসে এমন কুৎসিত কোন ঘটনা নেই। কিছু বিদ্বেষী এবং ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরা পার্থিব সম্পত্তি-খ্যাতিলিপ্সু সামন্তবাদী ও অন্যদের মুর্খ, জঘন্য ও নির্বুদ্ধি আচরণগুলো দ্বারা এই বরকতপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টার অভিযোগ আনার চেষ্টা করেছিল যাতে এই মর্যাদাবান লোকদের কয়েকজনকে অন্ধকূপে প্রেরণ করা যায়, এ সকল লোকেরা জ্ঞানের এই উৎসগুলো এবং সুন্দর নৈতিক মূল্যবোধগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেনি, কারণ তারা এগুলো থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি, আইন ও বিচার তাদেরকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত করেছিল এবং তাদের সাথে অশোভন আচরণের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলো। ইতিহাস ও বিভিন্ন বইগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে এমন নৃশংস তীরগুলি হযরত সৈয়দ ত্বহা এর উপর প্রায়ই আঘাত করেছিলো এবং এই দুর্ভাগা ব্যক্তিরা এই জ্ঞান-নৈতিকতার সূর্যকে কল্পিত ও কুৎসিত অপবাদ দিয়ে মলীন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যেহেতু সত্য লুকানো যায় না, তাই যে সকল সৌভাগ্যবান ও সতর্ক

মানুষরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি সাধারণ কেউ নন; বরং হিদায়তের প্রদর্শক এবং তার প্রদর্শিত পথ সত্য, তারা এসব অপবাদে বিশ্বাস করে বোকা হয়নি, তাকে ভালোবেসেছিলো এবং তার প্রশংসা করতো। তার হৃদয়ের নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্তহীন সুখ অর্জন করেছিল।

হযরত সৈয়দ আব্দুল হাকিম আরওয়াসীর দাদা সৈয়দ মুহাম্মদও তাদের মধ্যে একজন যারা ভোয়ান থেকে এসেছিলেন এবং এই উৎস থেকে ফয়েয লাভ করেছিলেন। সৈয়দ ত্বহা ভোয়ানে থাকা অবস্থায় সৈয়দ মুহাম্মদের ঘরে অবস্থান করতেন। সিবগাতুল্লাহ এফেন্দি, যিনি সৈয়দ মুহাম্মদের ভাই লুৎফির পুত্র ছিলেন, তিনি হিযান থেকে ভোয়ানে এসেছিলেন এবং সৈয়দ ত্বহার সান্নিধ্যে ছিলেন। পরে তিনি হিজানে ফিরে যান, যেখানে তার পিতা বসবাস করতেন এবং সেখানে তিনি খুব বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর শত শত শিষ্যদের সাথে নিয়ে প্রতি বছর নেহরি যেতেন। এমনি কোনো এক ভ্রমণকালে তিনি তাঁর চাচা মোল্লা আব্দুল হামিদ এফেন্দির ছেলে সৈয়দ ফাহিমকে নিয়ে যান, যিনি তখন যুবক বয়সী ছিলেন। হযরত সৈয়দ ফহিম রাত্রি যাপনের জন্য যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে হাক্কারীর গভর্নর কেমন ছিলেন? মালিক বলেন যে তিনি দিনরাত মাতাল হয়ে থাকেন। সারা রাত সৈয়দ ফাহিম ভাবলেন যে, এমন এক দেশে থাকা কি ঠিক হবে যেখানকার গভর্নর সবসময় মাতাল থাকে। পরের দিন তারা রাসুলান গ্রামে আসলেন, সিবগাতুল্লাহ এফেন্দি সেখানকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করলেন যে গভর্নর কেমন মানুষ। তারা বলল যে তিনি একজন ভালো মানুষ। সাইয়্যেদ ফাহিম যোগ করেন, “আমার ভাই! সে একজন মাতাল। কেন তাকে একজন ভাল ব্যক্তি বলা হল?

যখন তারা নেহরির জন্য বাশখাল ছেড়ে চলে যাযন, তখন সৈয়দ মুহাম্মদ এফেন্দী সৈয়দ ফাহীমকে বললেন, "আমার প্রিয় ফাহিম! সৈয়দ ত্বহা, যার উপস্থিতিতে তুমি বেলায়ত[১] এর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে একজন মহান ব্যক্তি হতে পারবে, তার কাছ থেকে পরিপূর্ণতা, ফয়েয অর্জন না করা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে যেও না।“ তারা নেহরি থেকে প্রস্থান করার সময় সবাই মসজিদ সামনে দাঁড়িয়ে হযরত সৈয়দ ত্বহা এর হাত চুম্বন করেছিলেন। সৈয়দ ফাহিমকে পিছনে দেখে সিবগাতুল্লাহ এফেন্দী পিছনে এসে হযরত সৈয়দ ত্বহা এর কাছে সৈয়দ ফাহিমের ফিরে আসার বিষয়ে অনুমতি চাইলেন। তিনি সে অনুমতি দেননি বরং তাকে সেখানে থাকার আদেশ দেন। পরিদর্শকেরা রওনা দেওয়ার পরপর যখন তারা উভয়ে হাঁটছিলেন, তিনি সৈয়দ

১। বেলায়ত: ওলী হওয়ার অবস্থা।

ফাহিমকে একটি কাজ দিলেন এবং তাকে শিক্ষা দেয়া শুরু করেন। এক গরমের দিনে, তিনি তাকে যা কিছু শিখিয়েছিলেন তা সব পুনরাবৃত্তি করালেন। সৈয়দ ফাহীম তাকে শেখানো সবকিছু ঠিকঠাক পুনরাবৃত্তি করলেন, শুধুমাত্র ‘হত্তে তূলানী’ এর পরিবর্তে “হত্তে তূলী” ব্যতীত। সৈয়দ ত্বহা তাকে ভুলগুলো সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তখন সৈয়দ ফাহীম খুব ছোট ছিলেন এবং তখনও তার মাদ্রাসায় পড়া সম্পন্ন হয়নি। একদিন সৈয়দ ত্বহা মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন তখন সৈয়দ ফাহীম তাঁর নিকট আসলেন। তিনি তাঁর বরকতপূর্ণ হাত দিয়ে তাকে কাছে আসার ইশারা করলেন এবং সৈয়দ ফাহীম তাঁর নিকট আসলেন। তিনি বললেন, “তুমি খুব মেধাবি একজন ছাত্র। তোমার ‘মুতাওয়াল’ পড়া উচিত।“ সৈয়দ ফাহীম বললেন, “মুহতারাম, আমার কাছে বইটি নেই। এছাড়াও, এই বইটি আমার দেশে পড়ানো হয়না।“ সৈয়দ ত্বহা তাকে তাঁর নিজের বইটি দিলেন। হযরত সৈয়দ ফাহীম তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য আবিরী, বুলানিক ও মুশ গ্রামে যান, সেখানে তিনি মোল্লা রাসূলের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ মুতাওয়াল অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বেলায়তের উচ্চ স্তর অর্জনের জন্য বছরে দুবার নেহরি, অর্থাৎ শামদীনানে যেতেন। প্রতিটি সফরের সময় তিনি সৈয়দ ত্বহার বিভিন্ন সৌজন্যমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সম্মানিত হতেন। উদাহরণস্বরূপ, একদিন দুপুরে সৈয়দ ত্বহা মসজিদের অভ্যর্থনা কক্ষে মুসল্লিদের সামনে মাকতুবাত পড়ছিলেন। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে সৈয়দ ফাহীম শুনছিলেন। হযরত সৈয়দ ত্বহা বই থেকে তাঁর মাথা উঠিয়ে বললেন, “মোল্লা ফাহীম। এখন কি পৃথিবীতে কোন মুর্শিদ আছে?” সৈয়দ ফাহীম উত্তর দিলেন, “বর্তমান মুর্শিদের মত কেউ আসেনি।“ তার উত্তরে সৈয়দ ত্বহা বইটি বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সৈয়দ ফাহিম পরিপূর্ণতা (কামাল) ও পুর্ণ যোগ্যতা (তাকমিল) অর্জন এবং তাঁকে খিলাফত আল-মুতলাকা (শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি) দ্বারা অন্যদের নির্দেশনা প্রদানের অনুমতি দেওয়ার পর, তিনি বলেন যে তিনি এই দায়িত্বের জন্য যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না। সৈয়দ ত্বহা তাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং তাকে তার জন্মস্থান আরওয়াসকে সম্মানিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈয়দ ফাহিম যখন ঐ স্থান ত্যাগ করে নেহরি পর্বতের উপরে আরোহণ করছিলেন, তখন সৈয়দ ত্বহা তাকে ডেকে তার উপস্থিতিতে তার বই থেকে

পুরাতন চিঠিগুলো দেখিয়ে বললেন, “এগুলো কি তোমার ইখলাস ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল না? কেন তুমি এই দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?” সৈয়দ ফাহিম আগে যেমন করে প্রতিবছর নেহরি পরিদর্শনে যেতেন, খিলাফত আল-মুতলাকা অর্জন করার পরও তিনি প্রতি বছর নেহরি পরিদর্শনে যেতেন।

১২৬৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৩ সালে হযরত সৈয়দ ত্বহা ইন্তেকাল করেন। এক বিকেলে, তিনি গাছগুলোর মাঝে বসে ছিলেন তখন তাকে দুটি চিঠি দেওয়া হয়। তিনি তাঁর জামাতা আব্দুল আহাদ এফেন্দিকে চিঠি পড়তে দেন। তিনি মন্তব্য করলেন, “এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।“ তাঁর জামাতা বললেন, “হুজুর দামেস্ক থেকে আসা এই চিঠি দিয়ে আমরা কি করবো? সেদিন খতমে খাজা[১] পড়ার পরে সৈয়দ ত্বহা তাঁর ঘরে গেলেন, যেখানে তিনি বারো দিন অসুস্থ হয়ে ছিলেন। তাঁর বরকতপূর্ণ আত্মা আসরের নামাজের সময় রফিকে আ’লা[২] তে পাড়ি জমান। তাঁর হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাহত হয়ে পড়ল। তিনি অসুস্থ

১। খতমে খাজা: নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মুর্শিদ ও তার শিষ্যরা নিরবে পাঠ করে। এরপর মুর্শিদের সিলসিলায় যে সকল আওলিয়াগণ আছেন তাদের নাম উল্লেখ করা হয় এবং যা পাঠ করা হয় তার সওয়াব তাদের রুহে জন্য বকশিশ করা হয়, যাদের কাছ থেকে ফয়েয ও মারিফাত চাওয়া হয়।
২। রফিকে আ’লা: জান্নাতের সর্বোচ্চ অবস্থা, যা নবীর শেষ ইচ্ছা হিসেবে আবেদন করা হয়েছিল।

থাকাবস্থায় চাচ্ছিলেন যে তাঁর ভাই শেখ সালিহ যিনি বারদা সুর শহরে বাস করতেন তিনি যেন নেহরী শহরে আসেন। তিনি তাঁর ভাই সৈয়দ সালিহকে খতমে খাজা ও তাওয়াজ্জুহ আদায় করার আদেশ দেন। “আমার ভাই সালিহ একজন নিখুঁত মানুষ। প্রতিটি মানুষের মাথা তার ডানার নিচে,” তিনি বলেছিলেন। হযরত সৈয়দ ফাহীম শেখ সালিহকে তার শায়খ-ই-সুহবা[১] হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১২৮১ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৪ সালে শেখ সালিহ এর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি বছরে দুবার নেহরি সফর করতেন এবং শেখ সালিহ এর মৃত্যুর পরেও তিনি ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ সালে নিজের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই রীতি ত্যাগ করেননি।

সৈয়দ মুহাম্মাদ সালিহ ব্যতীত সৈয়দ ত্বহা হাক্কারীর সবচেয়ে অনুগত শিষ্য ছিলেন সৈয়দ সিবগাতুল্লাহ আরওয়াসী। তাঁর অনুসারীগণ কুফরাভী মুহাম্মদ। সৈয়দ সিবগাতুল্লাহ তাঁর শিষ্যদের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন যেমন গাউস-উল-আজম এবং গাউস-ই হিজানী। ১২৮৭ হিজরীতে তিনি মারা যান। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আব্দুর রহমান তাহী নূরশীনী উস্তাদ-ই আযম ও সাঈদা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উনিশ জন: ফাতহ-উল্লাহ ওয়ারকসানীসি, আব্দুল্লাহ নুরশীনী, মোল্লা রশিদ নুরশীনী, আব্দুল কাহহার যিনি আল্লামা মোল্লা হালিল সিরিদীন এর নাতি ছিলেন, আব্দুল কাদির হিজানী, সৈয়দ ইব্রাহীম আসিরদী, আব্দুল হাকিম ফারসাফী, ইব্রাহীম নিনকী, তাহির আবারী, আব্দুল হাদী, আবদুল্লাহ হুরুসী, ইব্রাহীম চুকরুশী, হালিল চুকরুশী, আহমাদ তাশকাসানী, মুহাম্মাদ সামী এরজিনজামী, মুস্তাফা, সুলাইমান, ইউসুফ বিটলিসী এবং আব্দুর রহমান তাহী ১৩০৪ হিজরীতে মারা যান। ইবরাহীম চুকরুশী তাঁর বাণীগুলো "ইশারাত" নামক বই এ সংকলন করেছিলেন। এটি খুবই নির্ভরযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। ফাতুল্লাহ ওয়ারকানিসি ১৩১৭ হিজরীতে মারা যান। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, আবদুর রহমান তাহী এর পুত্র মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন নূরসীনি ১৩৪২ হিজরী মোতাবেক ১৯২৪ সালে বিটলিসে মারা যান। তাঁর বই "মাকতুবাত" এর মধ্যে একশো চৌদ্দটি চিঠি রয়েছে। তাঁর তেরো জন শিষ্যদের মধ্যে মুহাম্মদ আলাউদ্দিন উহীনীই প্রথম তাঁর শিক্ষকের চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় জন হলেন আহমদ হাযনাভী। মুহাম্মদ মাসুম, সৈয়দ মুহাম্মদ শরীফ আরাবকেন্দী ও আব্দুল হাকিম এফেন্দি আদিয়ামান তাঁর শিষ্য ছিলেন। শেষেরজন ১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৮ সালে মারা যান। মুহাম্মদ রশীদ এফেন্দি ছিলেন তাঁর পুত্র।

১। শায়খ-ই সুহবা: একজন ওলীর দ্বিতীয় মুর্শিদ যাকে তিনি নিজের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হিসেবে জানেন এবং নিজের মুর্শিদের মৃত্যুর পর যার সোহবাত গ্রহণ করা হয়।

১২- হুসাইন হিলমি বিন সাইদ এফেন্দির জীবনী
(সৈয়দ আব্দুল হাকিম আরওয়াসি এর একজন শিষ্য)

১৩২২ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ সালের (১৩২৯ হিজরী) ৮ই মার্চ বসন্তের এক সুন্দর সকালে ইস্তানবুলের এইয়ুব সুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাঈদ এফেন্দি এবং পিতামহ ইব্রাহীম ইফেন্দি বুলগেরিয়ার লোফজা এর নিকট টেপোভা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তার মা আইশা হানিম এবং নানা হুসেইন আগা লোফজার বাসিন্দা ছিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে "৯৩" এর যুদ্ধ চলাকালীন (১২৯৫ হিজরী, ১৮৭৮ সাল) সাঈদ এফেন্দি ইস্তানবুলে স্থানান্তরিত হন এবং ভেজিরটেক্কেতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, সেখানে তিনি বিয়ে করেন। যুদ্ধ ও অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট দুঃখ-কষ্টের কারণে তিনি স্কুলে যেতে পারেননি এবং পৌরসভাতে ওজন নিয়ন্ত্রণের একজন কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন, যেখানে তিনি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছিলেন। তিনি ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত মসজিদে খ্যাতনামা গবেষকদের মাহফিলগুলোতে নিয়মিত যোগ দিতে লাগলেন এবং ফলে ধর্মের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি নিজের মেধা থেকে চারটি গাণিতিক সমস্যা সমাধানে এত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে উঠতেন।

হুসেন হিলমি এফেন্দি পাঁচ বছর বয়সে আইয়ুব মসজিদ এবং বোস্তান ওয়্যারফের মাঝে অবস্থিত মিহর-ই-শাহ সুলতান স্কুলে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি দুই বছরে কোরআন আল-কারিম শেষ করেছেন। সাত বছর বয়সে তিনি রেশদিয়া নুমুনী মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন, যা সুলতান রেসাদ হান এর সমাধির নিকটবর্তী ছিল। ছুটির সময়ে তার বাবা তাকে হাকিম কুতুবুদ্দীন, কালেনদের হানে ও এবুস্সু'উদ নামক ধর্মীয় স্কুলগুলোতে পাঠাতেন এবং তার ভালোভাবে বেড়ে উঠার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। হুসেইন হিলমী এফেন্দী ১৯২৪ সালে সর্বোচ্চ সম্মাননা লাভের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেন, প্রতিটি বিষয়ে সোনার গিল্ট পুরস্কার পেয়েছিলেন, যা দ্বারা একটি বড় অ্যালবাম পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যে বছর তিনি কোনিয়া থেকে ইস্তানবুল চলে গিয়েছিলেন, তাকে হালিচওয়ালু সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল ভর্তি পরীক্ষায় চমৎকার গ্রেড সহ। একই বছর তিনি সেরা শিক্ষার্থী হিসাবে মাধ্যমিক বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। প্রতি বছর ভালো ছাত্র হিসেবে তার পদ বজায় রাখার পর, তিনি ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসেবে সামরিক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং ১৯২৯ সালে মিলিটারি মেডিকেল স্কুলের জন্য নির্বাচিত হন।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, জ্যামিতি শিক্ষক প্রত্যেক পাঠ শেষে হুসেন হিলমি এফেন্দির মাধ্যমে পাঠের পর্যালোচনা করাতেন। তার বন্ধুরা বলতো যে তারা হুসেইন হিলমীর পর্যালোচনা থেকে প্রতিটি বিষয় আরও ভাল করে বুঝতে পারতো। উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির একটি ঘটনা, একদিন ক্লাসে, "একটি সমকোণকে সমকোণ হিসেবে প্রক্ষেপণের জন্য এর যেকোনো একটি বাহু ভূমির সমান্তরাল হওয়া জরুরী ও যথেষ্ট" এই উপপাদ্যটি ব্যাখ্যা করার সময় তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। শিক্ষক ক্যাপ্টেন ফুয়াদ বেই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন, "স্যার, আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, কিন্তু দুটি ব্যাখ্যা একে অন্যকে ব্যাখ্যা করে।" ফুয়াদ বেই তখন ক্লাসের দ্বিতীয় সেরা ছাত্রের মতামত জানতে চাইলেন, যিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি বলেন, "না, স্যার, হিলমি এফেন্দি ভুল বলেছে। পাঠ্যপুস্তকেও তাই লেখা যা আপনি বলেছেন।" যখন হিলমি এফেন্দি জোর দিয়ে বললেন যে তিনি এটি বুঝতে পারছেন না, তখন ফুয়াদ বেই হিলমি ইফেন্দিকে বললেন, "দয়া করে বসে পড়ো।" এরপর বললেন, হিলমি এফেন্দী, আমরা সবাই মানুষ। সম্ভবত আজ তুমি অনেক কাজ করেছো এবং ক্লান্ত বোধ করছো। অথবা তোমার অন্য কোন সমস্যা হচ্ছে। তুমি পরে কোন এক সময় এটি বুঝতে পারবে। সুতরাং চিন্তা করো না।" রাতে সমস্ত ছাত্ররা ঘুমানোর পর পাহারাদার হিলমি এফেন্দিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন যে জ্যামিতি শিক্ষক শিক্ষক-রুমে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, নিজের কাপড় পরে নিলেন এবং দিশেহারা অবস্থায় রুমের দিকে গেলেন। ফুয়াদ বেই বললেন, "হে আমার ছেলে! আমি বাড়িতে যাওয়ার পরে একটা বিষয় চিন্তা করলাম। আমি নিজে ভাবছিলাম, 'হিলমি এফেন্দি প্রতিটি নতুন পাঠই সাবলীলভাবে পুনরাবৃত্তি করে এবং সবচেয়ে কঠিন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যা তাকে এই উপপাদ্যের মধ্যে বৈপরিত্য আছে বলতে বাধ্য করছে।' আমি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি এবং দেখেছি যে তুমি পুরোপুরি সঠিক বলেছ। পাঠ্যবইটির ফরাসি লেখক হাদামার এটি ভুলভাবে লিখেছেন এবং ইজমির উচ্চ বিদ্যালয়ের জ্যামিতি শিক্ষক আহমেদ নাজমি বেই ভুলটি দেখেননি আর আমিও অনেক বছর ধরে এটি ভুলভাবে শিক্ষা দিচ্ছি। তুমিই সঠিক। আমি তোমাকে অভিনন্দন

জানাচ্ছি। তোমার মত একজন ছাত্র পেয়ে আমি গর্বিত। আমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম যে তুমি শান্তভাবে আনন্দিত হয়ে ঘুমাও।" তারপর তিনি হিলমি এফেন্দির কপালে চুমু দিয়ে চলে গেলেন।

হিলমি এফেন্দী রোজার মাসে মিলিটারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশুনা চলাকালীন সব রোজা রাখতেন এবং নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। বড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন যিনি নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। প্রতারিত বা ইসলামের শত্রুদের ভাড়াটে কিছু শিক্ষক ছিল, তারা তার সহপাঠীদের মিথ্যাচার, অপবাদ এবং বিজ্ঞানের মিথ্যা ব্যাখ্যা দ্বারা ইসলামের প্রতি অসহযোগিতা ও শত্রু মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ভুগোল শিক্ষক আদেম নেজিহী, পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষক সাবরি, দর্শন শিক্ষক সেমিল সেনা এবং ইতিহাস শিক্ষক বাগদাদের মেজর গালিব তাদের খারাপ শিক্ষা দানে চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিলেন। কিন্তু তিনি এই শিক্ষকদের বিশ্বাস করেননি। তিনি তাদের বিষয়গুলো বেশি বেশি অধ্যয়ন করেন এবং তাদের পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পান, পাশাপাশি তাদের প্রশংসাও অর্জন করেন।

সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে যখন তিনি সিনিয়র ছিলেন, তার পিতা সাঈদ এফেন্দি মারা যান। স্কুলের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তার পিতার জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এইয়ুবের জনগণেরা জানাযায় বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমনে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

হিলমি ইফেন্দী বায়েজিদ স্কয়ারের যেয়নাব ওয়ালিদে সুলতান হলে বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যয়নকালে খুব অস্বস্তি বোধ করতেন। যখনই তিনি বায়েজিদ মসজিদে শুক্রবার জুমার নামাজে যেতেন, তিনি দেখতেন ইমামের পিছনে মুসল্লিদের মাত্র একটি কাতার হতো এবং তারা সবাই ছিল বৃদ্ধ। তিনি চিন্তিত হয়ে পরেন যে এভাবে চললে কয়েক বছর পর এখানে কোনো মুসলমান থাকবে না এবং তিনি এর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কোনোভাবেই তিনি এরকমটা হতে দিতে পারেন না। তার মন হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, কিন্তু বিদ্যালয়ে তার এমন কোনো বন্ধু ছিল না, যার সাথে তিনি এই বিষয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলতে পারেন বা তার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন।

একদিন তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে যোহর নামাজের উদ্দেশ্যে বায়েজিদ মসজিদে প্রবেশ করেন। নামাজ আদায় করার পর তিনি মসজিদের বাম পাশে কিছু মানুষকে ধর্ম প্রচার করতে দেখেন। তিনিও সেখানে বসে পরলেন। প্রচারক তার হাতে থাকা একটি পাতলা, ছোট বই থেকে ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন। যা কিছু ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল হিলমী এফেন্দি তা জানতেন, কিন্তু তিনি ঐ জায়গা ছেড়ে উঠেননি এই ভয়ে যে প্রচারক তার মনে কষ্ট পাবেন এবং ভাববেন তার ব্যাখ্যায় হয়তো তিনি খুশি হননি। বস্তুতপক্ষে, এই কথাগুলো কিছু সংখ্যক বৃদ্ধ লোকই শুনছিলেন। তিনি তার কথা সংক্ষিপ্ত করলেন এবং তার হাতে থাকা বইটি দেখিয়ে বললেন, "প্রত্যেকের কাছে এই বইটি থাকা দরকার। আমি বইগুলো বিক্রি করবো।" তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি খুব দরিদ্র। কেউ কোনো বই কিনলো না। হিলমি এফেন্দীর প্রচারকের প্রতি দয়া হলো এবং বইটি কোনো এক যুবককে দিবেন ভেবে বইয়ের দাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু যখন লোকটি পঁচিশ কুরুশ বললেন, তখন তার ভাবনাটি ছেড়ে দিলেন, কারণ তার কাছে এত টাকা ছিল না এবং বইটিও সে দামের ছিল না। তখনকার মুদ্রাগুলো খুব মূল্যবান ছিল; একজন ইমাম এবং একজন লেফটেন্যান্ট যথক্রমে ১৭ এবং ৬১ লিরা[১] করে পেতেন। বইটির মূল্য সর্বোচ্চ পাঁচ কুরুশ হওয়া দরকার ছিলো এবং প্রচারকের এতো বেশি দাম চাওয়াটাও তার কাছে অনুচিত মনে হল। "এটা আল্লাহর জন্য বিনামূল্যে দেওয়া উচিত ছিলো। তবে যদি তিনি এর উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, তাহলে তার পাঁচ কুরুশ দাম চাওয়া উচিত", তিনি অস্বীকৃতির চিন্তা করলেন। তিনি হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের অন্য দিকে গেলেন। মসজিদের ভেতরের এবং বাইরের এই অংশটিতে খুব ভীড় ছিল। ভিতরে বসা একজন বৃদ্ধ লোক কথা বলছিল। কষ্ট করে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বৃদ্ধ লোকটির পিছনে বসলেন। বৃদ্ধ লোকটি একটি বই পড়ছিল এবং মুসলমানরা কীভাবে আওলিয়াদের যেয়ারত করা উচিত তা ব্যাখ্যা করছিলেন। হিলমী এফেন্দি এই বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে শিখতে খুব আগ্রহী ছিলেন। এসব শোনার সময়, তিনি অন্য প্রচারকের কথা চিন্তা না করে পারলেন না এবং বারবার নিজেকে বলছিলেন, "নিশ্চয় যে আল্লাহকে ভালবাসে, তার অবশ্যই ধর্মীয় বইগুলিকে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিত।" ইতিমধ্যে, মসজিদে আসর নামাজ শুরু হয়ে গেল এবং বৃদ্ধ লোকটি যে বইটি পড়ছিলেন সেটি বন্ধ করে হিলমি এফেন্দীকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এটা আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন যুবক এফেন্দিকে হাদিয়া", এরপর নামাজ শুরু করলেন। যদিও এই প্রচারক হিলমি এফেন্দীকে দেখেননি, তিনি জানতেন যে হিলমী এফেন্দি তার পিছনে বসে আছে। হিলমি এফেন্দী বইটি নিলেন এবং নামাজে যোগ দিলেন। নামাজের পর

তিনি বইটির নাম দেখলেন "Râbita-I Sherifa" এবং এর নীচে লেখকের নাম "আব্দুল হাকিম"। তিনি মসজিদের একজনের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, যিনি তাকে বইটি দিয়েছেন তিনিই আব্দুল হাকিম এফেন্দী এবং তিনি প্রতি শুক্রবার এইয়ুব মসজিদে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি বায়েজিদ টাওয়ারের কাছে অবস্থিত "বেকির আ'য়া বুলুয়ু" নামক ভবনটিতে ফিরে যান, যেখানে তিনি থাকতেন।

সেদিনগুলোর সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে, তিনি বড় মসজিদে গিয়েছিলেন। তিনি সেই প্রচারককে খুঁজছিলেন কিন্তু তাকে পাচ্ছিলেন না। তারপর তিনি জানতে পারলেন যে তিনি অন্য একটি মসজিদের ইমাম এবং তিনি নামাজের পর এখানে আসবেন। তিনি ভিতরে থাকতে পারলেন না, সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি এক বইবিক্রেতার স্ট্যাণ্ড এর পাশে প্রচারককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি পিছন থেকে তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বই বিক্রেতাকে বলতে শুনলেন, "জনাব দাঁড়িয়ে থাকবেন না, এই চেয়ারে বসুন", যা বরফে ঢাকা ছিল।

১। ১০০ কুরুশে ১ লিরা।

যখন তিনি বসতে যাচ্ছিলেন, হিলমি এফেন্দী লাফ দিয়ে কাছে এসে বললেন, "দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।" এরপর হিলমী ইফেন্দি তার রুমাল দিয়ে বরফগুলো পরিস্কার করে দিলেন। তিনি তার ওভারকোটটি খুলে ফেলে ভাজ করে চেয়ারে রাখলেন এবং বললেন, "দয়া করে এখন বসুন।" আব্দুল হাকিম তার দিকে তাকালেন। তাঁর বরকতপূর্ণ চেহারা, কালো ভ্রু, চোখ এবং গোলাকার দাড়ি খুব সুন্দর ও মায়াময় ছিল। আব্দুল হাকীম এফেন্দী বললেন, "তোমার ওভারকোট নাও" এবং খালি চেয়ারে বসলেন। হিলমি ইফেন্দী কিছুটা দুঃখ পেলেন, কিন্তু যখন তাকে বলা হল, "এটা আমার পেছনে রাখো", তখন তিনি খুশি হয়ে গেলেন। যখন কিছু লোক মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, তখন তিনি মসজিদে ঢুকে ডান পাশের মেঝেতে রাখা উঁচু গদিতে বসলেন এবং সামনে ছোট টেবিলে (রেহলা) রাখা বই থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। হিলমি ইফেন্দী প্রথম সারিতে তার মুখোমুখি বসে মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলো শুনছিলেন। তিনি ধর্মীয় ও দুনিয়াবি তথ্য সংবলিত কথাগুলো শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছিলেন, কারণ তিনি পূর্বে এই কথাগুলো কখনো শুনেননি। তিনি এমন একজন দরিদ্র ব্যক্তির মতো ছিলেন যে একটি ধনভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে অথবা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মতো যে শীতল পানি খুঁজে পেয়েছে। সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির থেকে তিনি চোখ সরাতে পারছিলেন না। তিনি তার সুদৃশ্য, উজ্জ্বল চেহারায় এবং তার বলা মূল্যবান কথাগুলো শোনার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। হিলমি এফেন্দী নিজের বিদ্যালয়, পার্থিব কার্যকলাপ ও সবকিছু ভুলে গেলেন। মধুর কিছু তার হৃদয় আলোড়িত করে তুললো; যেন মিষ্টি কিছু দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ করা হচ্ছিল। এটি তার জীবনের সর্বপ্রথম সোহবাত ছিলো, যা তিনি আব্দুল হাকিম ইফেন্দীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই অল্প কিছু কথাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল তার ভেতর 'ফানা' সৃষ্টি করার জন্য, যা অর্জনে অনেক বছর কষ্ট সহ্য করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, সোহবাত এক ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। হিলমি এফেন্দীর কাছে এই এক ঘন্টা একটি মুহূর্তের মত মনে হচ্ছিলো। যেন এক মিষ্টি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন, হিলমী ইফেন্দী তার নোটবুক পকেটে রেখে বাইরে বের হওয়ার সারিতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি জুতার ফিতা বাধছিলেন, তখন কেউ একজন বাকা হয়ে ফিসফস করে তাকে বলল, "হে যুবক ইফেন্দি, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমাদের বাড়ি সিমেট্রিতে, একদিন আমাদের বাড়িতে আসো। আমরা একসাথে কথা বলব।" সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দীই এই সুন্দর, অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো বলেছিলেন। ঐদিন রাতে হিলমি ইফেন্দী একটি পরিষ্কার, উজ্জ্বল, আলোকিত নীল আকাশ, মসজিদের গম্বুজের মতো সুক্ষাগ্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। হাস্যোজ্জল চেহারার একজন মানুষ সেখানে হাঁটছিলেন। যখন হিলমী এফেন্দি তার দিকে দৃষ্টি দিলেন, দেখলেন যে তিনি সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দী,এবং আনন্দে জেগে উঠলেন। কয়েকদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন চাঁদের মত উজ্জল চেহারার অধিকারী একজনকে, যিনি হযরত খালিদ আইয়ুব আল আনসারীর মাজারে মাথার দিকে বসে আছেন এবং লোকজন তার হাত চুম্বন করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিলমি এফেন্দিও চুম্বন করার জন্য সারিতে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি তার হাত চুম্বন করছেন এমন সময়ে তার ঘুম ভেঙে যায়।

যখন হিলমি এফেন্দী ফাতিহতে বসবাস করতেন, তখন প্রতি শুক্রবার সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির বাড়িতে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি ফজরের নামাজের পূর্বে যেতেন এবং রাতে ইশার নামাজের পরে অনিচ্ছাসত্ত্বে ফিরে আসতেন। সবকিছু নতুন করে দেখলে তিনি ভুলে যেতে পারেন, তাই তিনি সবসময় আব্দুল হাকিম এফেন্দির কাছাকাছি থাকতেন, এমনকি খাওয়া, ইবাদত বন্দেগী, বিশ্রাম এবং কোন স্থান পরিদর্শন করার সময়ও তিনি সর্বদা আব্দুল হাকিম এফেন্দির নিকটে থাকতেন। তিনি সর্বদা তার আচরণ

মনোযোগ সহকারে লক্ষ করতেন এবং তার কথা শুনতেন। তিনি এক মূহুর্তও নষ্ট না হওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রতি ছুটির সময় এবং যখনই অবসর সময় পেতেন, তার কাছে যেতেন। হিলমী এফেন্দি মসজিদে প্রদানকৃত আব্দুল হাকিম ইফেন্দির সকল নসিহত শুনতেন। প্রথমত কিছুদিন তুর্কি বই পড়ানো হতো। কয়েক মাস পর আরবি সরফ[১] এবং নাহু[২] শেখানো হতো। আমসিলা, আওয়ামিল, সেমায়ি মাসদার, কাসিদা-ই আমলী, মাওলানা খালিদের দিওয়ান এবং যুক্তি গ্রন্থ ইসাগুজী মুখস্থ করানো হতো। একটি শ্লোক, একটি লাইন বা একটি আরবি অথবা ফার্সি বাক্য প্রতিটি দরসে লেখানো এবং ব্যাখ্যা করা হতো। যা'ই লেখানো হত তাই মুখস্থ করানো হতো।

সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দি কর্তৃক হুসেইন হিলমি এফেন্দিকে আরোপিত প্রথম কাজ ছিলো ক্বা'দা ও ক্বদর বিষয়ে আল-ইমাম আল-বাগভী এর লেখা থেকে ছোট্ট একটি প্যারা আরবী থেকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা। তিনি রাতে ঘরে বসে এই অনুবাদ[৩] করেছিলেন এবং পরের দিন তার শিক্ষককে দিয়েছিলেন। তার শিক্ষক খুশি হয়ে তাকে বাহবা দিলেন এবং বললেন, "তুমি সঠিকভাবে অনুবাদ করেছো। আমার ভালো লেগেছে।"

হুসেইন হিলমি এফেন্দি সেরা ছাত্র হিসাবে মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ হলেন। একবার তার শিক্ষকের সাথে আইয়ুব-এ সফরকালে বাগানে বসে থাকার সময়, এক কাকতালীয় ব্যাপার ঘটল, তিনি অস্টিওলোজির কোর্স শেষ করেছিলেন এবং তিনি একটি মৃতদেহ নিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন। তার শিক্ষক তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে পড়ছেন তা জানতে চাইলেন। তার উত্তরে, সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দী বললেন, "তুমি চিকিৎসক হয়ো না। তোমার ফার্মাসি স্থানান্তর হওয়া ভালো।" হিলমি এফেন্দি বললেন, "ক্লাসে আমার সর্বোচ্চ স্কোর আছে। স্কুল থেকে আমাকে ফার্মেসি স্কুলে যেতে দেবে না।" তার শিক্ষক তাকে বললেন, "তুমি আবেদন জমা দাও। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন।" অনেক আবেদন করার পর, হিলমি এফেন্দি প্রথম সেমিস্টারের শেষের দিকে দ্বিতীয় সেমিষ্টারের ছাত্র হিসাবে ফার্মেসি স্কুলে প্রবেশ করেন। যদিও পাঠ্যক্রমের অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছিল এবং প্রথম বছরের প্রদত্ত কোর্সগুলির জন্য তাকে আরো কিছু পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তিনি দ্বিতীয় সেমিস্টারের শেষে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ফার্মেসি স্কুল থেকে স্নাতক এবং সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে গুলহানে হাসপাতালে এক বছরের শিক্ষানবিস সম্পন্ন করেন। তিনি প্রথমে সামরিক মেডিকেল স্কুল এ লেফটেন্যান্ট সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি আব্দুল হাকিম এফেন্দির নির্দেশে প্যারিসে প্রকাশিত 'লে মাতিন' পত্রিকায় সাবস্ক্রাইব করেছিলেন এবং ফার্মেসি স্কুলে পড়াশোনা করার সময় তিনি ফরাসি ভাষায় তার জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। যখন তিনি সহকারী শিক্ষক ছিলেন, তখন আব্দুল হাকিম এফেন্দির আদেশে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি ভন মিসেসের কাছ থেকে ক্যালকুলাস, প্রফেসর প্রেগ এর কাছ থেকে মেকানিক্স, ডেমবারের কাছ থেকে পদার্থবিদ্যা এবং গস এর কাছ থেকে কারিগরি রসায়ন শিখেছেন। তিনি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আর্ন্ট এর সাথেও কিছুদিন কাজ করেন এবং তার প্রশংসা লাভ করেন। তার তত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণার শেষ ছয় মাসে, তিনি এস্টারের জন্য একটি ফর্মুলা সংশ্লেষিত করেন ও নির্ধারণ করেন: "ফিনাইল সায়ানো নাইট্রো-মিথেন-মিথিল"।

এই বিষয়ে এটিই ছিল বিশ্বের সফল গবেষণা। এই গবেষণাকর্মটি The Journal Of The Istanbul Faculty of Science এবং জার্মান রাসায়নিক পত্রিকা Zentral Blatt (সংখ্যা ২৫১৯, সাল ১৯৩৭) এ হুসেইন হিলমি ইশক নামে প্রকাশিত হয়।।

১। আরবি ব্যকরণ বা শব্দতত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান।

২। আরবি বাক্যতত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান।

৩। হুসেইন হিলমি ইশক এর করা প্রথম অনুবাদটি ENDLESS BLISS এর দ্বিতীয় খন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে রয়েছে।

১৯৩৬ সালে যখন তিনি ক্যামিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (নং ১/১) লাভ করেন, তখন হুসেইন হিলমি ইশক তুরস্কের প্রথম ও একক রাসায়নিক প্রকৌশলী হিসেবে দৈনিক পত্রিকায় তার নাম আসে। তার সাফল্যের কারণে, তিনি মামাক, আংকারাতে, বিষাক্ত গ্যাস বিভাগের কেমিক্যাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি এগারো বছর ধরে সেখানে কাজ করেন, যার বেশিরভাগই তিনি অ্যাওয়ের ফ্যাক্টরির জেনারেল ডিরেক্টর মের্জবাচার, রসায়নবিদ ডক্টর গোল্ডস্টাইন এবং চক্ষুবিষক ডক্টর নিউম্যান এর সাথে কাজ করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। তিনি বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তিনি সেবা দেওয়া শুরু করলেন। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড পোল্যান্ডের

কাছে একশত হাজার গ্যাসমাস্ক বিক্রি করে। মাস্কগুলো যখন ডারডেনেলস এর পথে, তখন জার্মানরা পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং ব্রিটেন তুরস্কের কাছে মাস্কগুলো বিক্রি করতে চেয়েছিল। ক্যাপ্টেন হুসেইন হিলমি ইশক মাস্কগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তিনি বুঝতে পারেন মাস্কের ফিল্টারগুলি বিষাক্ত গ্যাসে লিক হয়ে গেছে। তখন তিনি এই প্রতিবেদন জমা দেন যে "এগুলো ব্যবহারের অযোগ্য,অকেজো"। জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং প্রতিবেদনটি তারা বিশ্বাস করেননি। "এটি কিভাবে সম্ভব যে একটি ব্রিটিশ পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে?" তারা এটা বলেছিল। তিনি তার প্রতিবেদন সত্য হিসেবে প্রমাণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে এই নির্দেশ দিতে হয়েছিল যে সে এগুলো ভেঙ্গে টুকরা করে যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা যেতে পারে, এতে করে ব্রিটিশরা তাদের অর্থ পেতে সক্ষম হয়েছিল।

হুসাইন হিলমি এফেন্দি আংকারায় কর্মরত থাকাবস্থায় প্রতিটি উপলক্ষে ইস্তানবুলে যেতেন। যখন ইস্তানবুলে যাওয়া কঠিন হয়ে গেল, তিনি ইস্তানবুলে চিঠি লিখে নিজেকে শান্ত রাখলেন। ইস্তানবুল থেকে মামাক গ্রামে আব্দুল হাকিম এফেন্দি তার বরকতময় হাতে এর উত্তর দিতেন। তার উত্তরগুলো:

"প্রিয় হিলমি! আমি তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জানাই। আমি শুনে খুশি হয়েছি যে তুমি তোমার ভাই সেদাদকে আওয়ামিলা[১] শিক্ষা দিচ্ছো। আমি জানি যে কোন কারণে তুমি শহর থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছো। আশা করি তোমরা উভয় অনেক উপকৃত হবে। আমি তোমার জন্য, তোমার মা ও বোনদের জন্য আমার সালাম ও দোয়া দিচ্ছি। আমাকে নিয়মিত চিঠি লেখো এবং বিস্তারিতভাবে তোমার অবস্থা সম্পর্কে জানাও। পরিদর্শনের পর তাৎক্ষণিক তোমার অবস্থা কি তাও জানিয়ো।"

"আমার প্রিয় হিলমি ও সেদাদ! আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। এই জন্য আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা এবং অনেক শুকরিয়া জানাই। সেদাদ খুব সুন্দরভাবে আওয়ামিল অনুবাদ করতে পেরেছে এবং বুঝতেও পেরেছে। হিলমি এটা থেকে উপকৃত হবে। সেদাদ এটি থেকে উপকৃত হবে। আওয়ামিলের একটি শরহ্ এবং একটি মু'রাব আছে। আমি কারও মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিবো। প্রকৃতপক্ষে, তারা নাহু এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। তারপরে, রাসায়নিক প্রকৌশলী হওয়ার পাশাপাশি তুমি সারফ এবং নাহুতেও একজন প্রকৌশলী হয়ে উঠবে। অন্যান্য প্রকৌশলীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মূল্য কমে যাবে মান। তবে প্রকৌশল বিভাগের এই শাখাটি নিজেই মূল্যবান হওয়ার পাশাপাশি আরও মূল্যবান হয়ে উঠবে কারণ এই শাখার বিশেষজ্ঞ হাতে গোনা কয়েকজন অথবা তারা হারিয়ে যাচ্ছেন। তোমার এই শাখায় থাকার কারণ- মনে হচ্ছে এটা তোমাকে বিরাট সমৃদ্ধি (দওলতে আযিম) লাভ করতে সক্ষম করে তুলবে। আমার অনেক সালাম ও দোয়া রইলো।"

১। নাহুর বিখ্যাত একটি বই।

"হিলমি! তোমার সর্বশেষ চিঠি পড়ার পরে আমি অনেক আনন্দ অনুভব করেছি। আমি চাই তুমি যা লিখেছো তাতে বিশ্বাস করো। আমি laxative (এক প্রকার ওষুধ) থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। যদি এটা সহজ হয় তাহলে আরো কিছু তৈরি করে আমাকে পাঠাও।"

"আলাইকুম সালাম! যখন কেউ কোরআন তিলাওয়াত করে তখন সালাম দেয়া সুন্নাত নয়। যখন কেউ সালাম দেয়, তখন জবাব দেওয়া ওয়াজিব। কোরআন কারিম তিলাওয়াত করার সময় তেলাওয়াতকারী একটু বিরতি দিয়ে সালামের জবাব দেয়, অতঃপর পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করে, যেহেতু কুরআন তেলাওয়াত সুন্নাত আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। একটি সুন্নাত পালনের জন্য ওয়াজিব পরিত্যাগ বা বিলম্বিত করা যাবে না, তবে একটি ওয়াজিবের জন্য সুন্নাত পরিত্যাগ করা বা বিলম্ব করা যায়। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য, আগে এটি পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে! প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে হক্ব (অধিকার) দ্বারা হুরমত (সম্মান) বুঝানো উদ্দেশ্য। 'বি-হক্ব-ই মুহাম্মাদ', আল্লাহ তাকে রহমত করুন ও নিরাপদ রাখুন এর অর্থ হলো 'বি-হুরমত-ই মুহাম্মাদ'। মাওকুফাত বই এর লেখক ধরে নিয়েছেন হক্ব হলো হক্কে শরয়ী (বৈধ অধিকার) অথবা একটি 'হক্কে আকলী' (যৌক্তিক অধিকার)। যদি এরকমই হয়, তবে তিনি সঠিক। এই দোয়া অনেক আগে থেকেই এভাবে পড়া হয়। এটা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার উপর আইনী বা যুক্তিগতভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। 'হক্ব' দ্বারা এরকম কিছু বুঝানো হয় না। সম্ভবত অনুবাদক এটি ভুল বুঝেছিলো। হে আমার প্রিয়! তোমার মত অনেকেই একই সমস্যায় অস্থির এবং একই দুঃখে দুঃখী। যদি তা না হতো, তাহলে লোকেরা অন্য উপায়ে দুর্দশাগ্রস্ত হতো। এতাই আদতে আল্লাহ (আল্লাহ তা'আলার আইন)। একটি আরবী শ্লোক আছে, 'কুল্লু মান তালক্বাহু ইয়াসকাহু দাহরাহু।/ ইয়া লায়তা শা'রী হাযিহিদ দুনিয়া লিমান?' অর্থাৎ, 'সে যেই হোক তার অবস্থা নিয়ে তুমি অভিযোগ করো/ওহ, যদি আমি জানতাম এটা

কার জগত ছিল।' সুতরাং তুমি এখনও ভাল আছ। (সুতরাং তোমার দুঃখ প্রসংশনীয় এবং এটি ভাল মানুষ হওয়ার একটি নিদর্শন)।"

"হিলমি! আমি তোমার চিঠির জন্য কৃতজ্ঞ। আমি তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তুমি অবশ্যই জানো যে, মাকতুবাত (আল-ইমাম আর-রাব্বানী আহমদ আল-ফারুকী আস-সিরহিন্দী রচিত) বই এর কিছু অংশ পড়া এবং বুঝতে পারাও একটি বড় প্রতিভা ও বরকতময়, ইসলামের ধর্মের উপর এর মতো বই ইতিপূর্বে লেখা হয়নি এবং এটি তোমার দ্বীন এবং দুনিয়ার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে।"
ইস্তানবুল থেকে মামাক গ্রামে পাঠানো এই চিঠিগুলির হস্তলিখিত কপিগুলিকে "মেমোরিয়াল লেটার্স" নামে একটি ফাইলে রাখা হয়েছে।

মামাকে হুসেইন হিলমি এফেন্দি বেশ কয়েকবার আল ইমাম আর রব্বানী ও তার ছেলে মুহাম্মদ মা'তুম এর মাক্তুবাত গ্রন্থের তুর্কি অনুবাদ পড়ে তা বুঝার চেষ্টা করেন। যার প্রত্যেকটির তিনটি খন্ড আছে এবং তিনি ছয়টির একটি সংক্ষিপ্ত সূচক সংকলন করেছিলেন। যখন তিনি ইস্তানবুল এসেছিলেন, তখন তিনি তার ৩৮৪৬ টি সারাংশ সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির কাছে পড়েন, যিনি কয়েক ঘন্টা ধরে এটি শুনেছেন এবং অনেক পছন্দ করেছেন। যখন আব্দুল হাকিম এফেন্দী বলেন, "এটি একটি বই তৈরি করে। এর শিরোনাম দাও 'অমূল্য রচনা'।" তখন হুসেইন হিলমি এফেন্দি অবাক হয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, "আপনি কি এটি পাননি? তাদের মূল্য কি কখনও অনুমান করা যায়?" প্রথম খন্ড থেকে প্রাপ্ত এন্ট্রিগুলি পরে বর্ণানুক্রমিক সূচী হিসেবে তুর্কি মাকতুবাত তারজুমাসি'র শেষে যোগ করা হয়েছিল।

১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ সালে হিলমি ইশক তার শিক্ষক আব্দুল হাকিম এফেন্দিকে জিজ্ঞেস করলেন,
"জনাব, আমি বিয়ে করতে চাই। আপনার মত কি?"
"তুমি কাকে বিয়ে করবে?" তার শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন।
"আপনি যাকে বিয়ে করার অনুমতি দিবেন।"
"সত্যি?"
"জ্বী, জনাব।"
"তাহলে জিয়া বেইয়ের মেয়ে তোমার জন্য উপযুক্ত।"
যখন হিলমি এফেন্দি আংকারায় যাওয়ার পূর্বে তার কৌতূহলটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তখন আব্দুল হাকিম এফেন্দি পরের দিন জিয়া বেইকে ডেকে পাঠালেন এবং দীর্ঘ আলোচনার পর তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এক সপ্তাহ পরে হিলমি এফেন্দি আবার ইস্তানবুল এসেছিলেন এবং আব্দুল হাকিম এফেন্দির বরকতপূর্ণ হাতের দ্বারা নিজ হাতে আংটি পরিধান করেন। তিনি সরকারি নিবন্ধন করে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে ইসলামি বিবাহের ব্যবস্থা করেন। দুই মাস পর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের অনুষ্ঠানে আব্দুল হাকিম এফেন্দী হিলমি এফেন্দীর পাশে বসেছিলেন এবং রাতে নামাজ পড়ার পর ব্যক্তিগতভাবে হিলমি এফেন্দীর জন্য দোয়া করেন। এক সপ্তাহ পরে যখন দম্পতি তার সাথে দেখা করতে আসলেন, তখন আব্দুল হাকিম এফেন্দী নববধূকে তাওয়াজ্জুহ (স্বাগত) জানালেন এবং বললেন, "তুমি আমার কন্যা ও পুত্রবধূ উভয়ই।"

১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ সালের শরৎকালের একটি কথা, তখন হিলমি এফেন্দি আঙ্কারায় হামামনুতে তার বাড়িতে ছিলেন। একদিন ফারুক বেই এর পুত্র ব্যারিস্টার নেভজাদ ইশিক তার কাছে এসে বললেন, "স্যার, আব্দুল হাকিম ইফেন্দি আমাদের বাড়িতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" হিলমি এফেন্দি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মজা করছেন? তিনি তো ইস্তানবুলে। আপনি কেন বললেন তিনি আমার অপেক্ষা করছেন?" নেভজাদ বেই শপথ করলেন এবং একসঙ্গে তারা হাজী বাইরামে ফারুক বেই এর বাড়িতে আসলেন। তিনি সেখানে জানতে পারলেন যে পুলিশ আব্দুল হাকিম এফেন্দিকে ইস্তানবুলের এইয়ুবে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে ইজমিরে নিয়ে যায় এবং পরে আঙ্কারায়। অনেক অনুনয়ের পর, তাকে পুলিশ তত্ত্বাবধানে তার ভাতিজা ফারুক বেই এর বাড়িতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি অতিরিক্ত চিন্তা এবং ভ্রমণের কারণে দুর্বল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি হিলমি এফেন্দিকে বললেন, "প্রতিদিন আমার কাছে এসো।" প্রতি সন্ধ্যায় হিলমি এফেন্দী তার শোবার ঘরে আসতেন, তাকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দিতেন এবং চলে যাওয়ার পূর্বে সুরা ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিয়ে দিতেন। দিনে দেখা করতে আসা ভক্তবৃন্দরা ঘর জুড়ে সারিবদ্ধ করে রাখা চেয়ারে বসে কিছু কথা বলে দ্রুত চলে যেতো। তিনি হিলমি এফেন্দিকে সবসময় তার বিছানার পাশে বসাতেন এবং নিচুস্বরে তার সাথে কথা বলতেন। যখন আঙ্কারার নিকটবর্তী বা'লুম গ্রামে

তাকে দাফন করা হয়, তখন হিলমি এফেন্দী কবরস্থানে যযান এবং আব্দুল হাকিম এফেন্দির পুত্র আহমদ মাক্কী এফেন্দীর নির্দেশে কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন। আব্দুল হাকিম এফেন্দির পুত্র মাক্কী এফেন্দি বলতেন, "বাবা হিলমিকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তার কন্ঠস্বর চেনেন। হিলমী তালকীন[১] পড়বে!" এই সম্মানজনক কাজটিও হিলমি এফেন্দির ভাগ্যে পড়ল। কয়েক বছর পর হিলমি এফেন্দী কবরের মাথার দিকে একটি মার্বেল পাথর স্থাপন করেছিলেন, যা তিনি ইস্তানবুলে লিখেছিলেন। তিনি ভোয়ানের হযরত সৈয়দ ফাহিমের কবরেও একটি মার্বেল পাথর স্থাপন করেছিলেন এবং ইস্তানবুলের আব্দুল ফেত্তাহ, মুহাম্মদ আমীন তোকাদি ও ছেরকেস হাসান বেই এর মাজারগুলো মেরামত করেছিলেন। তিনি ১৩৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৯ সালে

১। তালকীন হলো এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ করা যার দ্বারা মৃত ব্যক্তির কলব ও আত্মা ঈমানের কথা স্বরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের স্ত্রী বিহাজে মিয়ান সুলতানের ওসিয়ত অনুযায়ী তার নামাজে জানাজা পড়ান এবং ইয়াহইয়া এফেন্দি কবরস্থানে তার কবরের উপরে একটি মাজার নির্মাণ করেছিলেন। ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৯৭১ সালের শরৎকালে তিনি দিল্লি, দেওবন্দ, সিরহিন্দ ও করাচি ভ্রমণ করেন এবং পানিপথ শহরে হযরত সানাউল্লাহ এবং মাজহার-ই জান-ই জানানের স্ত্রীর কবর পায়ের তলাউ নিস্পিষ্ট হচ্ছে দেখে এগুলো মেরামত ও সুরক্ষার জন্য পাঁচ শত ডলার দান করেন।

হুসেইন হিলমি এফেন্দি ১৯৪৭ সালে বুরসা সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন, পরবর্তিতে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষ হন। এরপর তিনি কুলেলি (ইস্তানবুল) এবং এরজিনযান সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে অনেক বছর রসায়ন শিক্ষক হিসেবে ছিলেন। শত শত কর্মকর্তাদের শিক্ষা প্রদানের পর তিনি ১৯৬০ সালের অভ্যুত্থানের পর অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ভেপা, ইমাম খতিব, ছায়া'অলু সহ ইস্তানবুলের আর অনেক উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিত এবং রসায়ন শিক্ষা দেন। তিনি অনেক বিশ্বস্ত যুবকদের প্রশিক্ষণ দেন। শিক্ষাদান বন্ধ না করেই, তিনি ১৯৬২ সালে ইস্তানবুলের উপকণ্ঠে ইয়েশিলকোতে মারকেজ ফার্মেসি কিনেন এবং বহু বছর যাবৎ মালিক এবং ম্যানেজার হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। তিনি ইস্তানবুলের কুলেলি মিলিটারি উচ্চ বিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষা দেওয়ার সময় উসকুদারের মুফতি আহমাদ মাক্কী এফেন্দির কাছ থেকে মা'কুল, মানকুল, উসূল এবং ফুরু শিখেছিলেন, যা ফিকহ, তাফসীর এবং হাদীস এর সাথে সম্পর্কিত। ১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ সালে হুসেইন হিলমি এফেন্দি ধর্মীয় নির্দেশনা মোতাবেক ইজাজাতে মুতলাকা (পরিপূর্ণ অধিকারের সনদ) নিয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

১৯৫৬ সালে তিনি সা'দাতে এবিদিয়্যা[১] (Endless Bliss) প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ইস্তানবুলে ইশিক কিতাবেভী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ সালে ওয়াকফ ইখলাস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বব্যাপি তার তুর্কি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি এবং অফসেট আরবি বই প্রচার করেছিলেন এবং হাজার হাজার অভিনন্দন, মূল্যায়ন এবং ধন্যবাদ লিখিত চিঠি পেয়েছিলেন। তার কিছু বই জাপানি, এশিয় ও আফ্রিকান ভাষায় অনুদি হয়। তিনি সর্বদা বলতেন যে এই সকল কাজে তার কোন ক্ষমতা বা দক্ষতা ছিল না; বরং সব কাজই হযরত সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির আধ্যাত্মিক সাহায্য ও অনুগ্রহ এবং ইসলামের আলেমদের প্রতি তার অত্যধিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে প্রাপ্ত বরকতের ফল।

হুসেইন হিলমি এফেন্দী সর্বদা বলতেন যে তিনি সৈয়দ আব্দুল হাকিম এফেন্দির কথা ও সোহবতের স্বাদ পেয়েছেন যা তিনি অন্য কিছুতেই পাননি এবং তার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হচ্ছে যখন তিনি আব্দুল হাকিম এফেন্দির সাথে কাটানো আনন্দময় মুহুর্তগুলি স্মরণ করেন। তিনি বলেন যখন ঐদিনগুলোর কথা স্মরণ করেন তখন দুঃখে কষ্টে তার নাসিকা হাড়গুলো বেরিয়ে আসে। তিনি প্রায়ই একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন:

১। বারোশ পৃষ্ঠায় লিখিত তুর্কি বইটি একটি চমৎকার রচনা এবং ধর্মীয়ও পার্থিব জ্ঞানের সমুদ্র। এর অংশগুলো ইংরেজীতে "১, ২, ৩, ৪ ও ৫" খন্ডে অনুবাদ করা হয়েছে। এর আরবি অনুবাদ চলমান।

"Zi-hijr-I dositân, Khun shud darûn-i sîna jân-I man,
Firâq-I ham-nashînân sokht, maghz-I istakhân-i man!"

(কারণ আমি আমার প্রিয় মানুষ থেকে দূরে আছি, আমার মন সর্বদা কান্নাকাটি করতে করতে বুক ভিজিয়ে দেয়,
তার থেকে বিচ্ছেদ হওয়ায় আমার পোড়া অস্থি মজ্জা নিয়ে বসে আছি)।

হুসেইন হিলমি এফেন্দী ইসলামের আলেমদের রচিত বইগুলো পড়েন অশ্রুভেজা চোখে আল-ইমাম আর-রব্বানী এবং আব্দুল হাকিম আরওয়াসী'র কথা উদ্বৃতি করেন। তিনি বলতেন, "কালাম-ই কিবার, কিবার-ই কালমাসত।" (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথাগুলো শ্রেষ্ঠ কথা)। তিনি প্রায়ই আব্দুল হাকিম এফেন্দীর একটি বাণী উদ্ধৃত করতেন:

"যাকে ক্ষতিকর হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ক্ষতি দেখে তোমরা কেন অবাক হও? কিভাবে তোমরা তার কাছ থেকে কল্যাণ আশা করতে পারো? তোমাদের অবাক হওয়া দেখে আমি বিস্মিত। সে একটি অমিশ্রিত মন্দ। তার দোষ বিস্ময়কর হওয়ার মতো নয়। যদি তোমরা তাকে কোন ভাল কাজ করতে দেখো, তাহলে তোমরা অবাক হতে পারো! তখন চিন্তা করো, সে কীভাবে ভাল কাজ করতে পারে?"

"ইসলামের আলেমগণ নিখুঁত মানুষ ছিলেন। তাদের পাশে আমরা কিছুই নয়। যদি আমরা তাদের মাঝে বসবাস করতাম, তাহলে আমরা কখনোই মানুষ হিসেবে গণ্য হতাম না। যদি আমরা হারিয়ে যেতাম, কেউ আমাদের সন্ধান করতো না!"

"যদি Tekkes[১] বন্ধ না হতো, তাহলে অনেক ওলী এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতো।"

"মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ আমি পাইনি।"

"যদি আমি বিদেশী (পাশ্চাত্য) ভাষায় কথা বলতে পারতাম, তাহলে আমি ইসলামের আরো বেশি সেবা করতে পারতাম!"

"ব্রিটিশরা হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। তারা তাদের সাম্রাজ্যের সকল সৈন্য, নৌবহর ও তাদের উপনিবেশগুলো থেকে সংগৃহীত অগণিত স্বর্ণ খরচ করে। এককথায় তাদের সকল রাজকীয় শক্তি ব্যবহার করে ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। তবুও, ব্রিটিশদের এই সকল দৈত্য শক্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিলো মাধ্যম পর্যায়ের, ইসলামের আরো ভয়ংকর শত্রু শেমসিদ্দীন গুনালটাই।"

"একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি ঐ খাদ্য কখনোই খেতে পারে না যা সে নিজেই একটি বাচ্চার প্রসাবভর্তি পাত্রে রেখে দিয়েছেন। তিনি যখন ফেলে দেয়ার বিষয়টি মনে করেন তখন তিনি ঘৃণা বোধ করেন। কুফরীর কারণ হয় এমন কোনো জিনিস ব্যবহার করারও একই প্রভাব রয়েছে। একজন ব্যক্তি যার ঈমান দৃঢ় এবং যে ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, অন্যরা এসবের যতই প্রশংসা করুক না কেন, সে তা কখনোই ব্যবহার করবে না।"

১। যেখানে মুর্শিদরা তাদের শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিতেন।
"সবাই ইমাম আর-রব্বানী এর মাকতুবাত বইটি বুঝতে পারে না, কারণ এটি হাফিজ-ই শিরাজীর কবিতার বই বা খামসা এর মতো নয়। আমরা এটা বুঝার জন্য পড়িনা; বরং পড়ে বরকত লাভের জন্য পড়ি।"

"নামাজ আদায় করা মানে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যাওয়া। যারা এই পৃথিবীতে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী নামাজ আদায় করে, তাদের কাছে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদেরকে ইলমে লাদুন্নি[১] দান করা হয়। এই ইলম (জ্ঞানের শাখা) বাহাত্তর প্রকার বিবিধ স্তরে শিখা হয়। যিনি সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছেন, তিনি এক নজরে বলতে পারেন একটি গাছের কতটি পাতা আছে এবং ভালো ও খারাপ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। এধরনের মানুষ তাদের কবরের মধ্যেও নামাজ আদায় করেন। এই ধরনের নামাজে ক্বিয়াম বা রুকু থাকে না; এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ করা।"

নিম্নের লেখাটি হুসেইন হিলমি ইশক ১৪১০ হিজরীর ২৪ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৪ তাশরীনি আউয়াল, ১৯৮৯, মঙ্গলবার লিখেছিলেন।

এই পৃথিবীতে আট ধরনের মানুষ আছে:

১। বিশ্বাসী যারা সালিহ (ধার্মিক এবং ভাল)। সে বলে যে সে একজন মুসলিম এবং সে আহলে সুন্নাতের আকীদার অনুসারী। যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের বিশ্বাসকে ধারণ করে, তাকে বলা হয় সুন্নী। সে নিজেই আহলে সুন্নাতের চারটি মাযহাবের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে গ্রহণ করে। এভাবেই সে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তার সব কাজ সম্পাদন করে। সে তার মাযহাব অনুযায়ী ইবাদাত বন্দেগী করে। সে হারাম কাজ (ইসলামে নিষিদ্ধ কাজসমূহ) এড়িয়ে চলে। যদি সে অসাবধানতাবশত কোন ভুল করে থাকে, তবে সে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাওবা করে। সে তার সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে একজন সৎ ইমাম বা কুরআন কারিম শিক্ষকের কাছে তাদের পাঠায়। সে তার সন্তানদের কুরআন মজীদ কিভাবে তেলাওয়াত করে তা শিখানোর, নামাজের মধ্যে তেলাওয়াতের জন্য সূরা মুখস্থ করানোর এবনহ ইলমে হাল শিখানোর চেষ্টা করে। এগুলো সব শিখানোর পরে সে তার সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠায়। সে তার সন্তানদের শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়। এটি অবশ্যই জরুরী যে শিশুরা তাদের প্রাথমিক শিক্ষার আগে ধর্মীয় জ্ঞান শিখবে এবং প্রতিদিনের নামাজ আদায় করতে শুরু করবে। যে বাবা তার সন্তানদের এভাবে গড়ে তুলতে পারেনা, সে কখনোই একজন খাঁটি মুসলিম হতে পারে না। সে এবং তার সন্তান জাহান্নামে যাবে। সে যে ইবাদাত বন্দেগী করেছে উদাহরণস্বরূপ, হজ্জ আদায়, তা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে না। একজন খাঁটি মুসলিম কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

২। এমন বিশ্বাসী যে পথভ্রষ্ট। সে বলে যে সে একজন মুসলিম এবং সে একজন মুসলিমও। কিন্তু সে সুন্নী নয়। সে মাযহাবের অনুসারী নয়। অন্য কথায়, তার বিশ্বাস আহলে সুন্নাতের আলেমদের শেখানো বিশ্বাসের অনুরূপ নয়। অতএব তার কোন ইবাদাত গ্রহণ করা হবে না। সে জাহান্নাম থেকে বাঁচবে না। যদি সে ইবাদাত পালন না করে এবং হারাম কাজ করে, তবে সে এই পাপের জন্য অতিরিক্ত সময় জাহান্নামে থাকবে। যেহেতু তার বিপথগামী বিশ্বাস কুফরীর কারণ নয়, তাই সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। এ ধরনের লোকদের উদাহরণ হলো শিয়া যারা ইমামিয়া নামেও পরিচিত।

১। এটি এমন এক জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আওলিয়াদের অন্তরে দেওয়া হয়।

৩। একজন পাপী বিশ্বাসী, সেও নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে এবং সে একজন সুন্নিও। অর্থাৎ, সে আহল সুন্নাতের আকীদায় বিশ্বাস রাখে। তারপরও সে কিছু বা সমস্ত ইবাদাত বন্দেগীকে অবহেলা করে এবং হারাম কাজ করে। একজন পাপী বিশ্বাসী ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, যদি সে তাওবা না করে অথবা শাফা'আত না পায় (নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বা একজন আউলিয়ার অথবা একজন খাঁটি মুসলিম ব্যক্তির) বা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করতে না পারে। এই ক্ষেত্রেও সে চিরতরে জাহান্নামে থাকবে না।

৪। জন্ম থেকে অবিশ্বাসী একজন ব্যক্তি যার পিতামাতা কাফের ছিল অথবা আছে। সে অবিশ্বাসী হিসেবে বেড়ে উঠেছে। সে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়তে বিশ্বাস করে না। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত অবিশ্বাসী। কমিউনিস্ট এবং ফ্রিম্যসনরা কিতাবহীন অবিশ্বাসী। তারা মৃত্যুর পরের পুনর্জীবনে বিশ্বাস করে না। যারা বিভিন্ন মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে, তাদের মুশরিক বলা হয়। কাফেররা জাহান্নামে যাবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। পৃথিবীতে তারা যত ভালো কাজ করেছে তা কোনো উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষাও করবে না। যদি কোন অবিশ্বাসী মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম হয়ে যায়, তাকে ক্ষমা করা হবে এবং সে একজন খাঁটি মুসলিম হয়ে যাবে ।

৫। একজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তি যে ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং অবিশ্বাসী হয়। মুসলমান হিসেবে সে যে সকল ইবাদাত করেছে সেগুলো মুছে ফেলা হবে এবং মৃত্যুর পরে সেসবের কোনো মূল্য থাকবে না। যদি সে আবার মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং একজন খাঁটি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

৬। মুনাফিক যে বলে সে একজন মুসলিম। তবুও সে মুসলিম নয়। সে অন্য কোন ধর্মের অনুসারী। সে একজন অবিশ্বাসী। সে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করার জন্য একজন মুসলমান হওয়ার ভান করে। একজন মুনাফিক, অবিশ্বাসী কাফেরের চেয়েও খারাপ। সে মুসলমানদের জন্য বেশি ক্ষতিকর। পূর্বে মুনাফিকদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। সেই তুলনায় এখন কম।

৭। একজন জিন্দীকও বলে যে সে একজন মুসলমান। তবুও সে কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে বিশ্বাস করে না। সে একজন বিশ্বাসঘাতক কাফের। মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিভ্রান্ত করা এবং ধর্মকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার জন্য সে ইসলামের নামে তার অবিশ্বাসগুলো উপস্থাপন করে। এই দলে কাদিয়ানী, বাহায়ী ও বেকতাশীরা রয়েছে।

৮। একজন মুলহিদও নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং মনে করে সে একজন মুসলিম। সে ইসলামের ইবাদতসমূহ আদায় করে এবং হারামকে এড়িয়ে চলে। তবুও সে আহলে সুন্নাতের কুরআন আল-কারিম ভিত্তিক কিছু ব্যাখ্যাকে অবিশ্বাস করে যার দ্বারা সে তার ঈমানকে নষ্ট করে। এই দলে নুসাইরি ও ইসমাঈলী, দুটি শিয়া সম্প্রদায় ও ওয়াহাবী রয়েছে। তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী এবং সুন্নি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, যারা প্রকৃতপক্ষে সঠিক বিশ্বাসী মানুষ, কিন্তু তাদের বিশ্বাস কাফেরদের মতো। যদি কোন ব্যক্তি মুমিন ব্যক্তিকে কাফের বলে তাহলে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। এই সকল লোকেরা মুসলমানদের কাছে কাফেরদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর।

যেকোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই দুনিয়ায় শান্তিও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে চায় এবং সকল যন্ত্রণা থেকে দূরে থেকে আখেরাতের অসীম রহমত-বরকত অর্জন করতে চায়। আমি আমার বই 'সা'দাতে এবিদিয়্যা'তে এই বিষয়ে লিখেছি। আমি বিশ্বজুড়ে সকল ধরণের মানুষের জন্য সুখের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রথমত, আমি নিজে শিখতে চেষ্টা করেছি। বহু বছর ধরে আমি শত শত বই পড়েছি। আমি ইতিহাস এবং তাসাউফ বিষয়ে খুব কঠোর গবেষণা করেছি। আমি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়েও গভীরভাবে গবেষণা করেছি। আমি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করি যে দুনিয়াতে শান্তি লাভ এবং আখেরাতের অনন্তকালের সুখ পাওয়ার জন্য খাঁটি মুসলিম হওয়া দরকার। আর একজন খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য, আহলে সুন্নাতের গবেষকদের লেখা বইগুলো থেকে ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান অর্জন জরুরী। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি খাঁটি মুসলিম হওয়া দূরে থাক, মুসলিমই হতে পারে না। আমি আমার বই 'সা'দাতে এবিদিয়্যা'তে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি কিভাবে একজন খাঁটি মুসলিম হওয়া যায়। সংক্ষেপে:

১। আহলে সুন্নাতের আলেমদের দ্বারা শেখানো সকল বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে। অন্য কথায়, তাকে অবশ্যই সুন্নী হতে হবে।

২। চারটি মাযহাবের যেকোনো একটির ফিকহের বই পড়ে শরীয়তের শিক্ষা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে হবে, সে অনুযায়ী ইবাদাত বন্দেগী করতে হবে এবং হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে। যদি কেউ চারটি মাযহাবের যেকোনো একটি মাযহাবকে অনুসরণ না করে অথবা চারটি মাযহাবের মধ্যে সুবিধাদি বাছাই করে চারটি মাযহাবের মধ্যে মিশ্রণ সৃষ্টি করে, তাকে মাযহাবহীন বলা হয়। আর একজন মাযহাবহীন ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের পথ থেকে দূরে সরে যায়। যে ব্যক্তি সুন্নী নয়, সে অবশ্যই হয় মতবিরোধী, নয়তো কাফের।

৩। একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই কাজ করতে হবে। আল্লাহর হুকুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জন করা উচিত। আমরা এমন এক যুগে বাস করি যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি খুব কমই তার বিশ্বাস এবং সততা রক্ষা করতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করতে পারে না। এই মূল্যগুলি রক্ষা এবং ইসলামের সেবা করার জন্য, তার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কার এবং সুবিধাগুলি ব্যবহার করা উচিত। হালাল উপায়ে উপার্জন করা একটি মহান ইবাদাত। উপার্জনের এমন উপায় যা প্রতিদিনের নামাজ আদায়ে বাধা না দেয় এবং হারামের কাজের কারণ না হয়, তা ভালো এবং বরকতময়।

ইবাদাত এবং পার্থিব কার্যাদির জন্য; উপকারী ও বরকতময় হওয়া কেবলমাত্র সবকিছু আল্লাহ তায়ালার জন্য হওয়ার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যা কিছু উপার্জন করা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই দান করা, এককথায় ইখলাসের উপর অটল থাকা। ইখলাস মানে কেবল আল্লাহকেই ভালবাসা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই ভালোবাসা। কেউ যখন কাউকে ভালবাসে, তখন তাকে বারবার স্মরণ করে। তার হৃদয় সর্বদা তার যিকর করে, অর্থাৎ, তার স্মরণ এবং উল্লেখ করে।

যদি একজন মানুষ আল্লাহ্ তায়ালাকে ভালবাসে, তবে সে তাকে বারবার মনে করবে, অর্থাৎ, তার হৃদয়ে সবসময় তাঁর যিকর করবে। এ কারণেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার যিকির করো।" নিম্নোক্ত হাদীসগুলো আমি কুনূয উদ-দাক্কাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি: "উচ্চ মর্যাদাবান হলো তারাই যারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করে", "আল্লাহর প্রতি ভালবাসার চিহ্ন হলো তাঁর যিকির করা", "যে

আল্লাহকে অনেক ভালবাসে সে সকল প্রকার অপকর্ম থেকে মুক্ত থাকবে", "আল্লাহ্ তায়ালা তাকেই বেশি ভালবাসেন যে তাঁর অনেক যিকির করে।" তাসাউফের আলেমগণ আল্লাহ তায়ালার বেশি বেশি যিকির পালন করার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ পথ হলো একজন মুর্শিদে-কামিলের খোঁজ করা, তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা, তাঁর প্রতি আদাবের নিয়মাবলী পালন করা এবং এভাবে তাঁর হৃদয় থেকে ফয়েজ আদায় করা।

মুর্শিদে কামিল হলেন একজন ইসলামি আলেম যিনি তাঁর পূর্বের মুর্শিদে কামিলের কাছ থেকে ফয়েজ পেয়েছেন এবং এভাবে ফয়েজ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যখন তিনি এই যোগ্যতা অর্জন করেন, তখন তিনি তার মুর্শিদের কাছ থেকে একটি লিখিত সনদ পান যে তিনি এই যোগ্যতা অর্জন করেছেন। মুর্শিদদের একে অন্যের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ফয়েজ প্রাপ্তির বিষয়টি একটি ধারার মতো, যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় পর্যন্ত সংযুক্ত। অন্য কথায়, একজন মুর্শিদে কামিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে মুর্শিদদের একটি পরম্পরার মাধ্যমে আসা ফয়েজ, হাল এবং বরকত তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তারপর তিনি অন্যদের হৃদয়েও তা ঢেলে দেন।

মুর্শিদ ও মুরিদ যারা তাঁর কাছ থেকে ফয়েজ নিতে চায়, তাদেরকে খাঁটি মুসলিম হতে হবে। এমন একজন ব্যক্তি যে আহলে সুন্নাতের আকীদায় বিশ্বাস করে না, উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ সাহাবায়ে কেরামদের ব্যপারে বাজে মন্তব্য করে বা চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাবকে গ্রহণ না করে; অথবা যদি কেউ হারামকে এড়িয়ে না চলে, যেমন, তার স্ত্রী বা মেয়ের পর্দা ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়াকে সমর্থন করে, যদিও সে তাদের প্রতিরোধ করতে পারে; অথবা যে তার সন্তানদের ইসলাম এবং আল-কুরআন পড়তে শেখানোর চেষ্টা করে না, তারা খাঁটি মুসলিম হতে পারেনাএবং এমন ব্যক্তির একজন মুর্শিদ হওয়া তো অসম্ভব। মুর্শিদ যা কিছু বলেন বা যা করেন তা আহলে সুন্নাহ'র মূলনীতি ও ইলমে হাল গ্রন্থের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরত (মদিনায় স্থানান্তর হওয়া) এর এক হাজার বছর পরে আখেরি যামানা (সর্বশেষ সময়) নামক একটি যুগের সূচনা হয় এবং পৃথিবী শেষ হওয়ার নিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময়কালে, আল্লাহ তায়ালার রাগ (ক্বাহর) ও কঠোরতার (জালাল) গুণাবলী প্রকাশ হবে এবং এই সময়ে অপকর্ম এ দুর্দশা বাড়তে থাকবে। ধর্মীয় শিক্ষা কমে যাবে এবং আহলে সুন্নাতের আলেম ও মুর্শিদে কামেলের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

মৌখিক যিকির অর্থাৎ, "আল্লাহ, আল্লাহ বলা" এরূপ যিকিরে সাওয়াব (আখেরাতের পুরস্কারের উপযুক্ত) রয়েছে এবং অন্তরের যিকিরের উপযোগিতা সৃষ্টি করবে। যাইহোক, অন্তরের যিকিরের জন্য খাঁটি মুসলিম হওয়া এবং বছরের পর বছর যিকির করা প্রয়োজন। যদি একজন মুর্শিদে কামেল একজন ব্যক্তিকে যিকির করা এবং তার দিকে তাওয়াজ্জুহ বৃদ্ধি করা শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ, তার মুর্শিদকে এই ব্যক্তির হৃদয়ের যিকিরের জন্য সাহায্যের আবেদন করে, অতঃপর অবিলম্বে তার হৃদয় যিকির শুরু করে। যদি কোন ব্যক্তি মুর্শিদে কামেল খুঁজে না পায়, তবে তাকে যেকোনো মুর্শিদে কামিলের কথা (যাএ সম্পর্কে সে শুনেছে বা পড়েছে) স্মরণ করতে হবে। অর্থাৎ, তার উচিত সে তাকে দেখছে কল্পনা করা এবং আদাবের সাথে তাঁর মুখের দিকে তাকানো এবং তার হৃদয়ের মাধ্যমে তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জুহ সৃষ্টির অনুরোধ করা। এটাকে রাবিতা বলা হয়। এই বিষয়ে বারাকাত বইটির সতেরতম পৃষ্ঠায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: "একজন সম্মানিত ভারতীয় আলেম খাজা বুরহান উদদীন, তার অন্তরকে যিকিরে লিপ্ত করার প্রচুর চেষ্টা করেন। তার সাধ্যতীত চেষ্টার পরও তিনি এই রহমতটি অর্জন করতে পারেননি। অতঃপর তিনি একজন মুর্শিদে কামিলের খোঁজ করেন। তিনি দিল্লিতে হযরত মুহাম্মদ বাকী-বিল্লাহ এর সাথে সাক্ষাৎকালে এব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ করেন। এই মহান মুর্শিদ তাকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তার দিকে রাবিতা করার জন্য। অর্থাৎ নিজে নিজে তাঁর চেহারা কল্পনা করে তার কাছে ফয়জের জন্য অনুরোধ করা। তাঁর পরামর্শে অবাক হয়ে খাজা মহান মুর্শিদের বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই পরামর্শটি তার কাছে আসা নবীনদেরকে প্রথমবারের মতো দেওয়া হবে। আমি উঁচু স্তরের একটি কাজ চাই।' তারা তাকে বলেছিলেন যে তার পরামর্শ অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন যে এই মহান ব্যক্তি একজন মুর্শিদে কামিল ছিলেন, তাই তিনি নিজে নিজে তার বরকতপূর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করেন এবং অনুরোধ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং তার হৃদয় যিকির করতে শুরু করে। তিনি শারীরিক স্পন্দন থেকে দূরে সরে শুনতে পান যে তার হৃদয় যিকির করছে।" হযরত ইমাম-ই রাব্বানী কারমতের উপর লিখিত বই 'হাদরাতুল কুদস' এ বর্ণিত কারামতগুলোর চুয়ান্নতমটি বর্ণনা করেন এভাবে: "হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম সিয়ালকুটি, একজন ভারতীয় আলেম, যার বই ও নাম বিশ্বখ্যাত, তিনি বলেন: 'আমি অনেক দিন যাবত হযরত ইমাম-ই রাব্বানীকে চিনি এবং পছন্দ করি। তবুও আমি তার সাথে

সংস্পর্শে আসিনি। এক রাতে তিনি আমার স্বপ্নে আমার দিকে তাওয়াজ্জুহ করলেন। আমার হৃদয় যিকির করতে শুরু করল। দীর্ঘদিন এই যিকির অব্যাহত থাকায় আমি অনেক মূল্যবান রহস্যময় বরকত অর্জন করেছি। তিনি আমাকে উওয়াইসি নামক পদ্ধতিতে দূর থেকে শিক্ষা দেন। পরে, আমি তার সোহবাত অর্জন করলাম।'" এটি আটষট্টিতম কারামতকে এভাবে বর্ণনা করেছে: "হযরত ইমাম-ই রাব্বানীর একজন আত্মীয় তাঁর সংস্পর্শে আসতে চেয়েছিলেন। তবুও সে এটা বলতে পারছিল না। এক রাতে সে সিদ্ধান্ত নিলো যে তাঁকে পরের দিন সকালে বলবে। সেই রাতে সে নিজেকে এক জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে স্বপ্ন দেখল। অন্য পাশ থেকে হযরত ইমাম-ই রব্বানী তাকে ডাকছেন, 'এখানে আসো, দ্রুত এখানে আসো, দ্রুত! তুমি দেরি করছো।' যখন সে এই কথা শুনতে পেলো তখন তার হৃদয় যিকির শুরু করলো। পরের দিন সকালে সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, তার অন্তরে কি হচ্ছে, তিনি বললেন, 'এটাই আমাদের পথ। এটা চালিয়ে যাও।'"

আল্লাহ তায়ালার কুরআন মজীদে সূরা আল ইমরানের একত্রিশ নাম্বার আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "তাদেরকে বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালোবাসে যারা আমার অনুসর করে এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন (যদি তোমরা তা কর)। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।" তিনি সূরা নিসার ঊনআশি নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন: "যে ব্যক্তি নবীকে মান্য করে, সে আল্লাহকে মান্য করবে।" আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার পরে আমার চার খলিফার অনুসরণ করো!" যে সকল ইসলামী গবেষক চার খলিফার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে আহলে সুন্নাত বলা হয়। যেমনটি দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালবাসা অর্জনের জন্য ঈমান থাকা জরুরী যেমনটি আহলে সুন্নাতের আলেমদের গ্রন্থে লেখা রয়েছে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের সকল কথা মেনে চলা প্রয়োজন। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা অর্জন করতে চায় সে অনুযায়ীই তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই দু'টি শর্ত পালন না করে, তবে সে একজন খাঁটি মুসলিম হতে পারবে না। তিনি দুনিয়াতে ও আখেরাতে সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারবে না।

এই দুইটি মূল্যবান বিষয় বই পড়ার দ্বারা শিখা যায়, অথবা মুর্শিদে কামিলের অনুকরণ করে অর্জন করা যায়। মুর্শিদে কামিলের কথা, নজর এবং তাওয়াজ্জুহ একজন মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। আর যখন কারো হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়, তখন সে ঈমান ও ইবাদাত বন্দেগী থেকে আনন্দ অনুভব করা শুরু করে এবং হারাম কাজ তার কাছে তিক্ত, কুৎসিত এবং ঘৃণ্য মনে হয়। যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু হন, তখন মুর্শিদে কামিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সহজেই চেনা হয়। কেয়ামত যত নিকটে আসবে আল্লাহ তায়ালার রাগ তত বেশি তীব্রতরভাবে প্রকাশ হবে, মুর্শিদে কামিলের সংখ্যাও কমতে থাকবে এবং তাদের সহজে চেনা যাবে না। অজ্ঞ, দুষ্কৃতিকারী, বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ধর্মীয় মানুষ হিসেবে আভির্ভূত হবে এবং মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে, এভাবে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

এমন বিপর্যস্ত সময়ে যারা আহলে সুন্নাতের আলেমদের লিখিত বইগুলি থেকে ঈমানের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শরীয়তের শিক্ষা অর্জন করবে, তারা নিরাপদ থাকবে এবং যারা অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত বাজে ধর্মীয় গ্রন্থে চিত্তাকর্ষক এবং উত্তেজনাপূর্ণ কথা পড়বে, তারা বিপদগ্রস্ত হবে এবং সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়বে। এধরনের সময়ে হৃদয়কে শুদ্ধ করার জন্য এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যিকির সঞ্চালনের জন্য যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময় পূর্বের প্রসিদ্ধ কোনো মুর্শিদে কামিলকে স্বরণ করা উচিত, তবে নামাজ আদায়কালীন সময় ব্যতীত। আশা করা উচিত যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুর্শিদের হৃদয়ে প্রবাহিত ফয়েজ তোমার হৃদয়েও প্রবাহিত হবে। মনে রাখতে হবে যে মুর্শিদে কামিলগণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বদা তাঁর হৃদয়ে রহমত প্রদান করেন। মহান মুর্শিদ হযরত মুহাম্মাদ মাসুম তাঁর পঞ্চাশতম চিঠিতে বলেন, "মুর্শিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ক্রমাগত রাবিতা নিশ্চিত করে। ফলস্বরুপ, ফয়েয সহজে গ্রহণ করা যায়। একজন মুর্শিদের উপস্থিতিতে থাকার অন্যান্য উপকারিতাও আছে। একজন মুরিদ যে রবিতাকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে পারে না, তার মুর্শিদের সোহবতে থাকা জরুরী। রাসূল (দঃ) এর সোহবতের কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এতো উঁচু মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ওয়েইস আল-করানী দূর থেকে রাবিতার মাধ্যমে ফয়েয লাভ করেছিলেন; তবুও তিনি সোহবাত অর্জন করতে পারেননি বলে সাহাবায়ে কেরামের স্তরে উন্নীত হতে পারেননি।" তিনি তার আটাত্তরতম চিঠিতে বলেন, "মুর্শিদে কামিল থেকে ফয়েয ও বরকত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য,নিজেকে আঁর প্রতি ভালবাসার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফয়েয লাভ করেছিলেন। ঠিক একই উপায়ে যে ব্যক্তি মুর্শিদে কামিলের সামনে আদাব এবং ভালোবাসা নিয়ে বসে, সে তার কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করতে পারবে। যে কেউ, তরুণ হোক বা বৃদ্ধ, জীবিত বা মৃত সবাই এই ফয়েজ পাবে। রাবিতা হলো মুর্শিদে কামিল আপনার সামনে বসে আছে আর আপনি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন এই কল্পনা করা। এই রাবিতা খুবই উপকারী, কারণ মানুষ হারামের মধ্যে ডুবে আছে এবং তার হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যতক্ষণ না সে এই অবস্থায় আছে, ততক্ষণ সে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ফয়েজ ও বরকত পাবে না। এর জন্য একটি মাধ্যম অপরিহার্য। অর্থাৎ, এমন একজন উন্নতচরিত্রবান ব্যক্তি আছেন, যিনি এই ফয়েজ গ্রহণ করতে এবং যারা এটি দাবি করে তাদের এটি প্রদান করতে সক্ষম। আর এই ব্যক্তিই একজন মুর্শিদে কামিল।" তিনি একশত পয়ষট্টিতম চিঠিতে বলেন, "আপনার হৃদয়ে মুর্শিদে কামিলের চেহারা রাখাকে রাবিতা বলা হয়। একজন মুরিদকে মুর্শিদের সাথে সংযুক্ত করার সবচেয়ে শক্তিশালী পথ হলো রাবিতা। যখন রাবিতা দৃঢ় হয়ে যায়, তখন সে যেখানেই তাকাবে সেখানেই তার মুর্শিদকে দেখতে পাবে।" একশত সাতানব্বইতম চিঠিতে তিনি বলেন, "যখন রাবিতা দৃঢ় হয়, তখন মুর্শিদে কামিলের কাছ থেকে দূরে থেকে প্রাপ্ত ফয়েজ ও মুর্শিদের কাছে থেকে প্রাপ্ত ফয়েজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয়না। তবুও এই দুটি সমান হতে পারে না। রাবিতা যত শক্তিশালী হবেও, পার্থক্য তত কম হবে।"

তিনি পঞ্চম খন্ডের ঊননব্বইতম চিঠিতে বলেন, "একজন মহান জ্ঞানী বলেছেন, 'যদি আল্লাহ তায়ালা বরকত দিতে না চাইতেনন, তবে তিনি তা দেয়ার ইচ্ছা করতেন না। আমাদের পথের মূলই হচ্ছে সোহবত। সোহবতের বরকত দ্বারা একজন প্রতিভাবান মুরিদ তার প্রতিভা ও মুর্শিদের প্রতি তার ভালবাসার অনুপাতে মুর্শিদের কাছ থেকে ফয়েজ গ্রহণ করবে। সে তার খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্ত হবে, যা তার মুর্শিদের ভাল অভ্যাসের দ্বারা পরিবর্তিত হবে। এ কারণেই তারা বলে যে, শায়খ (মুর্শিদে কামিল) এর মধ্যে ফানী হওয়া ফানা-ফিল্লাহ (তাসাউউফের ক্ষেত্রে) এর প্রথম স্তর। যদি আপনি সোহবত অর্জন করতে না পারেন ,তবে কেবল ভালোবাসার মাধ্যমে এবং মুর্শিদের প্রতি আপনার তাওয়াজ্জুহ এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ফয়েয পাবেন। আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মানুষদেরকে ভালোবাসাও অনেক বরকতপূর্ণ। এই ভালোবাসার মাধ্যমে আপনি তাদের হৃদয় থেকে নির্গত ফয়েয অর্জন করতে পারবেন।মুর্শিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জুহ করার বরকত ত্যাগ করা উচিত নয়। আপনার শরীয়ত শিখা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা উচিত। শুধুমাত্র আনন্দফূর্তি করে আপনার জীবনের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শরীয়তের সাথে মতবিরোধী বিষয়গুলিকে দুনিয়া বলা হয়। সুতরাং এই জিনিসগুলোকে নিরর্থক এবং কবর বা বিচারের দিন এগুলো মূল্যহীন মনে করা উচিত। সুন্নাত আকড়ে ধরা এবং বিদয়াত ছেড়ে দেয়ার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। (সুন্নাতকে আকড়ে ধরার অর্থ হলো, আহলে সুন্নাতের আকিদাগুলো শিক্ষা করা এবং বিশ্বাস করে মেনে নেওয়া, এরপর আদেশগুলি পালন করা ও নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়িয়ে চলা এবং এরপর সুন্নাত কাজগুলো সম্পাদন করা। যখন এই সুন্নাতগুলো এই ধারাবাহিকতা ব্যতিরেখে সম্পন্ন করা হয়, তখন এটাকে সুন্নাত বলা যায় না। এটা হয় বিদয়াত। উদাহরণস্বরুপ, দাড়ি লম্বা রাখা সুন্নাত হবে না। এটি একটি বিদয়াত হবে। এরকম দাড়ি ইহুদী, রাফিদী, বা ওয়াহাবীদের দাড়ি হতে পারে।) কোন বিদয়াতপন্থি বা মুলহিদ (যে ব্যক্তি মাযহাব মানে না এবং সুন্নী নয়) এর সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়। তারা বিশ্বাস চুরি করে। তারা আপনার ধর্ম এবং বিশ্বাসকে কলুষিত করবে। (হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বিদয়াতপন্থি মানুষগুলো জাহান্নামের কুকুরে পরিণত হবে।)

হযরত ইমাম-ই রব্বানী একশত সাতাশিতম চিঠিতে বলেন, "যদি মুর্শিদে কামিলের ছবি সর্বত্র মুরিদকে দেখানো হয়, তবে এটি ইঙ্গিত করে যে রাবিতা খুব শক্তিশালী। রাবিতা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে ফয়েয প্রবাহিত করে। এই মহান বরকত শুধুমাত্র নির্বাচিত মানুষদেরকে দেওয়া হবে।"

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রমাণ হলো এই হাদিস শরিফগুলো: "প্রত্যেক কিছুরই উৎস আছে। আর তাকওয়ার উৎস হলো আকজন আরেফের অন্তর"; "যখন আউলিয়ায়ে কেরামগণকে দেখা হয়, তখন আল্লাহর যিকির সৃষ্টি হয়"; "একটি আলেমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদাত"; "যারা তাদের সংস্পর্শে থাকে, তারা শাক্বী হবে না"; "আমার উম্মতের উপর ধর্মের পাপাচারী ব্যক্তিদের কারণে বিপর্যয় আসবে" এবং অনুরূপ আরো অনেক হাদীস শরীফ। এই হাদিসগুলো হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে উদাহরণস্বরূপ: কুনুজ-উদ-দাকাইক।

হযরত সৈয়দ আব্দুল হাকিম আরওয়াসী যে একজন মুর্শিদে কামিল ছিলেন তা তাঁর মুর্শিদদের লেখা ইজাযত এর চিঠি থেকে, আমার (তুর্কি) বইয়ের একশত একষট্টিতম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত চিঠি থেকে, তাঁর জ্ঞানের

গভীরতা থেকে, তাঁর সুন্দর নৈতিকতা এবং তাঁর কারামাত থেকে সূর্যের মত পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। একবার তাঁর ছবি দেখলে, তাঁর বরকতপূর্ণ চেহারাটি মনে রাখা সহজ। তাঁকে স্মরণ করা এবং তাঁর বরকতময় চেহারা থেকে ফয়েজ নেয়া মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনেক বড় রহমতস্বরূপ। আমাদের মত মানুষ, যাদের হৃদয় পাপের কারণে কলুষিত হয়ে গিয়েছে, আমরা অবশ্যই এই বরকত অর্জন থেকে অনেক দূরে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু সম্পদ আহরণের পন্থা খুঁজে বের করা। সম্ভবত তা অর্জনের মতো মানুষও রয়েছে, যদিও আমরা পারিনি। এই শেষ দিনগুলিতে এই ঘটনাগুলি শোনা, এসব বিশ্বাস করা এবং এই বরকত অর্জনের চেষ্টা করা কিছু মানুষের ভাগ্যে থাকবে। আমাদের রবের (আল্লাহ) কাছে অনেক শুকরিয়া যে তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয়জনদের জানার ও ভালবাসার তাওফিক দিয়েছেন।

হে প্রভু! আমাদের পাপ অনেক ও গুরুতর, আপনার ক্ষমা এবং দয়া সীমাহীন। আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আপনার প্রিয় বান্দাদের উসিলায় আমাদের ক্ষমা করুন! আমিন।

টিকা

তাসাউফ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আহমাদ আল-ফারুকী আস-সিরহিন্দ রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলায়হ এর মাক্তুবাত কিতাব থেকে ভালভাবে শিখা যায়।

আবিদ: যে বেশি ইবাদাত বন্দেগী করে।

আহলে বায়ত: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়। (অধিকাংশ আলেমের মতে) চাচাতো ভাই এবং জামাতা আলী; কন্যা ফাতিমা; নাতি হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

আ'ইম্মাত আল মাযাহিব: মাযহাবসমূহের ইমামগণ।

আলেম: ইসলামের একজন মুসলিম গবেষক।

আল্লাহ তায়ালা: আল্লাহ যিনি সকল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

আনসার: মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মদীনাবাসী।

আক্ছা: পয়সা, টাকার একক।

আরাফাত: মক্কা থেকে ২৪ কিলোমিটার উত্তরের খোলা ময়দান।

আরশ: সপ্ত আকাশ ও কুরসীর (সপ্ত আকাশের বাইরে ও আরশের অভ্যন্তরে) সীমারেখা।

আসর আস-সা'আদা: ইসলামের স্বর্ণালী যুগ, সমৃদ্ধির যুগ। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং চার খলিফা(রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর সময়কাল।

আউলিয়া: ওলীর বহুবচন।

আওকাফ: ধর্মীয় সংস্থা।

আয়াতে করীমা: আল কুরআনের আয়াত।

আযীমা: ধর্মীয় কাজ করার কঠিন উপায়।

বিসমিল্লাহ: আরবি বাক্য "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" (পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ নামে শুরু করছি)।

বাতিল: অবৈধ, ভুল, বিফল।

যিকর: প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার বাক্য বা বাক্যাংশ ।

দিরহাম: তিন গ্রামের ওজনের ইউনিট।

এফেন্দী: অটোমান রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদেয় রাষ্ট্রনায়ক এবং বিশেষত ধর্মীয় গবেষকদের উপাধি; পরিচিতি, যার অর্থ "মহান ব্যক্তি"

ফকীহ: ফিকহশাস্ত্রবিদ, বহুবচন-ফুকাহা।

ফরজ: কুরআন কারিমে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার আদেশকৃত কাজসমূহ। যেমন: নামাজ, রোজা।

ফরজে আইন: যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

ফরজে কেফায়া: কমপক্ষে একজন মুসলিম দ্বারা সম্পাদনকৃত ফরজ কাজ।

ফাতিহা: পবিত্র কুরআন মাজিদের ১১৪টি সূরার প্রথম সূরা, যার সাতটি আয়াত রয়েছে।

ফতওয়া: ১। মুজতাহিদের ইজতিহাদ; ২। ফিকহের বইয়ে নেয় এমন কোনো কাজ এর অনুমোদনের ব্যাপারে মুফতিদের সিদ্ধান্ত; ইসলামী আলেমদের দেয়া ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর; ৩। রুখসা।

ফিকহ: মুসলমানদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় এই সম্পর্কিত জ্ঞান; কর্ম, ইবাদাত।

ফিত্বনা, ফাসাদ: মুসলমান ও ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বিবৃতি ও কর্মকাণ্ড সমূহ।

ফুকাহা: ফকীহ এর বহুবচন।

গাবান ফাহীশ: (ক্রয় করার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া) নির্দিষ্ট মূল্যের তুলনায় দাম বেশি রাখা; অতিরিক্ত দাম।

গাজওয়া: অমুসলিমদের ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; জিহাদ।

গাজী: যুদ্ধরত মুসলিম ব্যক্তি।

হাদীস শরীফ: ১। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী; আল-হাদীস আশ-শরীফ: সমগ্র হাদীস; ২। ইলমুল হাদীস; ৩। হাদীসগ্রন্থসমূহ; ৪। হাদীসে কুদসী, সহীহ, হাসন: হাদীসের প্রকারভেদ।

হযরত: ইসলামী গবেষকদের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধি।

হজ্ব: মক্কাতুল মুকাররমার ফরজ যিয়ারত করা।

হালাল: ইসলামে বৈধ কাজ সমূহ।

হানাফী: হানাফী মাযহাবের একজন সদস্য।

হাম্বলী: হাম্বলী মাযহাবের একজন সদস্য।

হারাম: ইসলামে নিষিদ্ধ কাজসমূহ।

হিজরত: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়া।

হিজায: লোহিত সাগরের উপকূলে আরব উপদ্বীপের অঞ্চল, যেখানে মক্কা ও মদিনা অবস্থিত।

হিজরি: আরবী সন।

হুজরাত আস-সা'আদা (আল-মুয়াত্তারা): সেই কক্ষ যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী দুজন বিশেষ খলিফার কবর রয়েছে।

ইবাদত: উপাসনা; এমন কাজ যার জন্য আখেরাতে সওয়াব বা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঈদ: ইসলামী দুটি উৎসবের একটি।

ইজতিহাদ: (মুজতাহিদ এর প্রকাশকৃত অর্থ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত যার মাধ্যমে) কুরআনের আয়াত বা হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝার চেষ্টা করা।

ইলম: জ্ঞান, বিজ্ঞান; ইলমে হাল: কোনো মাযহাবের ইসলামি শিক্ষা যা প্রত্যেক মুসলমানকে শিখতে হবে; ইলমে উসূল: ফিকহ ও কালামের পদ্ধতিগত জ্ঞান।

ইমাম: ১। গভীর জ্ঞান সম্পন্ন আলেম; ২। কোন একটি জামায়াতের নেতা; ৩। খলিফা।

ঈমান: ইসলামের প্রতি বিশ্বাস।

ই'তিকাদ: ঈমান, বিশ্বাস।

জাহেলিয়্যা: অজ্ঞতার যুগ, অর্থাৎ, প্রাক-ইসলামী আরব।

জাম'আত: সম্প্রদায়। একটি মসজিদে মুসলমানদের একটি দল (ইমাম ব্যতীত)।

জারিয়া: যুদ্ধে আটককৃত অমুসলিম মহিলা ক্রীতদাসী।

জিহাদ: অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আনার জন্য (বা নিজের নফসের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করা।

জুমা: শুক্রবারের নামাজ।

কা'বা আল মুয়াজ্জামা: মক্কার মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত বড় ঘর।

কালাম: ইমানের জ্ঞান, ইলম আল-কালাম।

কালিমায়ে শাহাদত: এমন একটি বাক্য যা আশহাদু দিয়ে শুরু হয়েছে। ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির মধ্যে একটি। যার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়া হয়।

কারামত: ওলীদের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা।

খলিফা: মুসলিম জাহানের খলিফা।

খারেজী: বিদ্বেষী মুসলিম, যারা আহলে বায়াত বা তাদের বংশধরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

খুতবা: জুমা ও ঈদের নামাজে ইমামের প্রদানকৃত ধর্মীয় বক্তব্য যা আরবীতে পাঠ করতে হয়।

মাযহাব: ফিকহের বা ই'তিকাদের একজন ইমাম যা কিছু জ্ঞাপন করেছেন।

মদিনা মুনাওয়ারা: পবিত্র মদীনা শহর।

মাহশর: শেষ বিচার।

মক্কা মুকাররামা: পবিত্র মক্কা শহর।

মাকরূহ: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অপছন্দনীয় কাজসমূহ; মাকরূহে তাহরিমী: জোরালোভাবে নিষিদ্ধ কাজসমূহ, হারামের কাছাকাছি কাজসমূহ।

মালেকী: মালেকী মাযহাবের একজন সদস্য।

মা'রেফত: আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান, যা আউলিয়াদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়।

মারওয়া: মসজিদে হারামের নিকটে অবস্থিত দুটি পাহাড়ের একটি।

মসজিদ: সেজদার স্থান; মসজিদে হারাম: মক্কার মহান মসজিদ; মসজিদে নববী (আস-সা'দা, আন-নবী): মদিনার একটি মসজিদ, যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় নির্মিত হয়েছিল এবং পরবর্তিতে বিভিন্ন সময়ে তা সংস্কার করা হয়, যেখানে রাসূল (দঃ) এর রওজা মোবারক রয়েছে।

মওযূ: হাদীসের একটি প্রকার, মুহাদ্দিসদের বর্ণিত সহীহ হাদীসের শর্তগুলোর কোনো একটি না থাকা হাদীস।

মিলাদী: খ্রিস্টযুগ; গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

মীনা: মক্কা থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তরে একটি গ্রাম।

মুবাহ: যে কাজের অনুমতি আছে; যে কাজের আদেশ দেয়া হয়নি আবার নিষেধও করা হয়নি।

মুফসিদ: এমন কাজ, যা অন্য কাজকে বিশেষত নামাজ বাতিল করে দেয়।

মুফতি: একজন বড় আলেম যিনি ফতোয়া প্রদান করেন।

মুহাজির: ঐ সকল মক্কাবাসী যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

মুজাদ্দিদ: ইসলামকে শক্তিশালীকারী বা নবায়নকারী।

মুজিযা: নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা।

মুকাল্লিদ: মাযহাব অনুসরণকারী ব্যক্তি।

মুস্তাহাব: এমন ইবাদাত যা করলে সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ নাই। আর অপছন্দ করলে কুফরী হয়না।

মু'তাজিলা: ইসলামের ৭২ টি মতবিরোধপূর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে একটি।

মুওয়াজাহাত আস-সা'আদা: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রএজা মুবারকের প্রাচীরের সম্মুখভাগের স্থান, যেখানে যেয়ারতকারীরা রওজার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

মুযদালিফা: মক্কা নগরী ও আরাফাতের ময়দানের মধ্যবর্তী এলাকা।

নাফস: মানুষের অন্তর যা ধর্মীয়ভাবে ক্ষতি করতে চায়।

নাজাসাত: ধর্মীয়ভাবে অপবিত্র জিনিস।

গায়রে-মাহরাম: বিপরীত লিঙ্গের একজন আত্নীয়া যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ নয়।

নেকাহ: ইসলামী পন্থায় বিয়ে।

পাশা: অটোমান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি, গভর্নর এবং বিশেষ করে উচ্চ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রদানকৃত উপাধি।

কাযী: মুসলিম বিচারক।

ক্বিবলা: ইবাদাতের সময় বিশেষত নামাজের সময় যে দিকে (ইসলামে, কা'বাত আল-মুয়াজ্জামা) মুখ করে আদায় করা হয়।

কুরাইশ: আরবের একটি গোত্রের নাম এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বপুরুষ।

কুরআনুল করীম: পবিত্র কুরআন মাজিদ।

রাক'আত: নামাজের মধ্যে সূরা পাঠ, রুকু, সিজদা ইত্যাদির ধারাবাহিকতা। যা কমপক্ষে দুই এবং সর্বাধিক (ফরয নামাজের ক্ষেত্রে) চার রাক'আত হয়।

রমযান: মুসলিম ক্যালেন্ডারের পবিত্র মাস, ৯ম মাস।

রাসূলুল্লাহ: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; আল্লাহর রাসূল।

রওজায়ে মুতাহহারা: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা ও মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তি একটি স্থান।

রুখসা: একটি ধর্মীয় কাজ সহজ উপায়ে আদায় পদ্ধতি।

সাফা: মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দুটি পাহাড়ের মধ্যে একটি।

সাহাবী: সাহাবায়ে কেরাম, যারা ঈমান থাকা অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্তত একবার দেখেছেন; রাসূল (দঃ) এর সাথি।

সহীহ: ১। ধর্মীয়ভাবে বৈধ, ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ; ২। হাদীসের একটি প্রকার, মুহাদ্দিসদের বর্ণিত সকল শর্তসম্বলিত হাদীস।

সালাত: দোয়া করা, কমপক্ষে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা, ফার্সি ভাষায়-নামাজ; সালাতুল জানাযা: মৃতব্যক্তির জন্য আদায়কৃত নামাজ।

সালাওয়াত: বিশেষ দোয়া যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পাঠ করা হয়।

সালেহ: যিনি ধার্মিক এবং সকল গুনাহ থেকে মুক্ত।

শাফেয়ী: শাফেয়ী মাযহাবের সদস্য।

শায়খুল ইসলাম: ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্ম বিষয়ক কার্যালয়ের প্রধান।

শিয়া: ইসলামের মতবিরোধপূর্ণ ৭২টি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি।

শিরক: আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

সুলাহা: সৎ ব্যক্তি।

সুন্নাত: ইসলামের যে সকল আমল আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট না, তবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করতেন ও পছন্দ করতেন। তা আদায় করলে সওয়াব রয়েছে, আর আদায় না

করলে কোনো গুনাহ নেই। যদি একনাগড়ে ছেড়ে দেয় তবে গুনাহ হবে এবং যদি তা অপছন্দ করে, কুফরী হবে।

সূরা: আল কুরআনের একটি অধ্যায়।

তাবে-তাবেয়ীন: ওই সকল আলেম যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদেরকে সাক্ষাৎ পাননি, তবে তাবেয়ীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাই তারা তাদের উত্তরাধিকারী।

তা'আ: যেকাজগুলো আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন। কিন্তু আল্লাহ যে পছন্দ করেন তা না জেনেই কাজগুলো করা হয়।

তাবেয়ী: ঐ সকল মুসলমান যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ পাননি, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

তা'দীলে আরকান: নামাজের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ধীর স্থিরভাবে সম্পন্ন করা।

তাফসীর: পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

তাকলিদ:অনুসরণ করা; চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণ করা।

তাকওয়া: আল্লাহেক ভয় করা; হারাম থেকে বিরত থাকা; আযীমা কাজগুলোর চর্চা করা।

তাসাউফ: (ইসলামের পরিভাষায় ইসলামী সুফিবাদ) জ্ঞান এবং (ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাচরণের অনুশীলন যা ঈমান মজবুত করে, ফিকহের অনুশীলন সহজ করে তোলে এবং মা'রেফত প্রদান করে; ইলমে তাসাউফ।

তাওয়াফ: হজ্বের সময় কাবা শরিফের চারপাশে ঘুরে ইবাদাত করা।

তাওয়াক্কুল: শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা রাখা এবং আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রত্যাশা করা; কোনো কাজ করার পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অই কাজের কার্যকরিতা প্রত্যাশা করা।

তাওহীদ: আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করা।

তা'যীর: ইসলামে বর্ণিত এক ধরনের শাস্তি।

সওয়াব: আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন, যা পালন করা ও বলার কারণে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কার; দুনিয়াতে ইবাদাত বন্দেগীর পুরস্কার, যা পরকালে দেওয়া হবে।

উলামা: ইসলামের আলেমগণ।

উম্মত: একজন নবীর বিশ্বাসী সম্প্রদায়, উম্মত; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত; মুসলিম উম্মাহ।

উসূল: ১। ইসলামী বিজ্ঞানের প্রাথমিক পদ্ধতি বা মৌলিক রীতিনীতি; ২। মৌলিক ইসলামী বিজ্ঞান পদ্ধতি, ইলমে উসূল।

ওয়াজিব: ঐ সকল ইবাদাত যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই বাদ দিতেন না এবং যা ফরযের কাছাকাছি ও ছেড়ে দেয়া যাবেনা।

ওলী: আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালবাসেন এবং সুরক্ষিত রাখেন; একজন সালেহ যিনি নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করেছেন।

ওয়ারা: (হারাম থেকে বেঁচে থাকার পর) সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকা।

যাহেদ: যুহদ অবলম্বনকারী। সর্বদা ভালো কাজ করার চেষ্টাকারী।

যাকাত: প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের থেকে নির্দিষ্ট খাতে দান করাকে যাকাত বলে, যার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়।

যুহদ: পার্থিব সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা এমনকি মুবাহ কাজ থেকেও।

c/o Alhaji Umar Waisu Zaria,

C/O Alhaji Omar Waisu Zaria
Kaduna State Polytechnic,
P.M.B 1061 Zaria,
Koduna State, NIGERIA.
Friday 23rd October 1992.

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহিম! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। প্রিয় ইসলামি ভাই ও বোনেরা! আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট সত্য ও একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম হলো ইসলাম। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর শান্তি, দোয়া ও রহমত বর্ষিত হোক।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ, যিনি আমাকে এই চিঠিটি লেখার তাওফিক দান করেছেন এবং এটি আপনার কাছে, আপনার পরিবার এবং সারা বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই বোনদের কাছে অত্যন্ত উচ্চতর ইসলামী চেতনা এবং সুস্বাস্থ্য পৌঁছে দিক।

প্রথমে আপনার তৃতীয় পার্সেল প্রাপ্তি স্বীকার করি, কারণ আমরা দুই বছর আগে একে অপরের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছিলাম। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারে আপনার সফলতা দেখে আমি খুব কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত । আল্লাহ আপনার মহৎ প্রচেষ্টায় বরকত দান করুক এবং আপনাকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করুক, আমীন। আপনি আমার এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বইগুলোর শিরোনাম জানতে চেয়েছেন, আর তা হল: Answer To An Enemy of Islam (ইসলামের এক শত্রুর বিরুদ্ধে জবাব), The Religion Reformers in Islam (ইসলামের ধর্ম সংস্কারকগণ), Belief And Islam (ঈমান ও ইসলাম), The Sunni Path (সুন্নি পথ) এবং Endless Bliss (অন্তহীন সুখ) (প্রথম এবং তৃতীয় খন্ড) সর্বমোট ছয়টি। আমি ইতোমধ্যে চারটি বই পড়েছি, যার মধ্যে দুটি দুবার করে পড়েছি এবং Answer To An Enemy of Islam পড়তে শুরু করেছি যা আপনার কাছ থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত দুটি বইয়ের একটি। এর অর্থ হচ্ছে আমি নিম্নোক্ত বইগুলি পাওয়ার অপেক্ষায় আছি: Endless Bliss (অন্তহীন সুখ) (দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ড), The Proof of Prophethood (নবুওয়াতের প্রমাণ), Advice For The Muslim (মুসলিমদের জন্য উপদেশ), Islam And Christianity (ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম) এবং Could Not Answer (উত্তর নেই)।

উপরে উল্লেখিত বইগুলির মধ্যে যে কোন একটি বই পাওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করছি এবং আমি আমার দুই বন্ধুকে ওয়াকফ ইখলাস সম্পর্কে পরিচয় করিয়েছি, তাদের মধ্যে একজন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, খুব শীঘ্রই তারা আপনাকে লিখবে ও বইয়ের অনুসন্ধান করবে। ইতিমধ্যে তারা আমার কাছ থেকে দুটি বই নিয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন। আপনার কাছ থেকে উত্তরের অপে ক্ষায় থাকলাম।

সালামান্তে।
আপনার ইসলামের ভাই
Aliyu Umar Waisu Zaria

Aliyu Umar Waisu, C/O Alhaj› Umar Waisu, Kaduna State Polytechnic, P.M.B 1061 Zaria, Kaduna State, Nigeria, West Africa